একটা গন্ধমাখা বাতাস হঠাৎ করুণার আবেগে ঘরে এসে ঢোকে আরও বেশী ক'রে আসতো, কিন্তু দত্তবাবুরা ক'মাস হ'লো পাঁচিলটা অনেক উঁচু ক'রে তুলে দিয়েছেন, তাই গলিটা আরও বেশী ক'রে আলোহীন ও বাতাসহীন হয়েছে। টাকার জোরে উঁচু হয়ে নিচের মানুষের আলো-বাতাস লুট ক'রে নিতে কোন আইনের ভয় নেই। সোমাদের ভয়ার্ত ও সঙ্কুচিত বাসাটার জানালা খোলা থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি?

"আমার মন মানছে না সুমি, তুমি আর মিছামিছি চিঠির উত্তরে চিঠি লিখে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করো না, সোজা চলে এসে যা বলতে হয় বলো। তারপর আমি বুঝবো...।"

সত্যিই, সোমার মা'র মন আজ আর কোন মতে বুঝ মানতে চায় না। মাঝরাতের চক্রবেড়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে আছে, শুধু গলির তিনতলা বাড়িটার সব আলো এখনো জ্বলছে। অন্যদিন এরকম ব্যাপার দেখা যায় না। তিনতলার একটা ঘরের জানালা থেকে সেতার-ছেঁড়া বেদনার্ত নিক্বণের মত একটা শব্দ মাঝে মাঝে বাইরের অন্ধকারের বুকে গিয়ে বিঁধছে—মা মা মা গো।

সোমার মা সব খবরই রাখেন, ওটা নিশীথদের বাড়ি। নিশীথের বোন চারুর জ্বর বেড়েছে। বাড়ির চল্লিশটা বিদ্যুৎপ্রভ বাল্‌ব্ আজ চারুর অসুখে কেমন যেন রাতজাগা বিষণ্ণতায় কাতর হয়ে রয়েছে। সিঁড়িতে সিঁড়িতে পদশব্দের ব্যস্ততা, আধ ঘণ্টা পর পর ডাক্তারের গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে গেটের কাছে থামে আর চলে যায়। দারোয়ান জেগে আছে, সরকার মশায় জেগে আছেন। চাকরের দল বারান্দার ওপর হুকুমের ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। চারুর বাবা আর মা হাতপাখা নিয়ে চারুর বিছনার পাশে বসে থাকেন। নিশীথ দশ মিনিট পর পর টেলিফোন করে—হ্যালো ডাক্তার! রাত্রিটা এত নিঃশব্দ বলেই

নিশীথের গলার স্বর এত স্পষ্ট শোনা যায়। সোমার মা উতলা হয়ে ওঠেন।

চারুর জন্যে নয়, নিজের মেয়ের জন্যেই। সোমার মা'র চোখদুটো ঝাপসা হয়ে ওঠে, নিজের ওপর রাগ হয়, অশান্ত মনের ভাবনা নানা রকম ভয়ে শিউরে ওঠে। সেখানে সোমারও যদি এমনি জ্বর হয়? ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেবারও যে কেউ নেই। জ্বরের ঘোরে শতবার মা'কে ডাকলেও যে সে-ডাক স্বজনহীন দেশের অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সোমা তো চারুরই সমবয়সী, এমন কিছু সেয়ানা নয়। চারুর মতই সোমার মনটাও তো ঘরের আদরে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, এই বয়সেই মেয়েটার আপন ঘর শুধু বইবার বোঝা হয়ে উঠলো। তা'ও আবার ঘরছাড়া হয়ে।

অথচ সোমা এমনি মেয়ে যে কষ্টের জীবনকে মনে প্রাণে ঘৃণাই করে। গরিব হওয়ার লজ্জাটাও মর্মে মর্মে অনুভব না ক'রে পারে না। এ পাড়ার সবাই জানে ওদের অবস্থা কত খারাপ। সোমা তাই এ-পাড়ার কোন বাড়িতে কোন আহ্বান নিমন্ত্রণ ও বন্ধুত্বের সূত্রেও যায় না। সোমার মনে সব সময় এ-সন্দেহ হয়েই আছে, পাঁচজনে ওর দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে, সেটা ঠিক মানুষের দৃষ্টি নয়। চারু, চারুর মা, দত্তবাবুর স্ত্রী, নিরুর মাসী, ওপরতলার লীলা আর লীলার বৌদি, আশেপাশে আর ওপরে, সবাই এরা কেউ লোক খারাপ নন। কিন্তু তবু সবারই আচরণে কেমন একটু ভেজাল আছে বলে মনে হয়। প্রীতির সঙ্গে একটু করুণা, সম্মানের সঙ্গে একটু সমবেদনা, আর উপদেশের সঙ্গে একটু অহংকার।

যদি কারও সঙ্গে মিশতেই হয়, কোথাও যেতে হয়, তবে সোমা একমাত্র যায় চক্রবেড়ে থেকে অনেক দূরে শ্যামবাজারে, ভদ্রাদের বাড়ি। ভদ্রারা বড়লোক না হ'লেও গরিবলোক নয়। অবস্থা যতখানি, তার

চেয়ে বেশী সচ্ছল ওদের হাসি। সোমাকে দেখতে পেলে শুধু ভদ্রা কেন, ভদ্রার ভাইবোনেরা পরীক্ষার পড়া ফেলে সাড়া দিয়ে ছুটে আসে। এই হাসিমুখের অভ্যর্থনায় কোন মাত্রা নেই। ভদ্রার মা রান্নাঘরে ব'সেই চেঁচিয়ে অনুযোগের সুরে বলেন—এত অহংকার কেন গো মেয়ে? তিন তিনটে চিঠি দিয়েও একবার সাড়া পাওয়া যায় না!

শুনতে ভাল লাগে সোমার। হয়তো এই অনুযোগের মিষ্টি আস্বাদের লোভেই ভদ্রাদের বাড়িতে সে আসে। চা খেতে ব'সলে ভদ্রা কোন কথা না ব'লেই সোমার ডিসে আরও চারটে সিঙাড়া তুলে দেয়। সোমা আপত্তি করে না, আপত্তির কথা মনেও আসে না, ব্যাপারটাকে বিশেষ করুণা ব'লে কোন সন্দেহও হয় না।

ভদ্রার মা কখনো হয়তো ধমক দেন—কি রে সোমা, চুলগুলোকে ভাল ক'রে আঁচড়ে একটা বিনুনি করতেও পয়সা খরচ হয় বুঝি?

এ ধমকে ক্ষুণ্ণ হওয়া দূরে থাক্, সোমা মনে মনে খুশী হয়। এখানে বরং অভিযোগ অনুযোগ ধমক আর নিন্দে আছে, কিন্তু তার মধ্যে ভেজাল নেই। ভদ্রার ছোট ভাইবোনেরা সোজাসুজি নিন্দেই করে—সোমাদি তুমি এক নম্বরের কিপটে. একদিনও চার পয়সার লজেন্স পর্যন্ত খাওয়ালে না!

এখানে লোকের কথাবার্তা সমবেদনায় টন্‌টন্ করে না, উপকার করবার জন্যে কেউ মাথাব্যথায় ছট্‌ফট্ করে না। যেমন ভদ্রা, তেমনি ভদ্রার মা, আর তার চেয়ে ভাল ভদ্রার বাবা হিতেন বাবু।

হিতেন বাবু ব্যবসা করেন, কিন্তু ঠিক ব্যবসায়ী হতে পারেন নি বোধ হয়। কখন্ লাভ হয় আর কখন্ লোকসান যাচ্ছে, হিতেন বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা কখনই অনুমান করা যাবে না। কারণ, সব সময়েই তিনি খুশী হ'য়ে আছেন। ব্যবসাটা তাঁর ধর্ম হয়ে উঠতে পারেনি, একটা সখের সখ।

তাঁর স্বদেশিয়ানাও তেমনি একটা সখের সখ, কিন্তু এই দুটো সখের মধ্যে কোন্‌টা তাঁর কাছে বেশী প্রিয়, তাও সঠিক বলা কঠিন। যেকোন জাতীয় কাজের কমিটি, তাঁর কাছে একবার প্রস্তাব নিয়ে এলেই হলো। তিনি তখুনি এবং নির্ঘাত সে-কমিটির সদস্য হবেন এবং কিছু চাঁদাও দিয়ে ফেলবেন। যেকোন সভা-সমিতির আমন্ত্রণ আসুক্‌ না কেন, একটু স্বদেশী ব্যাপার থাক্‌লেই হলো, তিনি অসময়ে দোকান বন্ধ ক'রে দিয়ে ঠিক সময় মত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন। তিনি সাতকড়ি বাবুদের তৈরী জনসেবা কমিটিতে আছেন, আবার ধনঞ্জয় বাবুর তৈরী ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটি অল্‌ বেঙ্গল রিলিফেও আছেন। কিন্তু এর জন্য দু'পক্ষের কেউ হিতেন বাবুর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয় না। কোন কমিটিতে, কোন পার্টিতে ও কোন সঙ্ঘে তাঁর উচ্চাসন অবশ্য নেই। সবার মধ্যে একটা স্থান পেলেই তিনি ধন্য। তাঁর মতবাদ কি, এ প্রশ্নও বড় কেউ তাঁকে করে না: করলেও তিনি উত্তর দিতে পারবেন না, কারণ মতবাদ না থাকাটাই তাঁর আদর্শ।

ভদ্রাদের বাড়িটাকে বড় ভাল লাগে সোমার। মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীতে বোধ হয় এই রকম একটিমাত্র বাড়ি আছে, যেখানে মনেপ্রাণে কথায় চিন্তায়, ধমক অনুরোধ অভিযোগ আর নিন্দেয়, কঠোরতা ও রূঢ়তা ব'লে কিছু নেই। ভদ্রাদের সংসার ও স্বার্থ যেন ধূপের ধোঁয়ার মত হাল্‌কা হ'য়ে সব কঠিনতার উর্ধে ভাসছে, কারও সঙ্গে সংঘাত লাগে না, না কারও কাছ থেকে আঘাত পায়। অভাব থাকলেই বা কি, সেটা এত নীরব যে আছে কি না বোঝা যায় না। আর বাড়িগাড়ি ও বড় হওয়ার উচ্চাকাংখা থাক্‌লেই বা কি, তার জন্যে কোন উচ্চবাচ্য নেই। এরা যেমন আছে, বেশ আছে, এটাই বড় সত্য।

সোমার মনের গোপনে একটা চিন্তা মাঝে মাঝে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। যদি তার নিজের বাড়িটা ভদ্রাদের বাড়ির মতই হ'তো। ঠিক এই

ধরণের, এর চেয়ে বেশী নয়। এর চেয় বেশী শান্তি নয়, এর চেয়ে বেশী হাসিও নয়।

কিন্তু তা হবার নয়। অনেক পার্থক্য। ভদ্রা এখনও পরীক্ষার পড়া পড়ছে, আর সোমা টাকার অভাবে পড়াই ছেড়ে দিয়েছে। ভদ্রার বাবা সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে ছাদে ব'সে গান করেন। আর সোমার বাবার ফটোটা শুধু জীর্ণ ফ্রেমে বন্দী-হ'য়ে ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে, বাবাকে শুধু মনে পড়ে সোমার। অনেক তফাৎ, ভদ্রা আর ক'দিন পরে পাশ ক'রবে, তারপর হয়তো একটি শুভদিনে শঙ্খঘণ্টামুখরিত উৎসবের পর স্বামীর ঘরে এমনি হাসিমুখেই চলে যাবে। আর সোমাকে খুঁজতে হবে চাকরি, চক্রবেড়ের এক গলির কোণে একটা একঘরে বাসার প্রাণ আর সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই।

"তুমি মা, অবুঝ হয়ো না। স্বদেশী চাকরির জন্যে ঘরছাড়া হয়ে এত দূরে থাকতে নেই। ফিরে এস, চেষ্টা করলে কলকাতাতেই একটা না একটা স্বদেশী চাকরি পাওয়া যাবে ....।"

স্বদেশী চাকরি আবার কি জিনিষ? অর্থাৎ এ চাকরিতে দেশসেবা আছে, আবার মাইনেও আছে।

সোমা দু'দিনের জন্যে কলকতাতেই একটা যুদ্ধমার্কা ষ্টোরের অফিসে কাজ করেছিল। আর অফিসে যায়নি। ভদ্রা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস ক'রেছিল—কাজটা ছেড়ে দিলি নাকি? আর অফিসে যাবি না?

সোমা বলে—না।

ভদ্রা—কেন?

সোমা—এসব অফিসে যাওয়া সোজা, ফিরে আসা ফ্যাসাদ।

ভদ্রা—তার মানে?

সোমা হেসে ফেলে—অফিসের গেটের বাইরে চিতেবাঘের মত এক একটা মোটর শুৎ পেতে থাকে, আর দেখতে পেলেই তেড়ে আসে।

ভদ্রা—কেন ?

সোমা—গিলে খেতে।

ভদ্রা—কি ছাই বলিস্, কোন মানে হয় না।

সোমা—যেচে লিফ্‌ট দিতে আসে।

ভদ্রা লজ্জায় জিভ কাটে—কে ভাই ?

সোমা—কে নয় ভাই, তাই বল্ ? স্যুট-পরা, পাইপ-মুখো, পানখেকো, বাঙালী, অবাঙালী,......।

সমস্যাটা এতক্ষণে বোধ হয় ভদ্রার বোধগম্য হয়। কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতের মত চুপ ক'রে ভাবে, তার পরেই একটু ভয়ার্ত স্বরে বলে—কথ্‌খনো যাস্‌নি সোমা।

যুদ্ধমার্কা অফিসের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্। একটা দেশী মার্চেন্ট অফিসে চাক্‌রির জন্যে একবার ইন্টারভিউ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল সোমার।

নানা কথার পর অফিসের ম্যানেজার প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি গান গাইতে পারেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই চলে এসেছিল সোমা। দু'একটা ঝাঁঝালো উত্তর মনে এলেও মুখে আস্‌তে পারেনি। সোমার মত মেয়েদের পক্ষে এটাই তো সবচেয়ে বড় বাধা। জীবন খোঁজে ভদ্রতা, কিন্তু জীবন নির্ভর করে চাক্‌রির ওপর, আর চাক্‌রি হলো অভদ্রতার জঞ্জালে ভরা জীবন।

অথচ চাক্‌রি না করলেও চল্‌বে না। সোমার সেজকাকা হাজিপুরের কন্ট্রাক্টর, এতদিন তাঁরই চল্লিশটি টাকা মূল্যের দয়া প্রতি মাসে মনি-অর্ডারযোগে নিয়মিত এসেছে, তবেই চক্রবেড়ের গলির একটা একঘরে বাসায় চারটে অসহায় নারী-প্রাণের আয়ু রক্ষা পেয়েছে। চারটে নিরুপায় প্রাণ—সোমা, সোমার মা, সোমার দুটি বোন চুনি ও পান্না।

সোমা যদি মায়ের বড় মেয়ে না হয়ে, বড় ছেলে হতো ? সোমার মা

প্রায়ই দুঃখ ক'রে এই কথাটা বলেন। যা নেই, তাকে কল্পনায় সত্য ক'রে নিয়ে, আর যা রয়েছে তাকে দুঃখের অভিমানে একেবারে মিথ্যে ক'রে দিয়ে সোমার মা একটি বড়ছেলের অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করেন। বাইশ বছর বয়স হয়েছে মেয়ের, লেখাপড়াও কিছু শিখেছে, কিন্তু সোমা তবু ক্ষণিকের মত মায়ের দৈন্যগ্রস্ত মনের ক্ষোভে ও অভিমানে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেন মিথ্যে হয়ে যায়।

কোন্ এক দার্শনিক বলেছেন, মেয়েদের আত্মা নেই। মা'র মুখে বড়-ছেলে থিওরির আদর দেখে সোমা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে। জোর ক'রে চোখ দুটোকে ঝাপ্‌সা হতে দেয় না। মনে হয়, দার্শনিক সত্যি কথাই বলেছেন।

সোমা একটু পরেই শান্তভাবে মা'কে অনুরোধ করে—তুমি রাগ করছো কেন মা? ধ'রে নাও না, আমিই তোমার বড়ছেলে।

সোমার মা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে একেবারে চুপ ক'রে যান।

আজ সোমা কিন্তু মা'র ইচ্ছা পূর্ণ করেছে। সত্যি সত্যি সে মায়ের বড়ছেলের মত চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেছে। তবু ... মাঝরাতের চক্রবেড়ের গলিতে একটি মেয়ের মায়ের আত্মা জেগে ব'সে থাকে, ঘুমোতে পারে না। বার বার এক কথাই চিঠিতে লেখেন—"সুমি, চলে এস......।"

দেয়ালে জীর্ণ ফ্রেমে বন্দী সোমার বাবার ফটো। একটা টিক্‌টিকি সোমার বাবার কাঁধের ওপর চুপ ক'রে ব'সে থাকে। দীপালোকের প্রতিবিম্ব ফটোর কাঁচের ওপর কখনো স্থির হ'য়ে থাকে, কখনো কাঁপে, কখনো ছটফট্ করে। কিন্তু সোমার বাবা চিরকালের মত নিস্পন্দ, মরণসাগরের ওপার থেকে চুপে চুপে দেখছেন, একটা অসহায় দৃষ্টি, কিছু বলবার নেই, কিছু করবার নেই।

সোমার মা আর এক ছত্র লেখেন—"সুমি, তোমার বাবা বেঁচে থাকলে সে কি তোমাকে এভাবে বাইরে চাকুরি করতে ছেড়ে দিত? আমিই বা দেব কেন? পত্রপাঠ চলে এস…… ।"

পিতৃহীনা মেয়েকে মা আজ যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—হ'লামই বা মা, বাপের কাছে তুমি যে-আদরের মেয়ে হ'য়ে ছিলে, আমার কাছেও তাই হ'য়ে থাকবে। · ক'টা টাকার জন্যে সংসারের নিয়মকে ওলটপালট করে দিতে পারবো না। তুমি চলে এস।

কিন্তু সোমা কি সত্যিই ফিরে আসতে পারে? আর এলেও কি মা'র এই মাঝরাতের স্নেহবিধুর প্রতিশ্রুতি প্রতিদিনের দৈন্যের আঘাতে এক সপ্তাহও অটুট থাকতে পারবে?

তা হয় না। সোমা সেটা মর্মে মর্মে জানে ব'লেই চলে গেছে, ভদ্রার মত বা চারুর মত বাড়ীর বড় মেয়ে হ'য়ে ঘরে ব'সে থাকার নিয়ম সোমার বেলায় খাটে না। কারণ হাজিপুরের কনট্রাক্টর সেজকাকার দয়া ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হ'য়ে আসছে। যুদ্ধটা যেমন বাড়ছে, সেজকাকার কনট্রাক্টের বড় বড় টেণ্ডার তত বেশী মঞ্জুর হচ্ছে, আর তাঁর মোটর গাড়ির · সংখ্যাও বেড়ে উঠেছে সেই অনুপাতে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, সোমাদের জন্য সেজকাকার মাসিক দয়ার বরাদ্দ ঠিক সেই অনুপাতে দিন দিন কমে আসছে। চল্লিশ থেকে ত্রিশ, তারপর পঁচিশ। ওমাসে এসেছিল কুড়ি আর এ মাসে মাত্র পনর টাকা।

সেজকাকা তো আগে এরকম ছিলেন না। বরং আগে যখন তাঁর উপার্জন সত্যি করেই কম ছিল, যখন তাঁকে নিজেরই সংসারের জন্য দেনা ক'রে দিন চালাতে হয়েছে, তখন টাকা পাঠাতেন আজকের চেয়ে বেশী। চিঠি দিয়ে খোঁজ খবরও নিতেন বেশী। সোমার বিয়ের জন্য ভাবনার কথাও মাঝে মাঝে জানাতেন। দূরে থাকলেও নিজের অভাব দিয়ে যেন অসহায় বড় বৌঠান ও তাঁর তিনটি মেয়ের বিষণ্ণ মুখের ছবিটা

হৃদয় দিয়ে ধ'রতে পারতেন। আজ যুদ্ধের কৃপায় আকস্মিক প্রাচুর্যে তিনি ঊর্ধলোকে উঠে গেছেন। আকাশ কুসুম হয়ে গেলে ঘাসের ফুলকে আর আপন ব'লে চিনতে পারা যায় না, ব্যাপারটা তাই। হঠাৎলব্ধ টাকার থলির আভিজাত্যে আর পরলোকগত ভাইয়ের দুঃখী পরিবারকে নিজের জাত ব'লে ভাবতে পারা যাচ্ছে না। ভাবতে কেমন কুণ্ঠা হয়। যেন একটা অপয়া সংস্পর্শ, সম্পর্ক রাখতেই ভয় করে, হঠাৎ হয়তো পেছু ডেকে যে-কোন মুহূর্তে সেজকাকাকে তাঁর কাঞ্চনাকীর্ণ ঊর্ধলোকের পথ থেকে টেনে নামিয়ে দেবে।

সেজকাকা শেষবারের মত একটা চরম উপকারের প্রস্তাব ক'রে চিঠি লিখেছেন। তিনি আর সাহায্য করতে অসমর্থ। তবে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। অর্থাৎ সোমার বিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি ভুলতে পারেন নি। তিনি একটি পাত্রও স্থির করেছেন, এক পাঞ্জাবী হিন্দু ভদ্রলোক, বেশ বড় কন্‌ট্রাক্টর, বাংলা ভাষায় মোটামুটি রকমের কথাও বলতে পারেন। সুতরাং, সোমার যা চেহারা আর যা গুণ, তাতে এর চেয়ে ভাল পাত্র স্বপ্নেও আশা করা যায় না। সেজকাকা বলেছেন, এটা তাঁর খামখেয়াল নয়, তিনি অনেক দূর পর্যন্ত ভেবে নিয়ে এই পাত্রকেই পছন্দ করেছেন। এ'তে শুধু সোমারই সৌভাগ্য খুলে যাবে তা নয়, সৌভাগ্যবতী সোমা দু'হাতে পয়সা ছড়িয়ে তার মা ও দুটী বোনকেও সব দিক দিয়ে সুখে রাখতে পারবে।

চিঠি পেয়ে সোমার মা কেঁদেছেন—তোর সেজ'কা শেষ পর্যন্ত আমাদের জাতটাও ভুলে গেছে রে সোমা ?

সোমা কোন কথাই বলে না, কোন মন্তব্য সমালোচনা আপত্তি কিছুই না। কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে। তার পরেই উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়।

মা বলেন—কোথাও বেরুচ্ছিস্ নাকি ?

সোমা উত্তর দেয়—হ্যাঁ, ভদ্রাদের বাড়ি একবার ঘুরে আসি।

মা বলেন—যাচ্ছিস্ যদি, সাড়িটা বদ্‌লে রঙীন একটা প'রে নে।

রঙীন সাড়ি আছেও হয়তো দু'একটা। কিন্তু সোমা অনেকদিন হ'লো রঙীন সাড়ি পরা ছেড়েই দিয়েছে। মা অনেকবার রাগ ক'রে বলেছেন—এটা কী একটা মতিচ্ছন্ন! ভদ্রলোকের মেয়ে না যোগিনী?

সোমা তবু সাদা প্লেন সাড়ীই পরে। কালো পাড় না হোক্ নীল পাড়। মা'র অনুযোগ গ্রাহ্য করে না।

চুনি হঠাৎ কাছে এগিয়ে এসে বলে—দিদিভাই দাঁড়াও, একটা টিপ পরিয়ে দি।

সোমা ধমক দেবার জন্যে তাকায়। চুনি কিছুমাত্র অপ্রস্তত না হ'য়ে বলে—খয়েরের টিপ, কালো মেয়েদের খুব ভাল দেখায়।

চুনি একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে সোমার কপালে ধীরে ধীরে খয়েরের টিপ এঁকে দিতে থাকে। সোমা আর রূঢ় হয়ে চুনিকে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু ঘরের বাইরে বেরিয়েই আঁচল দিয়ে টিপটা মুছে ফেলে।

ভদ্রাদের বাড়ি। ঘরে ঢুকতেই ভদ্রার বাবা হিতেনবাবু ছেলেমানুষের মত উল্লাসে চিৎকার ক'রে অভ্যর্থনা জানান—আসুন আসুন সোমা রায়।

সোমা খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে—এরকম বিরক্ত ক'রলে আমি কিন্তু আর আসবো না কাকাবাবু।

এই তো একটা পরের বাড়ি, আর হিতেনবাবুও সোমার সত্যিই কাকাবাবু নন। কিন্তু এখানে প্রবেশ করা মাত্র একটি আহ্বানের আদরে গ'লে গিয়ে সোমা ছোট্ট মেয়েটির মত হয়ে যায়। মনের ভেতর যত অভিমানের গুমোট যেন একটি খোলা হাওয়ার পুলকে মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়।

ভদ্রা পড়া ছেড়ে দিয়ে গল্প ক'রতে বসে। সোমার কপালের দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে দুষ্টুমি ভরা হাসি হাসে—টিপ পরা হয়েছিল বুঝি?

সোমা অপ্রতিভ হয়ে কপালটা আঁচল দিয়ে ভাল ক'রে ঘসতে ঘসতে বলে—চুনিটা পরিয়ে দিয়েছিল।

ভদ্রা—মুছে ফেললি কেন ?

সোমা—রাখ্, যে না রূপের ছিরি !

পাশের ঘর থেকে ভদ্রার মা কথাটা শুনতে পেয়েছেন। পান সাজার কাজ ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে প্রায় দৌড়ে এসে সোমার সামনে দাঁড়ান।—আমি সব শুনতে পেয়েছি মেয়ে।

হিতেনবাবুও যেন নাটকীয় আবির্ভাবের মত হঠাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান—কি হয়েছে, আমিও শুনতে চাই।

ভদ্রার মা চেঁচিয়ে বলেন—সোমা আর ভদ্রার মধ্যে তফাৎ কি জান ?

হিতেনবাবু বলেন—জানি, ভদ্রা হলো আমার মেয়ে আর সোমা হলো তারকদার মেয়ে।

ভদ্রার মা বলেন—না। সোমার যা রূপ, নিজেকে তার চেয়ে কুৎসিত ব'লেই ও মনে করে। আর ভদ্রার যা ছিরি, ও তার চেয়ে দু'গুণ রূপসী ব'লে নিজেকে মনে করে।

হিতেন বাবু আর ভদ্রার মা মেয়েদের সামনেই উচ্চ হাসির রোল তুলে যেন আত্মহারা হয়ে যান। এ বাড়িতে গুরুজন লঘুজন ব'লে কোন পার্থক্য বোঝা যায় না। বাপ মা ছেলে মেয়ে সবাই যেন একটা খেলার সাথীর দল।

ভদ্রা আর সোমা দু'জনে নিচের তলায় নেমে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শোনে, হিতেনবাবু আর ভদ্রার মা তখনো খুশির আবেগে হেসেই যাচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পরেই সোমা নিচতলা থেকে আবার ওপরে উঠে হিতেনবাবুর কাছে এসে দাঁড়ায়। মাথা নিচু করে, ঢোক গিলে খুব আস্তে আস্তে যেন ধরা গলায় বলে—কাকাবাবু !

হিতেনবাবু জিজ্ঞাসুভাবে বলেন—কি মা?

সোমা—একটা চাকরি।

ঘরের বাতাসে সব হাসি-ফুর্তির চাঞ্চল্য কয়েক মুহূর্তের মত স্তব্ধ হ'য়ে যায়। এই ধীর শান্ত ও অস্পষ্ট উচ্চারিত অনুরোধের এক মুহূর্ত আগেও হিতেনবাবুর চোখ দুটোতে হাসির ছটা লেগে ছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেই চোখ একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে আসে। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা বিঁধে যেন তাঁর সব খেলার আনন্দ নিঃশেষ করে দিয়েছে।

পাশের ঘর থেকে এই কথাটাও শুনতে পেয়েছেন ভদ্রার মা। আর ব্যস্ত হ'য়ে নয়, শান্তভাবে আস্তে আস্তে এসে ঘরে ঢুকলেন। সোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন—তুই এখন ভদ্রার কাছে গিয়েই গল্পসল্প কর সোমা, যা।

সোমা আবার ঘর ছেড়ে নিচের তলায় চলে যায়।

বুঝতে কিছু বাকি নেই হিতেনবাবুর। সোমার অনুরোধের ভাষায় যতটুকু বোঝা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশী বোঝা যায় ওর অভাবিত অনুরোধের মধ্যে এবং সেটুকু উপলব্ধি করার মত হৃদয়ের শক্তি তাঁর আছে। কিন্তু এ অনুরোধ বড় কঠিন। উপেক্ষা করা যায় না, কারণ সোমা কেন চাকরি চায় তা তিনি জানেন। আর অনুরোধ রক্ষা ক'রতে পারলেই কি তিনি সুখী হবেন? হিতেনবাবু ভাবেন, আজ যদি তাঁর মেয়ে ভদ্রাকে চাকরি করতে হতো? ভদ্রার বেলায় যেটা নির্মম ব'লে মনে হয়, সোমার বেলায় তাই ব্যবস্থা করে দিতে হবে?

ভদ্রার মা সমস্যাটাকে একটু সহজ ক'রে দেন—ওসব কথা চিন্তা ক'রে লাভ নেই। মায়া দিয়ে এসব জিনিস বিচার করা যায় না। বাঁচতে হ'লে সোমাকে চাকরি ক'রতেই হবে। আর কোন উপায় নেই।

হিতেনবাবুও জানেন, কথাটা একশো বার সত্যি। একটা পরিবার, তার সবাই হলো মেয়ে। দেশের আইন এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে

দায়ী নয়, ওরা না খেয়ে মরে গেলে দেশের শাস্ত্র কাউকে শাস্তি দেবে না, কোন প্রতিবেশীরও জরিমানা হবে না। ওরা যেন শুধু তারকদারই জিনিস ছিল, পৃথিবীর নয়। তারকদা মারা গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওরাও নিষ্প্রয়োজন হয়ে গেছে।

হিতেনবাবু নিজে কিছু যে আর্থিক সাহায্য করতে পারেন না তা নয়। কিন্তু এ বিষয়ে হিতেনবাবু আর ভদ্রার মা দু'জনেই একমত—না, ওভাবে সাহায্য ক'রে ওদের ছোট করে দেওয়া উচিত নয়। সোমা মেয়েটাও একটু অহংকারী ও অভিমানী। আজকালকার দিনে তাই হওয়া ভাল।

আবার যেকোন রকমের চাকরিই যে সোমা সইতে পারবে তাও সত্যি নয়। হিতেনবাবুর কাছে অজানা নেই, কেন সোমা কলকাতার কয়েকটা অফিসে চাকরি পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে।

শুধু তাই নয়। হিতেনবাবু ভাবতে দুঃখ বোধ করেন, মা-বোনের মুখের অন্ন জোগাতে গিয়ে মেয়েটার জীবনে হয়তো চাকরিই শুধু সর্বস্ব হ'য়ে থাকবে,গোধূলি বেলার আলো কখনো দেখা দেবে কি না কে জানে। এখন তো শুধু ধূলোই দেখা যায়। কিন্তু অন্নোপার্জন ছাড়া আর দুটো ভাল সাধ সাধনা বা আদর্শ ওর জীবনে কি অপ্রাপ্য হয়েই থাকবে? সোমা কি শুধু চাকরি করারই যোগ্য? হিতেনবাবু নিজেই স্বকর্ণে শুনেছেন, মেয়েটা কী গভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে ভদ্রাকে সিস্টার নিবেদিতার জীবনী প'ড়ে প'ড়ে শোনায়। গত বছরেও স্বাধীনতা দিবসে এ বাড়ির ছাদের ওপরে জাতীয় পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপড়ার মত নিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্পবাক্য পাঠ করেছে। তাই, শুধু যেকোন একটা চাকরি হ'লেই চলবে না। সোমার মত মেয়েকে মানায়, এমন একটি মনোমত ও রুচি সম্মত চাকরি চাই।

সোমাও জানে, ওর ভবিষ্যতের পথ দূর প্রসারিত নয়। সেপথের বাঁকও নেই, উত্থানও নেই। শুধু একটা চাকরি ধরার মত যতটুকু

এগিয়ে যাওয়া দরকার, এই পথের সীমা ততটুকুই। কিন্তু মনের গোপনে ইচ্ছাগুলি কোন সীমার বাঁধন যে স্বীকার ক'রতে চায় না। তাই নিজের হাতে আঁকা গান্ধীজীর ছবিটাকে প্রতি সপ্তাহে একটা ফুলের মালা দিয়ে সাজায়। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিদিবসে ঘরে ব'সেই চুনি আর পান্নাকে গান গেয়ে শোনায়—জীবন যখন শুকায়ে যাবে, করুণাধারায় এস। বড় ইচ্ছে করে, এই বৈশাখী মধ্যাহ্নে একবার কবির আশ্রমে তরুবীথিকার ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে আসতে।

সাধ আর সখগুলি তো হিসেব করে আসে না। আরও কত কি ইচ্ছে হয়। কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে। যমুনার নীল জলের ধারে সাদা তাজমহলের রূপ স্বচক্ষে দেখতে ইচ্ছে করে বৈকি। গ্রামোপান্তে এক নির্জন শুক্লা রাতে, জলে টলমল কালি দীঘির কিনারা দিয়ে মাত্র একটি সঙ্গীর হাত ধরে নীরবে বেড়িয়ে আসতে। এইভাবেই বেশী কল্পনা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ইচ্ছের কাছে হাতে হাতে ধরা পড়ে যায় সোমা।

"স্বমি, চাকুরি করা তোমায় মত মেয়ের শোভা পায় না। তোমার সেজকাকা টাকা না দিক্, আমি ভিক্ষে করে টাকা জোগাড় করবো আর তোমার বিয়ে দেব। ক'টা টাকার জন্যে মেয়েকে চিরকাল আইবুড়ো রেখে আমি পাপের ভাগী হতে চাই না……।"

মনের ভেতর পুঞ্জীভূত যত অসম্ভবের সাধগুলিকে যেন লিখে লিখে সার্থক করছিলেন সোমার মা। চক্রবেড়ের মাঝরাত্রি অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। চারুর আর্তনাদ আর শোনা যায় না, বোধহয় এতক্ষণে শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। পান্না একবার জেগে উঠে জল খায়। দু' হাত দিয়ে চোখ ঘ'ষে নিয়ে একটু অবাক্ হ'য়ে মা'র চিঠি লেখার কাণ্ড দেখে।—দিদিকে লিখে দাও, হয় চলে আসুক, নয় আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাক্। ঘুমন্ত স্বরেই কথাগুলি শেষ ক'রে পান্না আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত হিতেনবাবু চাকরিটা যোগাড় করেই ছাড়লেন। ভদ্রার মা

বললেন—এটা ঠিক চাকরি নয় সোমা, তোর ভালই লাগবে, তবে একটু শক্ত হতে হবে।

সোমা হেসে ফেলে—যা বলবেন তাই হব। শক্ত বলুন, দজ্জাল বলুন, মুখরা বলুন, চাকরি করার জন্যে যে যে গুণ চাই, আমি সব তৈরী করে নেব।

ভদ্রার মা—বল্ রাজী আছিস্?

সোমা—কাজটা কি?

ভদ্রার মা—একটা চিল্ড্রেন'স্ হোমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

সোমা বিস্মিত হয়—সে কি কাকিমা? নামটা শুনেই যে ভয় করছে। এত বড় চাক্‌রি আমার জন্যে কেন?

ভদ্রার মা—বড় চাক্‌রি নয়, কিন্তু কাজটা ভাল। তবু কেউ এ সব কাজে যেতে চায় না।

সোমা—কেন?

ভদ্রার মা—অজ পাড়াগাঁ ব'লে। কিন্তু উনি ব'ললেন……।

সোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রার মা হঠাৎ থেমে যান। সোমা হেঁটমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা ধীরে ধীরে বড় বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ছে। মনের ভেতর একটা আহত অভিমানের চঞ্চলতাকে অতি কষ্টে সংযত করছে সোমা। মনটা যেন একটা আঘাতে ছোট হয়ে গেছে সোমার। তার জীবনে কি এই পরিমাণটুকুই অবধারিত হয়েছিল? অজ পড়াগাঁ, যেকাজে কেউ যেতে চায় না, সেই সর্বলোকের অবহেলিত স্থান তারই জন্যে নির্দিষ্ট। কাকাবাবুর মমতা এর চেয়ে বেশী কিছু যোগাড় ক'রে দিতে অসমর্থ। বেশ, তাই হোক্।

সোমা বলে—কবে যেতে হবে?

ভদ্রার মা—বেশী দেরি না ক'রে একটা ভাল দিন দেখে রওনা হ'য়ে যা। উনি কমিটির প্রেসিডেণ্ট নয়নবাবুকে চিঠি দিয়ে দেবেন।

সোমা রওনা হয়ে গেছে আজ তিন দিন হলো। চক্রবেড়ের গলির কোণে একঘরে বাসার প্রদীপের তেল পুড়ে পুড়ে এতক্ষণে শেষ হয়ে এসেছে।

"তুমি, আশা করি আমার কথার অবাধ্য হয়ে আমাকে মিছিমিছি মনঃকষ্ট দেবে না। পত্রপাঠ চলে এস……।"

সোমার মা যখন চিঠি লেখা শেষ করেছেন, তখন চক্রবেড়ের গলি থেকে একশো মাইল দূরে ঘুটঘুটে কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন এক নিস্তব্ধ গ্রাম্য স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে ঘাসে ঢাকা ঠাণ্ডা মাটির ওপর সোমা দাঁড়ায়। চার দিকে তাকিয়ে কিছু দেখা যায় না। একটা দৃশ্যহীন বর্ণহীন শব্দহীন পৃথিবী। শুধু মাথার ওপর এক ঝাঁক কুচি কুচি তারার মধ্যে একটা খুব বড় রকমের তারা দেখা যায়। ওটারই নাম বোধ হয় ব্রহ্মহৃদয়।

এই অন্ধ ও বধির পৃথিবীর গায়ে যেন সাড়া লাগে। একটা লণ্ঠনের আলোক আলেয়ার মত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। সোমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে হঠাৎ শিউরে ওঠে। আলোটাকে রক্তময় ক্ষতের মত মনে হয়। শব্দও শোনা যায়, কিন্তু মানুষের কলরবের মত নয়। কতগুলি ছায়াময় জীব নিজের ভাষায় কথা ব'লতে ব'লতে আসছে। নয়নবাবু বলেছেন, স্টেশনে লোক থাকবে। কিন্তু যারা আসছে, তারা কি সত্যিই কতগুলি লোক?

তবু সত্যিই কতগুলি লোক এসে সোমার সামনে দাঁড়ায়। নিঃসন্দেহ হ'য়েই সোমা ভাল করে দেখে আশ্বস্ত হয়। হ্যাঁ, নয়নবাবুর কথা মত স্টেশন থেকে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক উপস্থিত হয়েছে। তবে গ্রামের লোক।

একজন বৃদ্ধ, একজন যুবক আর চারটি অল্প বয়সের ছেলে। বৃদ্ধের হাতে একটা ছোট লাঠি, যুবকের হাতে লণ্ঠন, ছেলেদের হাতে কিছু নেই। ছেলেরাই সোমার জিনিসপত্রগুলি একে একে মাথায় তুলে নিয়ে দাঁড়ায়।

গ্রাম্য যুবকটি বলে—আমরা কাঞ্চীপুর থেকে আসছি। সকালেই নয়নবাবুর চিঠিতে জান্‌লাম, আপনি আসছেন।

সোমা—কাঞ্চীপুর কতদূর ?

যুবক—তিন ক্রোশ।

সোমা—সর্বনাশ !

বৃদ্ধ উৎসাহিতভাবে বলে—কিছু ভাববেন না, আপানাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব না। গাড়ি আছে, গরুগুলোও মজবুত আছে। ভোর হ'তে হ'তে আপনাকে পৌছে দেব।

সোমা নিরুৎসাহ হ'য়ে বলে—রাত্রিটা স্টেশনে থাকলে ভালো হতো না ? এই অন্ধকারের মধ্যে……।

যুবকটি বলে—দিনের বেলা রোদের মধ্যে এতটা পথ যেতে আপনার কষ্ট হবে। রাত্রির মধ্যেই ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চলে যাওয়া ভাল।

সোমা বলে—চল।

কোমর পর্যন্ত উঁচু ঘন ঘাসবনের মাঝখান দিয়ে একটা সরু আঁকা বাঁকা পথ। ছেলেগুলো জিনিসপত্র নিয়ে তুড়তুড় ক'রে এগিয়ে হেঁটে চলে গেল, ওরা বোধহয় সজারুর মত অন্ধকারেই ভাল দেখতে পায়। ক্ষুদ্র লণ্ঠনের আলোয় যেন বন্দী হয়ে সোমা ভয়ে ভয়ে ও ধীরে ধীরে হাঁটে, হোঁচট খায়, চোরকাঁটায় সাড়িটা কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে।

যুবকটি বলে—আপনি আস্তে আস্তে চলুন।

সোমা বলে—আর কতদূর ?

যুবক—কি ? কাঞ্চীপুর ?

সোমা—কাঞ্চীপুর তো তিন ক্রোশ শুনেই রেখেছি। গরুর গাড়ীটা কত দূর?

বৃদ্ধ একটু অপরাধীর মত স্বরে জবাব দেয়—হোই যে পাকুড়তলায়, এসে পড়েছি। আর একটু কষ্ট করে নিন।

আর কষ্ট! সোমা মনে মনে হেসে যেন তার নিয়তির এই অদ্ভুত ষড়যন্ত্রকে ধিক্কার দেয়। তার কষ্টের মূল্যই বা কি? কে-ই বা তার খোঁজ রাখে? আর তার জন্যে সমবেদনা শুনতে হবে এইখানে এসে? এই সব লোকের মুখে? সোমার কষ্টে সান্ত্বনা দেবার জন্যে পৃথিবীতে আর কোন স্থান ছিল না। বেছে বেছে, খুঁজে খুঁজে, সব সুখ সখ যত্ন আর আদরের রঙিন জগৎ থেকে দূর হ'য়ে এই অন্ধকার আর চোরকাঁটায় ভরা জগতে এসে তাকে সান্ত্বনা মেনে নিতে হবে। পোড়া কপাল আর কা'কে বলে!

পাকুড়তলায় এসে শ্রান্তভাবে সোমা দাঁড়ায়। বৃদ্ধ গাড়ি হাঁকাবার জন্য উঠে বসে। যুবকটি বলে—গাড়ি চড়ে গেলেও আপনার খুব কষ্ট হবে। কাঁচা সড়ক, তার ওপর খানা গর্ত আছে, একটু ঝাঁকুনি ভুগতেই বে।

আবার সমবেদনা। সোমা যুবকটির দিকে তাকায়, লণ্ঠনের আব্ছা আলোতে মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু পরিচ্ছদটা স্পষ্ট হয়েই চোখে পড়ে। একটা খদ্দরের ফতুয়া গায়, আর খদ্দরের ধুতি, গেঁয়ো মানুষের পোষাকের মত হাঁটু পর্যন্ত বহর। কিন্তু ফতুয়ার বোতামে বাঁধা একটা চেন ঝুলছে দেখা যায়, বোধ হয় পকেটে ঘড়ি আছে।

সোমা মনে মনে একটা সংকোচের বিপদে জড়িয়ে পড়ে। লোকটা ভদ্রলোক নয় তো! এতক্ষণ যুবকটির সঙ্গে তুমি তুমি ক'রেই কথা বলে এসেছে সোমা। এখন হঠাৎ আপনি ক'রে বললেই বা কেমন শোনাবে, আর তুমিই বা কি করে বলা যায়? পরিচয় জিজ্ঞেসা করতেও ই'চ্ছে করে না।

বেশী চিন্তা করার সময় ছিল না। ছেলেরা এরই মধ্যে এসে গরুর গাড়ির ভেতর একটা কম্বল পেতে রেখেছে, কিন্তু সোমা গাড়ির ভেতরটা উঁকি দিয়ে দেখেই অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। বেশ একটু রূঢ়ভাবেই বলে—এইটুকু একটা গাড়ি, তার মধ্যে ঐ সামান্য জায়গা। এতগুলো লোক আর জিনিসপত্র ঢুকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাব যে!

যুবকটি বলে—গাড়ির ভেতর তো কেউ যাবে না। শুধু আপনি যাবেন।

সোমা—আমার জিনিসপত্র?

যুবক—আমরাই হাতে হাতে নিয়ে যাব।

সোমা তাকিয়ে দেখে, ছেলেরা সত্যি সত্যি তার জিনিসপত্রগুলি মাথায় আর হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি ছেলে, বছর দশেক বয়স হবে, সে-ও সোমার স্টোভের বাক্সটা মাথায় নিয়ে কৃতার্থের মত দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সোমা আবার প্রশ্ন করে—এ'ও হেঁটে যাবে নাকি?

যুবকটি উত্তর দেয়—হ্যাঁ নিশ্চয়, সবাই হেঁটে যাবে।

মনের হঠাৎ বিরক্তি ও অপ্রসন্নতার জন্য লজ্জিত হয় সোমা। সবাই হেঁটে যাবে, ঐ ছোট ছেলেটাও। শুধু সোমাকেই অসাধারণের অভ্যর্থনা দিয়ে সযত্নে নিয়ে যাবার জন্যে এরা নিঃশব্দে তৈরী হয়ে আছে। একটু অন্ধকার বেশী ব'লেই এই নীরব ও অপরিচিত পৃথিবীর মনটা বুঝতে ভুল করেছিল সোমা।

সোমা কোন কথা বলে না। কথা বলার মত আর কিছু খুঁজেও পায় না। একবার ইচ্ছে হয়, ছোট ছেলেটিকে গাড়ির ভেতর আসতে বলে। কিন্তু চেষ্টা করেও বলতে পারে না। নতুন ক'রে এই এক টুকরো ভদ্রতার দরদ দেখাতে গিয়ে হয়তো তার হঠাৎ-ভুলের অভদ্রতা আরও বড় হয়ে ধরা পড়ে যাবে। সোমা গাড়ির ভেতর গিয়ে বসে।

লণ্ঠনের আলোটা আবার আলেয়ার মত এগিয়ে দূরে চলে যায়। পেছনে গরুর গাড়ি চলতে থাকে হেলেদুলে কঁকিয়ে, অন্ধকারের মধ্যে মাথা খুঁড়ে, কখনো বা ছটফট ক'রে।

একটা ঘন বাব্‌লা বনের ভিতর দিয়ে গাড়িটা কিছুটা পথ চলে যায়। গাড়ির ছই কাঁটার আঁচড়ে সশব্দে চিরে চিরে আর্তনাদ করে। হঠাৎ একটা ঢালু ধরে উল্লাসে দৌড়তে থাকে। তারপরেই মন্থর হয়ে জলকাদায় ভরা একটা খানা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে পার হয়।

সোমার দৃষ্টির সম্মুখে কোন পথই ঠাহর হয় না। একটা শ্রান্ত অভিমানের মূর্তির মত নীরবে ব'সে থাকে। দূরে দেখা যায়—বিরাট একটা জোনাকীর দুর্গ। লক্ষ লক্ষ ভূলুণ্ঠিত নক্ষত্রসন্তান যেন আকাশচ্যুত হয়ে মাটির ওপর সংসার রচনা করেছে। আর একটু এগিয়ে গেলেই বোঝা যায়, ওটা একটা আম বাগান।

চোখ বন্ধ ক'রে নিজের মনের ভেতর তাকিয়ে সোমা আজ বুঝতে পারে, সে সত্যিই চাকরি করার টানে এখানে আসে নি। দেশসেবার আগ্রহেও নয়। সব দিক দিয়ে তার মুক্তির পথ অবরুদ্ধ ছিল, তাই স্বেচ্ছায় নিজেকে নির্বাসিত করার জন্যই যাত্রা ক'রে এই অজ্ঞাতলোকে চলে এসেছে। নইলে, কী এমন চাকৃরি? মাইনে তো ষাটটি টাকা। কিন্তু এ চাকৃরিতে যেন আত্মহত্যার সুযোগ আছে, এটাই সবচেয়ে বড় লোভ। নইলে এখানে আসবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

একটা মাঠের ওপর দিয়ে গাড়িটা চলছিল। সড়কটা এখানে এসে কেমন একটু মসৃণ হয়েছে ব'লে মনে হয়, কারণ পদে পদে আর অধঃপতন ও উর্দ্ধোৎক্ষেপের ঝাঁকুনি নেই। একটা ছন্দের আবেশে গাড়িটা তালে চলেছে। মেঠো হাওয়াও একটু ঠাণ্ডা, শিয়াল ডাকা রাত্রি, প্রহরগুলি ক্লান্ত। সোমার চোখে আপনা হতেই তন্দ্রা নেমে আসে।

এ তন্দ্রা ক্লান্তি দূর করে না, মনের চিন্তাগুলিকে একেবারে নীরব

করেও দেয় না। বরং মনটাকে একেবারে শিশুর মত অসহায় ক'রে আনে, এই অসহায় মন দু'হাত দিয়ে একটা আশ্রয় আঁকড়ে ধরার জন্য ছটফট করে আর কেঁদে ফেলে। সোমার মনে হয়, তার নিরাশ্রয় প্রাণকে, তার অভিভাবকহীন জীবনকে কতগুলি অন্ধকারের জীব বন্দী করে নিয়ে চলেছে কোন্ এক বধ্যভূমির দিকে।

তন্দ্রা ভেঙে যায়, কিন্তু ভয় ভাঙে না। হাওয়াটা কেমন স্যাঁতসেঁতে। লণ্ঠনের আলোটাও সামনে আর দেখা যায় না।

—আর সবাই কোথায় গেল? সোমা ভয়ার্ত ভাবেই প্রশ্ন করে।

বৃদ্ধ উত্তর দেয়—সবাই আছে আগে আগে।

সোমা নিঃসংশয় হতে পারে না।—কোথায় আছে? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

বৃদ্ধ—সবাই নরসিংহতলায় আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। নিশ্চয় আছে।

সোমা—আমরা কতদূর এসেছি?

বৃদ্ধ—এটা হলো ঠাকুরপুরের বিল।

সোমা—ঐ আলোটা কিসের?

বৃদ্ধ—চিতা জ্বল্ছে।

ঠাকুরপুরের বিলের স্যাঁতসেঁতে হাওয়া আর দূরের চিতা-জ্বলা আলোকের দিকে তাকিয়ে সোমা তার জীবনের বিদ্রূপগুলির তাৎপর্য একে একে বুঝতে পারে। কাকিমা বলেছেন—চিল্ড্রেনস্ হোমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট! কথাগুলি অলংকারে ঝন্ ঝন্ করছে। কিন্তু হাসি পায়, ঠাকুরপুরের বিল আর জলন্ত চিতার পাশ কাটিয়ে আরও অন্ধকারে এগিয়ে না গেলে এত বড় চাকুরির ঠাঁই যেন আর খুঁজে পাওয়া যেত না।

গ্রাম সেবা মণ্ডলের প্রেসিডেণ্ট নয়নবাবু তবু বাংলা ভাষাতে

চাকুরিটাকে একটু গরিব ক'রে দিয়েই বলেছেন—কাঞ্চীপুরের শিশুভবনের অধ্যক্ষা।

অধ্যক্ষা কথাটাও বিদ্রূপের মত শোনায়। মাইনে তো ষাট টাকা। শিশুভবন কথাটাও অপলাপ ছাড়া আর কি? অন্ধকারের ভেতর ছ'ক্রোশ এগিয়ে গিয়ে চোরকাঁটার মাঠ, বাব্‌লা বন, জলো বিল আর চিতার আলো পার হয়ে যেতে যেতে যে-দেশের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, বিধাতাই জানেন সেদেশের শিশু কেমন আর ভবনই বা কেমন।

নরসিংহতলা। একটা নিরেট চেহারার মন্দির, ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরী ভিৎ খুব উঁচু, কেল্লার বুরুজের মত দেখায়। বট তেঁতুল আর আম গাছের কুঞ্জের মত জায়গাটা। ছোট ছোট কয়েকটা শূন্য চালা ঘরও দেখা যায়, বোধহয় দিনের বেলায় হাট বসে।

লণ্ঠনধারী সেই যুবক ও ছেলেরা সত্যিই নরসিংহতলায় অপেক্ষা করছিল। সোমা গাড়ি থেকে নামে। জিজ্ঞেস করে—কাঞ্চীপুর আর কতদূর? বাকী পথটুকু হেঁটে গেলে হয় না?

যুবক উত্তর দেয়—মাত্র আর দেড় মাইল, রাস্তাও ভাল, হেঁটে যেতে পারবেন বোধ হয়।

যুবকটি লণ্ঠন নিভিয়ে দিল।

সোমা চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে রাত্রিটা আর তত কালো নেই, ফিকে হয়ে আসছে। নরসিংহ মন্দিরের গায়ে পদ্মকাটা ইটগুলিও চিনতে পারা যায়। কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাত্রি, ফালি চাঁদ ভেসে উঠেছে আকাশে। দূর ঠাকুরপুরের বিলের ওপর সাদা কুয়াশা থম্ থম্ করে। নরসিংহতলায় অকস্মাৎ লুটোপুটি আলোছায়ায় একটা হাসি হাসি রূপ ফুটে ওঠে।

সোমা কি কারণে খুশী হয়ে ওঠে, হয়তো সে নিজেই জানে না। ছোট ছেলেটির কাছে এগিয়ে যায়। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে—কি? তোমার ঘুম পায় নি?

ছেলেটি সপ্রতিভভাবেই উত্তর দেয়—না আজ্ঞা।

সোমা আদর করেই বলে—এবার আর তুমি হাঁটতে পারবে না। গাড়িতে উঠে বসো।

ছেলেটি প্রশ্ন করে—আর আপনি ?

সোমা—আমি হেঁটে যাব।

ছেলেটি তখুনি মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়—তাহ'লে আমিও আপনার সাথে হাঁটবো।

—কিন্তু আর এত বোঝা বইতে হবে না!

সোমার কথা মত ছেলেরা জিনিসপত্রগুলি গাড়ির ভেতর তুলে দিতে বাধ্য হয়।

যুবকটি সোমাকে প্রশ্ন করে—আর একটু জিরিয়ে নেবেন, না এখনই রওনা হবেন ?

সোমা একটু দ্বিধাবিব্রত স্বরে বলে—এখুনই…আচ্ছা……চলুন।

নরসিংহতলার আলোছায়ার কুঞ্জ ছেড়ে দিয়ে বাইরে আসতেই যেন এক অবারিত আলোকাপ্লুত পৃথিবীর মধ্যে এসে পড়্‌লো সোমা। একটা দুর্ভেদ্য কালো সংশয় আর অবিশ্বাসের ঘেরাটোপে যেন ঢাকা পড়েছিল এই রূপকথার দেশ। নিকটে ও দূরে এক একটা স্বপ্নালু তাল বনের মাথা চিক্ চিক্ করে, মাঝে মাঝে ঘুমভাঙা পাখির মৃদু কলরব। সড়কটা একটা শীর্ণ নদীর গা ঘেঁষে চলেছে, মাঝে মাঝে জলভরা দহ, কিনারায় বাঁশের খুঁটোয় মাছধরার জাল ঝুল্‌ছে।

চল্‌তে চল্‌তে সোমা প্রশ্ন করে—ওটা কি নদী ?

যুবকটি উত্তর দেয়—ওর নাম মরা কালিন্দী।

মরা কালিন্দীকে মরা বলে তো মনে হয় না। কে জানে দিনের বেলা দেখতে কেমন! এখন কিন্তু বর্ণে গন্ধে রূপময়। জলটার চেহারা তরল রূপোর মত। আর গন্ধ ? তা'ও পাওয়া যায়, নিশ্চয় একটা কেয়া

বন আছে নিকটে। যাই হোক্, সেটাও যেন শেষ রাত্রির নিঃশব্দ প্রবাহিনী মরা কালিন্দীর গাম্ভীর্যসৌরভের মত।

যুবকটির মুখটাও এখন স্পষ্ট করে দেখা যায়। মুখের চেয়ে মুখের ছাঁদটাই আরও স্পষ্ট। সোমার মনে হয়, এ'কে যেন কোথাও দেখেছি। কিন্তু শত চেষ্টা করেও মনে পড়ে না, কোথায়?

সোমা গরুর গাড়ির পেছু পেছু এক হাতে ছইয়ের একটা কোনা ছুঁয়ে আস্তে আস্তে চলছিল। ছেলেরা এবং যুবকটিও নিঃশব্দে চলছিল। কিন্তু এখনও দেড় মাইল পথ হাঁটতে হবে, এই মূক অভিযান ভাল লাগছিল না সোমার। কথা বলতে পারলে শ্রান্তিটা এত ভারি হয়ে সারা দেহ চেপে ধরতো না। কিন্তু কথা বলার কি বা আছে এবং কার সঙ্গেই বা বলা যায়!

সোমা দেখতে পায়, সঙ্গী যুবকটিও এক মনে নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে। নেহাৎ ছেলেমানুষের মতই মুখ, কেমন একটা ছবির মত লম্বা লম্বা টানা রেখা দিয়ে আঁকা। সোমার এতক্ষণে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, চুনি যে মহাভারত বইটা পড়ে, তার মধ্যে এই রকম একটি চেহারার ছবি আছে। একলব্যের ছবি।

মনে মনে হাসি পেলেও একটু নিশ্চিত হয় সোমা—যাক্, চেনা কেউ নয়।

কিন্তু লোকটি কে? সত্যিই কি ভদ্রলোক? জানবার জন্যে বারবার কৌতূহল হ'লেও সংকোচের বাধা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না সোমা। এটাও খুবই আশ্চর্যের বিষয়। দুঃসাহসিকার মত যে মেয়ে তার জীবন ও জীবিকার ভূমিকাই বদ্‌লে দিয়ে একাকিনী এই নির্বান্ধব দেশে চলে আসতে পারলো, তার পক্ষে কথা বলার এতখানি সংকোচ ঠিক শোভা পায় না। কোন অর্থও হয় না।

সোমা প্রশ্ন করে—কাঞ্চীপুরে কত লোক আছে?

যুবক উত্তর দেয়—দু'শো ঘর হবে।

সোমা—ভদ্রলোক আছে?

যুবক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সোমা—ক'জন?

যুবক—সবাই।

সোমার নিঃসংকোচ প্রশ্নের অভিযান হঠাৎ একটা আঘাত পেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। কাঞ্চীপুরে সবাই ভদ্রলোক, এর অর্থ যাই হোক, যুবকটির ছোট্ট উত্তরের মধ্যে অন্য একটা অর্থ অতিশান্ত অথচ অতিকঠিন প্রতিবাদের মত ধ্বনিত হয়। সবাই ভদ্রলোক! কলকাতার সংস্কার দিয়ে গড়া সোমার ভদ্রয়ানার ধারণা এই কথার আঘাতে যেন একটু মুসড়ে পড়ে। কিন্তু কি ভাবে কোন্ কথা বললে এই কথার ভুল শুধ্‌রে দিতে পারা যাবে, তাও ভেবে উঠতে পারে না সোমা।

সোমা কুণ্ঠিতভাবে বলে—আমি জিজ্ঞেসা করছিলাম শিক্ষিত লোক ক'জন আছে?

যুবক উত্তর দেয়—একজন।

সোমা—মাত্র একজন?

যুবক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সোমা—তিনি কে?

যুবক—কাব্যতীর্থ মশাই।

সোমা জোর করে একটু বেহায়া হবার চেষ্টা করে।—আপনি কি করেন?

যুবক—আমি গ্রামসেবার কাজ করি।

সোমা—নয়নবাবুদের গ্রামসেবা মণ্ডলে আছেন?

যুবক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আবার নীরবে পথ চলা। সোমার সব কৌতুহলের সদুত্তর পাওয়া গেছে

কিন্তু আর প্রশ্ন করার উৎসাহ হয় না। পথটাও ফুরোয় না, হাঁটতে শ্রান্তি বোধ হয় সোমার। গ্রাম্য একলব্যের মুখটাও অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে গেছে।

ভোর হয়ে গেছে। ছেলেরা বলে— পৌঁছে গেছি কাঞ্চীপুর।

একটা বেড়াঘেরা কুটীরের কাছে গাড়িটা এসে থামে। দুটো কুকুর ছুটে এসে অনবরত চীৎকার করে।

হঠাৎ, ভোরের পাখির দলের মতই কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে কুটীরের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে গাড়ির কাছে দাঁড়ায়। সোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। একসঙ্গে কলরব করে—গুরু-মা গুরু-মা, আমাদের গুরুমা।

গ্রাম্য একলব্য ছোট ছেলেগুলিকে শান্ত করে— যাও, এখন বিরক্ত করো না।

ছেলেরা আবার নিঃশব্দে কুটীরের ভেতর ফিরে যায়। গাছপালার আড়ালে কুটীরগুলি তখনো ঝাপ্‌সা হয়ে লুকিয়ে আছে। সোমা দু'চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে যেন জায়গাটার সত্যিকারের স্বরূপ সন্ধানের একটু চেষ্টা করে, কিন্তু স্পষ্ট ক'রে কিছুই ঠাহর হয় না। সোমা বলে— এটাই কি শিশু-ভবন?

যুবক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সোমা—তাহলে জিনিসপত্র নামিয়ে নিই।

যুবক—আজ্ঞে না, এখন আপনাকে কাব্যতীর্থ মশাইয়ের বাড়ীতে যেতে হবে। ওঁর স্ত্রী বার বার ক'রে আমাদের বলে দিয়েছেন, আপনি এলে প্রথমে ওঁর বাড়িতেই উঠতে।

সোমা বিরক্তি চেপে রেখে বলে—চেনা নেই শোনা নেই, হঠাৎ একজনের বাড়িতে ···তা ছাড়া ওঁদের মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে কি লাভ?

যুবক—আপনি ক্লান্ত হয়েছেন, এবেলাটা ওঁদের ওখানেই বিশ্রাম নিয়ে

শুবেলা শিশুভবনে আসতেন। সেটাই তো সবচেয়ে ভাল হতো। তা ছাড়া, ওঁরাও খুব খুশী হতেন।

সোমা বলে—তবে তাই চলুন।

বেশীদুর এগিয়ে যেতে হয় নি। গরুর গাড়ির শব্দ শুনতে পেয়ে সেই আব্ছা ভোরেই অপরাজিতার বেড়ায় ঘেরা একটা কুটিরের দরজায় প্রদীপ হাতে নিয়ে একটি বৌ দাঁড়িয়ে ছিল। সোমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বললো—আসুন ভাই।

ঐশ্বর্যের ভারে অন্তর সঙ্কুচিত হয়, নয়নকে হঠাৎ দেখলে একথা মনে হবে না।

বাপের এক ছেলে নয়ন। বাপ বিগত হয়েছেন, কিন্তু রেখে গেছেন অনেক। জমি জমিদারী বাড়ি ও গাড়িতে, তা ছাড়া শেয়ারে নগদে আর কোম্পানীর কাগজে প্রচুর। আর রেখে গিয়েছেন একদল মক্কেল, বারমেসে দেওয়ানী মামলায় যারা সম্পত্তির ফাট্‌কা নিয়ে মাতোয়ারা।

কিন্তু সবই ব্যর্থ। ওকালতী পাশ করেও নয়ন আদালতে ভিড়তে পারে নি। পিতৃদত্ত সম্পদ বিলিয়ে দিতে পারেনি সত্য, কিন্তু দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেও রাখছে না। এক বছর আগেও যতটা ছিল, এখন আর ততটা নেই, পুরো পাঁচটি হাজার টাকা কমেছে দান খয়রাতের কারণে। কিন্তু তারই শোকে পিসীমা কেঁদে ভাসিয়েছেন এবং তারই গল্প ফলাও হয়ে রটতে রটতে নয়নকে একেবারে সর্বস্বত্যাগীর দলে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। অনেকে বলেন, স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ উকীলের ঐশ্বর্যের স্তূপে ভাঙন ধরলো এতদিনে। তবে ভাঙতেও কিছু সময় লাগবে, স্তূপটা তো আর নিতান্ত সামান্য রকমের ছিল না।

নয়নের চেয়ে বেশী বড়লোকের ঐশ্বর্য, এর চেয়ে অনেক বড় বড় স্তূপও ভেঙে-চুরে একেবারে উপে গেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। মেজাজের

ঝড়ে, খেয়ালের খেলায় অথবা নানারকম চরিত্রের প্রকোপে অনেক বনেদী ইমারত ধূলো হয়ে গেছে। পিতৃদত্ত সম্পদের পাঁচটি হাজার টাকা যে দানের ঘুণে খেয়ে গেল, সেটা আদৌ নিজের স্বার্থের খেয়ালে নয়, দশজনের মঙ্গলের জন্যই। আত্মীয়েরা বলে মূর্খ, প্রতিবেশীরা বলে স্বদেশী চালিয়াতি। ভৈরববাবুদের আর একটা দেশকর্মী দল আছে, তারা বলে—বিপ্লববিরোধী ফন্দিবাজ।

এসব অভিযোগ বিশ্বাস করার মত মানুষ মতিগঞ্জ শহরে কম নেই। আবার অবিশ্বাস করার মত মানুষও আছে। নয়ন ছেলেটি মূর্খ নয়, চালিয়াতও নয়, আর ওর চক্রান্তই বা কি থাকতে পারে, তা'ও সহজে বোঝা যায় না। লোকে জানে, একটা মস্ত বড় আদর্শের প্ল্যান নিয়ে সে দেশের কাজে নেমেছে। একবার ভুল করে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল নয়ন। ভৈরববাবুদের একটি ইস্তাহারের আঘাতেই সন্ত্রস্ত হয়ে নাম প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছিল।

গ্রাম সেবা মণ্ডলের অফিসটা নয়নদের বাড়ির বৈঠকখানাতেই। এ গ্রাম ও গ্রাম থেকে কর্মীরা আসে। নয়নের কাছে কাজের হিসেব দেয়, কাজের পরামর্শ নেয়। হয়তো দু'দিন থাকে, তারপরেই যে যার গ্রামে বা কর্মকেন্দ্রে চলে যায়। টাকা ছাড়া এসব কাজ চলে না, এ বিষয়ে অনেকখানি ভরসা হলো স্বয়ং নয়ন। নয়নের মনটা যদি এই নীরব সেবার আদর্শকে এক বছরে পাঁচটি হাজার টাকা খরচ ক'রে না পুষতো, তবে কি হতো বলা যায় না। কিন্তু জেলা মতিগঞ্জের অন্তত ত্রিশটা গ্রামের প্রাণ একটু অসাড় হয়ে পড়ে থাকতো বৈকি। গ্রামগুলি আগে কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে, তুলনা করতে হলে যেতে হয় কাঞ্চীপুরে। একটা শিশুভবন, একটা বাণীপীঠ, একটা চরকা প্রচারের আশ্রম, কাঞ্চীপুরের সেবাকেন্দ্র চারদিকের পনরটা গ্রামের অবসন্ন সত্তাকে যেন সকল দীনতা ও গ্লানির পঙ্কশয্যা থেকে উদ্ধার করে বাঁচিয়ে

রেখেছে। বহু সেবাকর্মীর কায়মন নিষ্ঠার জন্যেই একাজ সম্ভব হ[illegible]
কিন্তু এর মধ্যে নয়নের টাকার সাহায্যটুকু ছিল বলেই এত দ্রুত এ[illegible]ন
হতে পেরেছে।

এর মধ্যে দোষের কি থাকতে পারে? ভৈরববাবুরা বলেন, [illegible]র
আগাগোড়াই দূষণীয়, অপদার্থ ও অবান্তর। এসব কাজ মানুষকে ঝি[illegible]
রাখা আফিং খাওয়ানো ব্যাপার। দুঃখের বিরুদ্ধে মারমুখো হয়ে যা[illegible]
উঠতে চায়, তাদের ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া। নয়ন না হয় টাকা ঢাল্‌ছে,
এতগুলি কর্মীও কাজ করছে, কিন্তু হিসেব ক'রে দেখা যাক্, কাঞ্চীপুর কি
স্বর্গ হয়ে উঠেছে? ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণাও বিরাজ করেন না, দুধের সরোবরও
নেই, মাটিতেও সত্যি সোনা ফল্‌ছে না।

ভৈরববাবু তাঁর বক্তৃতায় বিশেষ ভাবে কাঞ্চীপুরের উদাহরণ উল্লেখ
ক'রে বলেন—ঐ তো জাজ্জ্বল্যমান ব্যর্থতার প্রমাণ। কিছু হয়নি, হতে পারে
না, ওপথে স্বাধীনতা আসে না। মারতে না পারলে কিছু হবে না।
মারতে হবে, নিরন্তর অবিশ্রাম আঘাত হেনে যেতে হবে, তবেই
সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ হবে।

ভৈরববাবু তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট করে বলেন না যে কাকে মারতে হবে
কি অস্ত্র দিয়ে মারতে হবে, তাও ভাল ক'রে জানিয়ে দেন না। তবে
পলিটিক্স সম্বন্ধে যাদের যৎসামান্যও ধারণা আছে, তারা অবশ্য বুঝতে পারে
যে, ভৈরববাবু ব্রিটিশ শক্তিকেই মেরে সায়েস্তা করার জন্যে বলছেন এবং
নিরামিষ উপায়ে নয়, কামান-বন্দুক দিয়েই মারতে বলছেন।

মতিগঞ্জ শহরে এইভাবেই পলিটিক্স চলে। ভৈরববাবুর বক্তৃতায়
পরের দিন দেখা যায়, কারা যেন রাত্রির অন্ধকারে সত্যিই আঘাত হেনে
চলে গিয়েছে, গ্রাম সেবামণ্ডলের সাইনবোর্ডটার ওপর ইট দিয়ে।
পলিটিক্সের বৈপ্লবিক আঘাতে বেঁকেচুরে সাইনবোর্ডটা তেমনি পড়ে থাকে।
নয়ন আর মেরামতও করে না।

অথচ ভৈরববাবু আর নয়ন, দুজনেই কংগ্রেসের লোক। মতিগঞ্জের জনসাধারণের কাছে এই একটা রহস্য। ভৈরববাবুকে বুঝতে কষ্ট হয় না, নয়নকেও বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু দু'জনকে একসঙ্গে মিলিয়ে কংগ্রেস ক'রে নিয়ে বুঝতে একটু কষ্ট হয় বৈকি। স্বাধীনতা দিবসে নয়নের বাড়িতে সেবাকর্মীরা চরকা কেটে সূত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। আর ভৈরববাবুদের একটা ব্যাণ্ড পার্টি সারা সহর 'চাই রুধির, চাই রুধির' সুর বাজাতে বাজাতে কুচকাওয়াজ ক'রে ঘুরে যায়। মতিগঞ্জের জনসাধারণ যেমনটি দেখে, ঠিক তেমটি বিশ্বাস করে—ঐ দুই মিলিয়েই কংগ্রেস। সম্ভব হলে চরকা, আর সুযোগ পেলেই রুধির।

যদি মতিগঞ্জ শহরের গত দশ বছরের ইতিহাস ধরা যায়, তবে এটাও প্রমাণিত হবে যে, এখানে চরকাও সম্ভব হয়নি, রুধির নেবার সুযোগও ঘটেনি। দু'টোই কথার কথা হয়ে আছে মাত্র। বছরে এক আধবার গ্রাম সেবামণ্ডলের কেন্দ্রীয় অফিসে অর্থাৎ নয়নদের বৈঠকখানায় কতগুলি চরকা কয়েক ঘণ্টার মত গুন্ গুন্ ক'রেই নিস্তব্ধ হয়ে যায়। দশ বৎসরের মধ্যে রুধিরের ব্যাপার একটি মাত্র হয়েছিল। পট্‌কার বারুদ দিয়ে ঠাসা একটা নারকেলের খোল একজন ঘুমন্ত পাহারাওয়ালার গায়ে ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। পাহারাওয়ালা আহত হয়েছিল। একটু রুধিরপাত হয়েছিল বৈকি। এই ঐতিহাসিক ঘটনার জের সহজে মেটেনি, এক মাস ধরে ধরপাকড় আর খানাতল্লাস এবং তিনমাস ধরে মামলার পর কুড়িজনেরও ওপর লোকের জেল হয়।

এতদূর গড়িয়েও জের মেটেনি। মতিগঞ্জের ইতিহাসে ঐ রুধিরাক্ত দিবসটিই ভৈরববাবুর পলিটিক্সের সবচেয়ে বড় সম্বল হয়ে আজও রয়েছে। ঐ একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি প্রতি বক্তৃতায় মতিগঞ্জের বিদ্রোহী আত্মাকে সংগ্রামের আহ্বান শুনিয়ে সর্বদা প্রস্তুত ক'রে রাখেন। রুধিরের চেয়ে রুধিরের আহ্বানটাই বেশী লাল হয়ে ওঠে এবং এই রক্তাক্ত

আহ্বানের জোরেই মতিগঞ্জের শতকরা আশীটি ভোটে সমাদৃত হয়ে ভৈরববাবুর দল মিউনিসিপ্যালিটি অধিকার করতে পেরেছেন। চরকাবাগীশ নয়নের সাধ্য নেই যে, ভৈরববাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।

ভৈরববাবুর চিন্তার একটা সমস্যা হলো, গ্রামসেবার ওপর নয়নের এত ঝোঁক কেন? খবরের কাগজে নামও ওঠে না, অথচ বাপের দেওয়া পয়সাগুলি মিছিমিছি উজাড় হয়ে যায়। সত্যিই কি নয়ন বিশ্বাস করে যে, গ্রামের মশা মেরে আর চরকা চালিয়ে স্বাধীনতা আসবে?

নয়নকে এতটা আদর্শবাদী বলে ভাববার মত কারণ খুঁজে পান না ভৈরববাবু। বটকৃষ্ণ উকিলের ছেলে নয়ন, যে বটকৃষ্ণ পয়সা উপার্জনের জন্য হেন অপকার্য নেই করেনি। তারই ছেলে হঠাৎ প্রহ্লাদ হয়ে গেছে, এতটা বিশ্বাস করা যায় না।

তবে কারণটা কি? গ্রামের দিকে নয়নের মত বড়লোকের নাড়ুগোপালের এত ঝোঁক কেন? ভৈরববাবুর হঠাৎ সন্দেহ হয়—খুব সম্ভব জেলা বোর্ডের ওপর নয়নের নজর পড়েছে।

যেমন সন্দেহ হয়, তেমনি সতর্কও হয়ে ওঠেন ভৈরববাবু। এবার থেকে গ্রামের দিকে তাঁকেও একটু ঝুঁকতে হবে।

ভৈরববাবুদের অভিযোগ সবই লোকমুখে শুনতে পায় নয়ন। কিন্তু তাতে তার মনের শান্তি কখনও নষ্ট হয়নি। লোকের কাছে তার নিজের দিকটা ব্যাখ্যা ক'রে জানিয়ে দেয়—সে যে চুপ করে বসে নেই, একটা কাজ করতে পারছে, এই যথেষ্ট। তার সব সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে গ্রামসেবা করেও যদি স্বাধীনতা না আসে, তাতেই বা দুঃখ করার আছে কি? একটা আদর্শের মধ্যে যদি এইভাবে তার জীবন ফুরিয়ে যায়, তাই তো পরম লাভ।

নিজেকে অনেকবার প্রশ্ন করেছে, অনেক বিচার করে দেখেছে নয়ন।

কিন্তু তার চিন্তায় আর অনুগ্রহে, তার বেদনা ও মমতায় কোন ফাঁকি আছে বলে সে মনে করে না। সে বিশ্বাস করে, তার যতটুকু সামর্থ্য, সবই উৎসর্গ করে দিয়েছে সে। এক বছরে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে, তার জন্যে বিশেষ কাতর হয়নি নয়ন।

এক একটি করে সাফল্যের খবর আসে—কাঞ্চীপুরের তাড়ির দোকান উঠে গেছে, মিঞাবাজারে পঞ্চাশটা তাঁত আবার জেগে উঠেছে, নরসিংহতলার হাটে যারা ভিক্ষে করতো, তারা ভিক্ষে ছেড়ে দিয়ে চরকা ধরেছে। ঠাকুরপুরের চাষীরা নিজেরা দলবেঁধে খেটেখুটে একটা বাঁধ বেঁধেছে, যার ফলে তিন হাজার বিঘা জমির ধান মরাকালিন্দীর প্লাবন থেকে এবার বাঁচতে পারবে। নয়নের মনটাও এক রকমের নিরীহ গর্বে ভরে ওঠে। এ সব তো তারই দানের মহিমা। নাই বা হলো স্বাধীনতা, এতগুলি মানুষের সেবায় তার টাকাগুলো যে সার্থক হচ্ছে, এটাই বা কি তার কম আনন্দের বিষয়?

অবসর সময়ে লাইব্রেরী ঘরের নিভৃতে বসে নয়ন নিজেকে অনেক সময় পরীক্ষা করেও দেখেছে। দেখেছে তার মনের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। এ দেয়ালে মহাত্মা গান্ধীর সুস্মিত মূর্তি, ও দেওয়ালে বীর-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। টেবিলের ওপর কাঞ্চীপুরের কুমোরের তৈরী মাটির ফুলদানিতে সাদা ফুলের স্তবক। সারি সারি গ্রন্থ, যুগ-যুগান্তের সাধক মানুষের এক বাণীময় মালঞ্চ। এই সুপবিত্র পরিবেশের মধ্যে কিছুক্ষণ বসে থাকলে মনটা যেন একটা বিশ্বাসে সুরভিত হয়ে ওঠে। তার টাকা খরচ সার্থক হয়েছে। শুধু নিজে ধন্য নয়, অপরকেও ধন্য করে দিয়েছে নয়ন। নয়নের আত্মপ্রসন্নতা দিন দিন বেড়ে উঠতেই থাকে।

আজ অনেকদিন পরে নয়ন একটু আনমনা হয়ে লাইব্রেরী ঘরে বসেছিল। এতদিনের আত্মপ্রসন্নতার পথে কোথায় যেন একটা বাধা

এসে দেখা দিয়েছে। একটা অলক্ষ্যে সংশয় থেকে থেকে এসে তার চোখের দৃষ্টিটাকে ক্ষণিকের মত বিষণ্ণ করে তোলে।

কাঞ্চীপুরের শিশুভবনটা ভাল চলছিল না, কিন্তু এখন থেকে ভাল চলবে বলেই মনে হয়, কারণ একজন সুযোগ্যা অধ্যক্ষা পাওয়া গেছে। এটাও আনন্দের বিষয়। তবু আজ নয়নের চিন্তাগুলি কেমন এলোমেলো হয়ে যায়।

সোমা এখানে এসে একদিন ছিল। কাল রাত্রে চলে গেছে। আজ সকালে লাইব্রেরী ঘরে পড়তে বসেই নয়নের সর্ব প্রথমে মনে পড়ে সোমার কথা।

কলকাতায় মানুষ হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, অথচ কাঞ্চীপুরের মত অজ পাড়াগাঁয়ে একটা সামান্য মাইনের চাকরি নিয়ে চলে গেল। সত্যিই কি চাকরিটাই ওর কাছে সবচেয়ে বড় কাম্য?

নয়ন একটু সন্দিগ্ধভাবেই জিজ্ঞেসা করেছিল—আপনি শুধু চাকরি করার আগ্রহেই এসেছেন বলে মনে হয় না, নিশ্চয় দেশসেবার একটা আদর্শও আপনার আছে।

সোমা উত্তর দেয় –দেশসেবা আমি কখনও করিনি, দেশসেবার কিছু বুঝিও না। আমি চাকরি করতেই এসেছি।

নয়ন অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞেসা করে—যাই হোক্, টিকে থাকতে পারবেন তো?

সোমা—মাইনেটা নিয়মিত পেয়ে গেলে নিশ্চয় টিকে থাকতে পারবো।

সোমা যেভাবে কথা বলে এবং তার কথায় যে মতবাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা শোনার পর গ্রামসেবার কাজের পক্ষে তাকে সবচেয়ে অবাঞ্ছনীয় বলেই মনে করা উচিত। নয়ন কিন্তু তা মনে করতে পারেনি, হিতেনবাবুর চিঠির অনুরোধ মত সোমাকে ষাট টাকা মাইনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাঞ্চীপুরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আসল কথা হলো, সোমার কথাগুলিকে আদৌ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারেনি নয়ন। নয়নের ধারণা, মুখে যাই বলুক না কেন, সোমা দেশসেবার আগ্রহেই এসেছে। কিন্তু মাত্র একদিনের মত দেখা, আর কিছুক্ষণের মত আলাপ, এরই মধ্যে সোমার মত মেয়ের মুখের কথাকে অবিশ্বাস করা, আর তার মনটাকে চিনতে পারা—এ অধিকার কোথা থেকে পায় নয়ন?

নিজের অধিকারের কথা ভাবছিল না নয়ন। ভাবছিল তার নিজের কথা, সোমার সঙ্গেই তুলনা ক'রে। নয়নও তো তার আদর্শে বিশ্বাসী, এই আদর্শের জন্য বছরে পাঁচটা হাজার টাকা খরচ ক'রতেও সে কুণ্ঠিত নয়, যে-পৃথিবীতে একটি টাকার জন্য মানুষের কত না কুণ্ঠা করে। কিন্তু তার সব আদর্শ একটা ভদ্রজনোচিত মাত্রার মধ্যে আছে। আর সোমা? কলকাতার মায়া, ভবিষ্যতের সব সুখ আর সোনালী দিনের কল্পনা পেছনে ফেলে রেখে, কাঞ্চীপুরের মত পাড়াগাঁয়ের সেবায় অনায়াসে চলে যেতে পারলো। এ তো মাত্রাছাড়া জীবন সঁপে দেওয়া ব্রত। সোমার মত মেয়ের পক্ষেও যতদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো, নয়ন আজ দশ বছর ধরে আদর্শকে মনে মনে বিশ্বাস ক'রে এবং একটা বছর পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে চর্চা ক'রেও ততদূর এগিয়ে যেতে পারেনি। সোমাকে যেন তার কোমল চিবুকের চেয়ে এই মাত্রাছাড়া দুঃসাহসের জন্যেই বেশী সুন্দর দেখায়। তার নিজের শান্ত শুদ্ধ ভদ্রজনোচিত জীবনটাকে একটু দুঃসাহসী করার জন্য নয়নের মনটাও কেন যেন প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ রহস্যের মত সোমার আবির্ভাব। কাঞ্চীপুরের শিশুভবনের কাজের জন্য এ ধরণের মানুষ পাওয়া যাবে, এটা অভাবিত ছিল। কথাবার্তায় কেমন একটু রূঢ়তা ফুটে ওঠে। কিন্তু মুখের চেহারার সঙ্গে সোমার মুখের ভাষা ঠিক মানানসই হয় না। চোখের দৃষ্টিটা ভীরু,

চিবুকটা বেশী রকমের কোমলতা দিয়ে গড়া। নয়ন বুঝতে ভুল করেনি, এ মেয়েকে হঠাৎ যা মনে হয়, সত্যিই তা নয়।

তবে একটু রূঢ় হওয়াই বোধ হয় ভাল। কাঞ্চীপুরের মত যে গ্রামের জীবনটাই রূঢ় হয়ে আছে, সে-গ্রামের মঙ্গলাচারে বনফুলের নৈবেদ্যই ভাল শোভা পায়।

সোমার কথা এত বেশী করে ভাবা এবং ভাবনাটাকেও এত শ্রদ্ধা দিয়ে মেশানো নয়নের মত মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। কিন্তু নয়ন বুঝতে পারে না, তার চিন্তাগুলি কতখানি অশোভন হয়ে উঠেছে। নইলে নয়ন হয়তো মনে মনে লজ্জিত হতো।

—শুনলাম তুই নাকি আজ গাঁয়ের দিকে বের হবি?

পিসীমা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। পিসীমার আকস্মিক প্রশ্নে বিব্রত হয়ে নয়ন উত্তর দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

পিসীমা আবার বলেন—কাঞ্চীপুরে যাবি বোধ হয়, আজকেই ফিরবি তো?

নয়ন একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে বলে—হ্যাঁ, বন্ধুকে অবশ্য বলেছিলাম যে আজ বাইরে যাব, কিন্তু যাওয়া হবে না।

পিসীমা বলেন—কাজ থাকে তো ঘুরে আয় না।

পিসীমার অনুরোধটা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মত মনে হয়। নয়নের গ্রামসেবার কাজকে যদি মনেপ্রাণে কেউ ঘৃণা করে থাকেন, তো তিনি হলেন একজন—পিসীমা। তাঁর চোখের সামনে ভাইয়ের এত বড় ঐশ্বর্যের পাহাড় দিন দিন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, নয়নের একটা বদখেয়ালে। মদো মাতাল হলেও বোধ হয় নয়ন এতটা হিতাহিতজ্ঞানহীন হতো না। পিসীমা বিধবা, চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাইয়ের সংসারে ছিলেন, এখন ভাইয়ের ছেলের বাড়িতে আছেন। এখন শুধু বাড়ীটাই আছে, সংসার বলে কিছু নেই। সংসারী হবার মত মতিগতিও ভাইয়ের ছেলের হয়নি।

একদিন পথে বসবে এই বদখেয়ালী ছেলে, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বসবেন। এ অবস্থায় নয়নের গ্রামসেবার আদর্শকে ক্ষমা করা তাঁর পক্ষে কত কঠিন, তা তিনিই জানেন। তিনি ক্ষমা করতেও পারেননি, সহ্য করতেও আর পারছেন না।

পিসীমা রাজনীতির কোন ধার ধারেন না, কিন্তু ভৈরববাবুর বক্তৃতাগুলি শুনতে তাঁর খুব ভাল লাগে, কারণ ভৈরববাবু যেভাবে প্রতি বক্তৃতায় চরকা চূর্ণ ক'রে থাকেন, তাতে পিসীমারই মনের আক্রোশ অনেকখানি চরিতার্থ হয়। সেবাকর্মীরা এসে যখন পাত পেড়ে খেতে বসে, পিসীমা ক্রোধ সম্বরণ করার জন্যে একটা ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকেন। আস্তে আস্তে উচ্চারণ করেন—যত সব চোর আর ডাকাত, ভাতে বিষ মিশিয়ে দিতে হয়।

নয়নকে সংসারী করবার জন্যে অনেক সাধনা ও অনেক ষড়যন্ত্র করেছেন পিসীমা। কত সুন্দরী মেয়ের ফটো আনিয়েছেন, কত বড়লোকের মেয়েকে গিয়ে দেখে এসেছেন, কত শিক্ষিতা মেয়েকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে গান গাইয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। এত ধীর ও শান্ত নয়ন পিসীমার উপদ্রবে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছে—আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন পিসীমা।

পরেশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে পিসীমার একটু অন্তরঙ্গতা আছে। তিনি বলেছেন—আপনি একটা ভুল করছেন দিদি, এরা হলো অসাধারণ ছেলে, অসাধারণ মেয়ে না হলে এদের পছন্দ হবে না।

অসাধারণ মেয়েও কম খোঁজ করেন নি পিসীমা। একটি নার্স মেয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন, ইংরিজীতে গান গাইতে পারে। মেয়ে ও মেয়ের বাপ-মা সবাই রাজী ছিল, কিন্তু অতি গোঁয়ার এবং অতি বুদ্ধিহীন তাঁর ভাইয়ের ছেলেটি রাজী হয়নি।

পিসীমা এক রকম আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। নয়নকে সংসারী

করবার মত আর কোন কৌশল আবিষ্কার করা তাঁর প্রতিভায় কুলিয়ে উঠছিল না। আজ সকালে বন্ধুর কথায় একটা খবর শুনতে পেয়ে তাঁর চক্ষে হঠাৎ আবার আশার রেখা ঝলক দিয়ে উঠেছে। বার বার ব্যর্থ হয়েও পিসীমার মনে আজ নতুন ক'রে একটা বিশ্বাসের সাড়া জাগছে—এবার হয়তো তাঁর আশার দৃশ্যটা হঠাৎ মরীচিকা হয়ে যাবে না। নয়ন কাঞ্চীপুরে যাবে শুনতে পেয়েই পিসীমা লাইব্রেরী ঘরে নয়নের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—কাল যে মেয়েটি এসেছিল, তাকে কোথায় কাজ দিয়েছিস, কাঞ্চীপুরে ?

সব খবর জেনেশুনেই পিসীমা অনর্থক এই প্রশ্ন করলেন।

নয়ন সংক্ষেপে উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

পিসীমা বলেন—মেয়েটী বেশ।

নয়ন তার মনের অজ্ঞাতসারে চম্‌কে ওঠে—কে ?

পিসীমা বলেন—সোমা।

নয়নের চোখের দৃষ্টি কুণ্ঠিত হয়ে সামনের পাতাখোলা বইটার ওপর ঝুঁকে পড়ে। পিসীমা কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন, দুঃসহ একটা অস্বস্তি বোধ করছিল নয়ন। এ সময়ে পিসীমার আবির্ভাব নেহাৎ আক্রমণ বলেই মনে হয়। পিসীমা কি নয়নের এলোমেলো চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনে ফেলেছেন ?

নয়নের মৌন মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে পিসীমার চোখে আর এক ঝলক ভরসার জ্যোতি ফুটে ওঠে।—একা একা অজ পাড়াগাঁয়ে থাকবে মেয়েটা, আমি সোমাকে বলেছি, যখনই মন খারাপ লাগবে, যেন এখানে এসে বেড়িয়ে যায়।

মুখ তুলে একটা শাণিত দৃষ্টি দিয়ে পিসীমার দিকে তাকিয়ে নয়ন বলে—আপনি অন্যায় করেছেন পিসীমা। সে এখানে আসবে কেন ?

নয়নের চিরকেলে ধীর স্থির মূর্তিটার গায়ে জ্বালা লেগেছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু কার বিরুদ্ধে এই আক্রোশ? শত বিরক্ত হলেও পিসীমার দিকে এত কঠোরভাবে তাকিয়ে থাকার ছেলে নয় নয়ন। নিজেরই মনের দিকে তাকিয়ে একটা পথ-ভুল-করে-দেওয়া ছলনার বিরুদ্ধে তার অন্তরাত্মা বোধ হয় বিদ্রোহ করে উঠেছে।

পিসীমা অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন, তারপর তাঁর ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হৃদয়ের বেদনা লুকিয়ে ফেলবার জন্যে নিঃশব্দে চোখ মুছতে মুছতে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন।

কাব্যতীর্থের বাড়ী। তিনটে মেটে ঘর, মাথায় খড়ের ছাউনি, আঙিনাটা বেশ বড়। আসবাবপত্র বলে কোন পদার্থ নেই। বাইরের ঘরে একটা মাদুর পাতা। বাইরের লোকজন এলে এখানেই বসে। কাব্যতীর্থের স্ত্রী শুচি ব্যস্তভাবে সোমাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে বসায়।

শুচিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় সোমাকে, একটা কলাবাগানের ভেতর দিয়ে পুকুর ঘাটে। পদ্মপাতার পাশে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে এত ভোরে স্নান করতে ভালই লাগলো সোমার।

সোমার আপত্তি সত্ত্বেও শুচি জোর করে সোমার ছাড়া শাড়ীটা জলকাচা করে নিংড়ে নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে—চলুন, এবার আরাম করে একটা ঘুম দিন।

ক্লান্ত দেহ মাদুরের ওপর এলিয়ে দিয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল সোমা। শুচি এসে বলে—ও কি! কিছু না খেয়েই?

কাঁসার গেলাসে গরম দুধ নিয়ে এসেছে শুচি। বলে—এটা খেয়ে নিয়ে লক্ষ্মীটির মত ঘুমিয়ে পড়ুন, আর বিরক্ত করবো না।

অপরিচিত অজ্ঞাত কাঞ্চীপুরের আদরের মতই ঘুম যেন সোমার মাথাটা জড়িয়ে ধরছিল। অলস উদ্বেগহীন সুখমন্থর ঘুম। তারই মাঝে মাঝে

আধোজাগা স্বপ্নের মত কাঞ্চীপুরের ওপর একটা মমতার আবেশ। অজানা কাঞ্চীপুরের জন্য শুধু এক বোঝা ঘৃণার উপহার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সোমা। আর কাঞ্চীপুর তার অজানা অভ্যাগতাকে মহীয়সীর সম্মান দিয়ে পদে পদে অভ্যর্থনা সাজিয়ে রেখেছে। কলকাতা সহরের লাখো মেয়ের মধ্যে এক রিক্তা ও নগণ্যা নিরুপায় হয়ে কাঞ্চীপুরে চাকরি করতে এসেছে। বিধবা মা আর দুটি বোনের জন্য অন্ন সন্ধানের অভিযানে। সোমা এসেছে তার স্বার্থের দাবী নিয়ে, সে-কাহিনীর কোন কিছু খোঁজ না নিয়েই এরা এত কৃতার্থ হয় কেন ?

—সোমা। সোমা!

যেন স্বপ্নের মধ্যেই ডাক শুনতে পেয়ে ধড়ফড় করে জেগে ওঠে সোমা। শুচি হাসতে হাসতে বলে—নাম ধরেই ডাকলুম ভাই, কিছু মনে করো না, তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট।

সোমা বিব্রতভাবে যেন ঘুমের ঘোরেই বলতে থাকে—হ্যাঁ আমি ছোট, অনেক ছোট।

ছোট মেয়ের কাতর আবেদনের মতই সোমার গলার স্বর। বিশ্বাস হয় না, এ মেয়ে সামান্য চাকরি করার জন্যে দূর গ্রামদেশে স্বজনহীন একা জীবনের নির্বাসন সইতে পারে।

শুচি বলে—তোমার নিশ্চয় এখনও মায়ের কাছে শোওয়া অভ্যেস, সত্যি করে বলতো ?

সোমা বিস্মিত হয়—আপনি কি করে জানলেন ?

শুচি হেসে হেসে বলে—ঘুমের ঘোরে এত মাকে ডাকছিলে কেন ?

সোমার মুখ ক্ষণিকের মত বেদনায় ম্লান হয়ে ওঠে। শুচি যেন ঠাট্টা করার জন্যেই আরও জোরে হাসে—তাতে এত চিন্তে করার কি হয়েছে ? এখানেও সব পাবে, আমরা আছি কি জন্যে ?

আর অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না সোমার। এখানেও সব পাবে,

শুচির কথাগুলি দিব্যবাণীর মত সোমার সমস্ত চেতনায় পরিপূর্ণ আশ্বাস হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সোমা বলে—এবার আমি উঠি শুচিদি।

শুচি—কেন? কোথায় যাবে?

সোমা—শিশু ভবনে।

শুচি—তা তো যাবেই, ভদ্রলোক আসুক, তার সঙ্গে দেখা না ক'রে কি ক'রে যাবে?

সোমার মনে যেন একটা বিস্মৃত প্রশ্ন সরব হয়ে ওঠে। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেসা করে—কে ভদ্রলোক?

শুচি—যার বাড়ীতে দয়া করে এসেছ, তার সঙ্গেই দেখা না করে কি যাওয়া যায়?

সোমা এবার বুঝতে পারে—ও, তিনি বাড়ীতে নেই?

শুচি—না।

সোমা—কাজে বেরিয়েছেন?

শুচি—হ্যাঁ, কাজ আর অকাজ দুই-ই। ভোর বেলা রোজই বাণীপীঠের প্রার্থনা সেরে একবার বাড়িতে আসে, কিন্তু আজ বলে গেছে একটু দেরিতে ফিরবে।

শুচি একটু চুপ করে থাকে, তারপর বলে—তুমি ধারণাই করতে পারবে না ভাই, কেমন মানুষের সঙ্গে আমি ঘর করি।

সোমা চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, এক রিক্ত নিঃস্ব মানুষের ঘর। পাশের ঘরটারও দরজা খোলা, ঘরের অভ্যন্তরের ঐশ্বর্য্য এখানে বসেই দেখা যায়। একটা মাদুর, কতগুলি বই, আর দড়িতে সব মিলিয়ে বড় জোর তিন-চারটে ধুতি সাড়ি ঝুলছে। দেয়ালে একটা কুলুঙ্গিতে ছোট একটি আয়না, আর একটা সিঁদুরের কৌটা দেখা যায়। আর কিছু চোখে পড়ে না। মাত্র এই, এই নিরাভরণ নিরলংকার সংসারই কি শুচিদির

সংসার? শুচির মুখের দিকে তাকিয়ে সোমার মনটা সমবেদনায় মেদুর হয়ে ওঠে।

শুচি বলে—কি রকম অদ্ভুত মানুষ জান? ঘরে কোন বাক্স রাখবে না।

সোমা আশ্চর্য হয়—বুঝতে পারলুম না।

শুচি—বাক্স থাকলেই পয়সা জমাবার লোভ হয়।

বিভ্রান্তের মত তাকিয়ে শুচির অদ্ভুত ধরণের কথাগুলি শুনতে থাকে সোমা।

শুচি বলে—তুমি তো কলকাতার মানুষ, কত লোক দেখেছ। কিন্তু এ রকম অদ্ভুতটি বোধহয় দেখনি। ঘরে তালা চাবি রাখবে না, কপাটে খিল দেওয়া মানা।

সোমা—এর মানে?

শুচি—এতে মানুষকে অবিশ্বাস করা হয়।

সোমাকে আরও হতবুদ্ধি ক'রে দিয়ে শুচি এবার সলজ্জভাবে হেসে বলে—তোমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই ভাই, ঘরে একটা থালা একটা বাটি ও একটা গেলাস। এর বেশী রাখবার নিয়ম নেই।

সোমা বুঝতে পারছিল না, এর মধ্যে বিশেষভাবে লজ্জিত হবার কি আছে? শুচিই রহস্যটা ব্যাখ্যা করে বলে—সে বলে, তুমি-আমি দুজনেই যখন এক, তখন এক থালাতেই এক সঙ্গে খাব। সত্যি ভাই, এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে এখন আর ভিন্ন ক'রে পাত পেড়ে খেতে পারি না, ইচ্ছেও হয় না।

শুচিদির রিক্ত ও নিঃস্ব সংসারের রূপ দেখে কয়েক মুহূর্ত আগে বেদনা বোধ করেছিল সোমা। নিজের মূর্খতার লজ্জায় মনে মনে মরে যায়। শুচিদির শাড়ীর সংখ্যা গুণে সোমা ঐশ্বর্যের হিসাব করেছিল। ভুল ভেঙে যায় সোমার। হতবাক্ হয়ে শুচির দিকে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে থাকে। শুচিদির শাড়ীটা ঠিক মাথার ওপর ঘোম্‌টার কাছেই

অনেকখানি ছেঁড়া। কিন্তু শুচিদি হাসছিলেন। গরবিনী রাজেশ্বরীদের হাসি কাকে বলে, সোমা ঠিক জানে না। কিন্তু সোমার মনে হয়, শুচিদি যেন তার চেয়ে বেশী গর্বে হাসছেন।

শুচি দরজার দিকে তাকিয়ে বলে—আজ একটা পুকুর প্রতিষ্ঠা আছে, সেখানে মন্ত্রপাঠের পর সোজা বাড়ী ফিরবে বলে গেছে, যদি আবার কুমোর পাড়ায় চলে না গিয়ে থাকে!

সোমা—কুমোরপাড়ায় কিসের কাজ?

শুচি—বললাম যে, অকাজ। কুমোরেরা যে সব প্রতিমা গড়ে, তাতে ভুল থাকে। দেবতাদের রূপ খারাপ করে দিলে ও একেবারে সইতে পারে না।

সোমা—উনি কি মূর্তি গড়তে পারেন?

শুচি—না, কুমোরদের সামনে থেকে ও শুধু মূর্তির ধ্যান শুনিয়ে ভুল শুধরে দেয়।

হঠাৎ ঘরের ভেতর এক ভদ্রলোক প্রবেশ করেন। নিঃসংকোচে সোমার সামনে এসে সহাস্য নমস্কার জানিয়ে দাঁড়ান।

সোমা ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ায়। হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানায়। সেই ব্যস্ত মূহূর্তের মধ্যেই সোমা মনে মনে বুঝতে পারে, এতখানি শ্রদ্ধা নিয়ে জীবনে কোন মানুষকে এই বোধ হয় প্রথম সে নমস্কার করছে।

সোমা যেন নিজের মনের বিস্ময় নিজকেই শোনায়—আপনিই, কাঞ্চীপুরের কাব্যতীর্থ?

কাব্যতীর্থ সহাস্যভাবে উত্তর দেন—হ্যাঁ।

সোমা একটু প্রীতভাবেই বলে—আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে যাবার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।

কাব্যতীর্থ শুচিকে দেখিয়ে দিয়ে সোমাকে তেমনি হাসিমুখে প্রশ্ন করেন—এর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে তো?

সোমা—হ্যাঁ।

কাব্যতীর্থ—তাহলেই হলো।

হঠাৎ শুচির মাথায় হাত দিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে কাব্যতীর্থ বলে ওঠেন—এই হলো আমার কাব্য।

শুচি লজ্জিত হয় না, দূরেও সরে যায় না। কাব্যতীর্থকে দেখিয়ে দিয়ে সপ্রতিভ স্বরেই উত্তর দেয়—আর, এই আমার তীর্থ।

কাব্যতীর্থ প্রায় প্রৌঢ় হয়েছেন, শুচিদির স্বামী হিসেবে বয়স একটু বেশী বলেই মনে হয়। কিন্তু কাব্যতীর্থ ও শুচিদির দিকে তাকিয়ে সোমা দেখছিল অন্য জিনিস। মানুষের মূর্তি দেখেও এত আনন্দ হয়? সোমা যেন কোন অপার্থিব মাটী দিয়ে গড়া দুটি মূর্তির দিকে মুগ্ধ ভক্তের মত তাকিয়েছিল।

শুচির কথাতেই আবেশ ভাঙে, সোমা তার পার্থিব সম্বিৎ ফিরে পায়। শুচি বলে—আর দেরি নয়, এবার দুটি খেয়ে নাও ভাই।

আর একবার দরজার দিকে তাকিয়ে শুচি যেন কাউকে খোঁজে। তারপর খুশী হয়ে বলে—ঐ যে, প্রবীর ঠাকুরপোও এসে গেছে।

প্রবীর ঠাকুরপো? সোমা কৌতূহলী হয়ে বাইরের বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, সেই গ্রাম্য একলব্য বসে আছে।

মনটা খুশীতে ভরে ছিল সোমার। ঝড়ের রাতে পথহারা পাখির নীড় ফিরে পাওয়ার মত, ভোরের হাওয়ায় নিদ্‌হারা চাঁদের ঘুমিয়ে পড়ার মত তৃপ্তি। আত্মহত্যার জন্যে এক মরণের দহে ডুব দিতে এসে বরুণালয়ের মত এক রাজ্যে এসে পড়েছে সোমা। এর রূপ নতুন, এর সৌরভ নতুন, সুখ দুঃখ মায়া মমতাগুলিও নতুন রকমের। নেহাৎ অপরিচিত বলে প্রথমে একটু অস্বস্তি হয়, একটু পরেই ভাল লাগতে আরম্ভ করে।

সামনে একটি থালা একটি বাটি ও একটি গেলাস, এই তো শুচিদির

বৈষয়িক ঐশ্বর্যের যথাসর্বস্ব। তবু খেতে বসে সোমার বারবার মনে হয়, সে যেন দেবতার প্রসাদ খাচ্ছে।

এক রকম আনমনা আবেশের মধ্যেই সোমার খাওয়া শেষ হয়। এইবার এই ক্ষণিকের খেলার ঘর ছেড়ে কাজের ঘরে চলে যাওয়ার পালা। সোমা বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পায়, শুচিদির প্রবীর ঠাকুরপো খাওয়া শেষ ক'রে এঁটো পাতা হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোমা হঠাৎ বলে ফেলে—এ কি? আপনি এখানে বসে খাচ্ছিলেন?

প্রবীরও হেসে উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

এঁটো পাতা হাতে নিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে প্রবীর চলে যেতে কাব্যতীর্থ ও শুচি এসে সোমার কাছে দাঁড়ায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে অন্যমনা হয়ে কি ভাবছিল সোমা, বোধ হয় তার সব বিস্ময় আর কৌতূহল একটা রহস্যের সন্ধানে কিছুক্ষণের জন্য প্রবীরের পেছু পেছু পুকুরঘাটের দিকে চলে গিয়েছিল।

কাব্যতীর্থ বলেন—এবার তাহ'লে……।

সোমার উত্তর না পেয়ে শুচি বলে—কি ভাবছো সোমা?

সোমা তখুনি উত্তর দেয়—ও হ্যাঁ, আমার জিনিসগুলি দেখছি না যে।

শুচি—ওসব প্রবীর ঠাকুরপো কখন্ শিশুভবনে পৌঁছে দিয়ে এসেছে!

প্রবীর ফিরে আসে।

আর দেরি করার কোন অজুহাত নেই। সোমা বিদায় নিয়ে বলে—চলি এবার, অনেক উপদ্রব করে গেলাম।

শুচি বলে—গেলাম মানে কি? আরও উপদ্রব করতে আসতে হবে।

সোমা—বেশ, তাই হবে।

চলে যেতে উদ্যত হয়েও সোমা যেন একটা সংকোচে ইতস্ততঃ ক'রে বলে—এখান থেকে শিশুভবনে যাবার পথটা তো আমি ঠিক বুঝতে পারবো না।

শুচি বলে—তা তো পারবেই না। তার জন্যে চিন্তে কিসের?

কাব্যতীর্থ বলেন—এই যে, প্রবীর আপনাকেই নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে।

কাব্যতীর্থের বাড়ির অপরাজিতার বেড়ার সীমা পার হয়ে পথে এসে দাঁড়াতেই সোমা প্রবীরকে বলে—কাল আপনি আমাকে মিছিমিছি একটা মিথ্যা কথা কেন বললেন?

অভিযোগটা এতই আকস্মিক এবং বলার ভঙ্গীটা এতই অস্থির যে, শুনে মনে হয় অনেকক্ষণ থেকে এই কথাটা বলার জন্যে সুযোগ খুঁজছিল সোমা।

প্রবীর অপ্রস্তুত ভাবে সোমার মুখের দিকে তাকায়।—কি?

এই বোধ হয় সোমার মুখের দিকে প্রথম স্পষ্ট করে চোখ খুলে তাকায় প্রবীর। অন্ততঃ এসময়টা সোমার বুদ্ধিসুদ্ধি যদি আগের মত একটু সাবধান থাকতো, তাহলে অনায়াসেই বুঝতে পারতো যে, শুচিদির প্রবীর ঠাকুরপো নামে পরিচিত এই ভদ্রলোক সোমার প্রশ্নের ভাষা ও ভঙ্গী ভাল চক্ষে দেখছে না। কিন্তু কাঞ্চীপুরের একদিনের খাতিরেই বোধ হয় বড় বেশী আদুরে হয়ে উঠেছে সোমা। নইলে, কলকাতায় ট্রামে-বাসে যেতে কোন ভদ্রলোক ইচ্ছে ক'রে গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকলেও যে-সোমা একটা ভ্রূকুটী করতেও ভয় পেয়েছে, এখানে এসে একদিনের মধ্যে তার সব প্রশ্ন কৌতূহল আর প্রতিবাদ এত মুখর হয়ে ওঠে কেমন করে?

সোমা বলে—আপনি বলেছিলেন, কাঞ্চীপুরে কাব্যতীর্থ ছাড়া আর কোন শিক্ষিত লোক নেই।

প্রবীর—আমার তো তাই ধারণা।

সোমা হেসে ফেলে—শুচিদির কাছে সবই শুনেছি। এখানকার বাণীপীঠের হেড মাস্টার মশাইটিও রীতিমত শিক্ষিত, গ্র্যাজুয়েট।

সোমা বোধ হয় বুঝতে পারে না, কতটা মাত্রাহীন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সে

হাসছে। এতটা খুশী হওয়ার সঙ্গত কারণই বা কি থাকতে পারে? কথাবার্তার মধ্যে সেই মুখচোরা সন্দেহ আর সতর্কতার অভ্যাসও এত সহজে ভেঙে যায় কেমন করে? কী এমন নির্ভর আশ্বাসের হাওয়া আছে এখানে?

প্রবীর বলে—আমি এ শিক্ষার কথা ধরিনি। কাব্যতীর্থের তুলনায় আমার শিক্ষাকে আমি শিক্ষা বলেই মনে করি না।

সোমা—তাহলে আমি তো কিছুই নই, আপনার মত বি এ পাশও করতে পারিনি।

প্রবীর—ভালই করেছেন।

কিছুটা পথ নিঃশব্দতার মধ্যেই দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে পার হয়। বাঁশবনের স্যাঁতসেঁতে ছায়ার ভেতর দিয়ে, এঁদো ডোবা আর পানায় ভরা পুকুরের কিনারা ধরে পথ চলে গিয়েছে। রোগা রোগা গরু অলসভাবে মাটি শুঁকে ঘুরে বেড়ায়। এক কোমর পাঁকের ভেতর কতগুলি উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে কুলো দিয়ে কাদা ঘেঁটে গুগলি তোলে। শেষরাত্রের রহস্যালোকিত কাঞ্চীপুরের ছবি স্বপ্নেদেখা রূপলোকের মত দিনের বেলার রোদে কোথায় মিলিয়ে গেছে। পথ চলতে যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল সোমা।

ক্যাক্ ক্যাক্ ক্যাক্, একটা কঠোর কর্কশ আর্তনাদের মত শব্দ। সোমা চমকে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পথের পাশেই শামুকভরা জলাটার দিকে তাকায়। একটা সাদা বক পাখা ঝাপটে জল ছিটিয়ে আর্তনাদ করছে। নিমেষের মধ্যেই জলের ভেতর থেকে যেন এক অদৃশ্য প্রেতের হাত একটান দিয়ে বকটাকে লুঠ করে নিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

সোমা বলে—এটা কি ব্যাপার প্রবীরবাবু?

প্রবীর—বোয়াল মাছে বকটাকে টেনে নিয়ে গেল।

সোমা—সর্বনাশ! এও সম্ভব?

প্রবীর হেসে ফেলে—দৃশ্যটা আপনার খুব খারাপ লাগছে, না?

একটা অলক্ষুণে ঘটনার আঘাত থেকে মনটাকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করে সোমা—যাই বলুন, আপনাদের দেশটা খুব সুবিধের নয়।

প্রবীর সংক্ষেপেই উত্তর দেয়—হ্যাঁ, কলকাতার মত নয়।

সোমা ব'লে ফেলে—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করছেন, কোথায় কলকাতা আর কোথায় কাঞ্চীপুর।

জলাটা আর দেখা যায় না, একটা মেঠো ডাঙ্গা, পথটা কাশের বন ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে গেছে। প্রবীর বলে—আপনি কি বরাবরই কলকাতায় ছিলেন?

সোমা—হ্যাঁ।

প্রবীর—কলকাতার রাস্তায় মোটর গাড়ির চাকার নিচে মানুষ চাপা পড়তে দেখেন নি?

সোমা—হ্যাঁ, কয়েকবার দেখেছি।

প্রবীর—দেখতে খারাপ লাগেনি?

প্রশ্নের আক্রমণে সোমা হঠাৎ মনে মনে অপ্রস্তুত হয়। তারপরেই অকারণে বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, খুব খারাপ লেগেছে। কলকাতা খুব খারাপ, আর কাঞ্চীপুর খুব ভাল।

প্রবীর মাষ্টার কোন উত্তর দেয় না। সোমার কথাবার্তার রূঢ়তায় যদি বিরক্ত হয়েও থাকে, তবু মুখের ভাবে তার কোন চিহ্ন ফুটে ওঠে না। পথটা সংকীর্ণ, প্রবীর দু'পা এগিয়ে আগে আগে চলতে থাকে, পাশাপাশি হাঁটবার মত জায়গা নেই।

*কিছুক্ষণের নিঃশব্দ চলার পর সোমার চিন্তাগুলি যেন কাণ্ডজ্ঞানের নাগাল ফিরে পায়। তারই সামনে এক পুরুষের মূর্তি হেঁটে চলেছে,* বাণীপীঠের হেড মাষ্টার, বয়সে তার চেয়ে কিছু বেশীই হবে। কে জানে, এদেশের হেড মাষ্টারই বা কি বস্তু! কিন্তু এর চেয়ে বেশী পরিচয়

সোমা আর কিছু জানে না। তার সঙ্গে এভাবে ধমক দিয়ে কথা বলার অধিকার কোথায় পেল সোমা? এ তো আর সমবয়সী ভদ্রাও নয়, বয়সে ছোট চুনি আর পান্নাও নয়। এত মুখরতা ও নির্লজ্জতাকে মেনে নিতে পারলে এখানে আসার কি প্রয়োজন ছিল? কলকাতাতেই চাকরি করা যেত, এই দুটি বিশেষ গুণের জোরে।

সোমা বলে—শুনছেন?

প্রবীর মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সত্যিই মুখটা ছেলে মানুষের মত। কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখতে বিশেষ কোন লজ্জা করে না। চরকায় কাটা সুতোর তৈরী কর্কশ কাপড়ের ফতুয়া আর ছোট ধুতি। ভদ্রলোক যে স্বদেশী কাজের মানুষ, তা সহজেই বোঝা যায়, প্রশ্ন ক'রে জানতে হয় না। হয়তো দেশের লোকের কাছে ইনি একজন প্রকাণ্ড কর্মী বলে পরিচিত, তাই সাজসজ্জায় এই অনাড়ম্বর সাত্ত্বিকতা। সোমার কেমন মনে হয়, এই সাত্ত্বিক সাজ তবু ভদ্রলোকের চেহারাটা গুরুগম্ভীর ক'রে তুলতে পারেনি। যেন এক দুষ্টু ছেলের দৌরাত্ম্যমাখা মূর্তি খদ্দরের শাসনে সংযত হয়ে আছে।

সোমা যথাসাধ্য সবিনয় সংযমে এবার কথাগুলি বলবার চেষ্টা করে—আমাকে ভুল বুঝবেন না।

প্রবীর বলে—না, মোটেই ভুল বুঝিনি···এই যে আপনার শিশুভবন।

এক টুকরো খোলা জমি, তারই মধ্যে গোটা তিনেক মাটীর ঘর! একটা একচালা, মেঝেটা বেশ লম্বা চওড়া। পেছনে তালগাছে ঘেরা ছোট একটা পুকুর দেখা যায়। এক পাল ছোট ছোট ছেলে ও মেয়ে পিলপিল করে দৌড়ে আসে। আবার কলরব ওঠে—গুরুমা গুরুমা আমাদের গুরুমা।

এই হলো সোমার শিশুভবন। যাদুঘর নয়, অস্থিমাংস দিয়ে সাজানো এক লক্ষ্মিছাড়া জীবন্ত পৃথিবীর ভগ্নাংশ। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে সোমা। যেমন শিশুগুলির চেহারা, তেমনি তার ভবন। এইখানে চাকরি করতে হবে, সে চাকরির নিয়ম কি, লক্ষ্য কি, কিছুই জানে না সোমা। শুধু দিন গুণে গুণে, প্রতি পল প্রহর নিরর্থক প্রতীক্ষায় পার ক'রে দিয়ে, সমস্ত অন্তরাত্মাকে এখানে নির্বাসিত ক'রে প্রতি মাসে ষাটটি টাকার প্রসাদ লাভ ক'রে ধন্য হতে হবে।

প্রবীর বলে—আসুন, আপনাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যাই।

শিশুভবনের একটা ঘরের ভেতরে সোমা তার উদ্‌ভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত মূর্তিটাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে যায়। কতক্ষণ এভাবে বসেছিল, তা সোমা হয়তো বুঝতে পারেনি। যেন এক ক্ষণিকের দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে সোমা চোখ মেলে দেখতে পায়, দুটি ছেলে হাতপাখা নিয়ে সোমাকে বাতাস করছে। প্রবীর মাষ্টার একটা কাগজে কিসের হিসাব লিখছে।

প্রবীর বলে—এইবার আপনাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আমাকে যেতে হবে।

পকেট থেকে ঘড়ি বের করে প্রবীর সময় দেখে। সোমা যেন আতঙ্কিত ভাবে হঠাৎ বলে ওঠে—কোথায় আবার যাবেন! বসুন।

প্রবীর বলে—শিশুভবনের ফাণ্ডের এই পঞ্চাশটা টাকা আপনার কাছে রইল। আর এই হ'লো হিসেবের খাতা। এটা হলো নিয়মাবলী। এটা রেজিষ্টার। ঐ যে দেখছেন, রান্নাঘর। আর ওপাশে নতুন ঘরটা, ওটা আপনার নিজের জন্য।

সোমা—সবই বুঝলাম, কিন্তু আমাকে কি করতে হবে?

প্রবীর বিস্মিতভাবে বলে—কেন? বিনোদদা আপনাকে কিছু বলেন নি?

সোমা—বিনোদদা কে?

প্রবীর—বিনোদ কাব্যতীর্থ।

সোমা—না, তিনি এ বিষয়ে কিছুই বলেননি।

প্রবীর একটু চুপ করে থেকে বলে—নয়নবাবু নিশ্চয় আপনাকে কাজের কথা কিছু না কিছু বলেছেন।

সোমা—বলেছেন কাজে কোন রকম অসুবিধা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে জানাতে। কিন্তু কাজটা কি?

প্রবীর কিছুক্ষণ অন্যমনা হয়ে থাকে। সোমা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে—আপনিও জানেন না? এতদিন এখানে কাজ করছিল কে?

প্রবীর—আমিই করছিলাম।

সোমা—তাহলে বলতে পারছেন না কেন?

প্রবীর—কথা ছিল, আপনাকে আমি কাজের চার্জ বুঝিয়ে দেব। বুঝিয়ে দিয়েছি। কাজটা কি, সেটা আগেই জেনে শুনে তবে আপনার আসা উচিত ছিল। আপনি ভুল করেছেন।

সোমা—আমার ভুলের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। কাজটা কি, অনুগ্রহ করে বলে দিন।

প্রবীর সোমার দিকে রুক্ষভাবে তাকায়।—কাজটা হলো, এই শিশু-গুলিকে বাঁচিয়ে রাখা আর লেখাপড়া শেখানো।

প্রবীরের কথাগুলি যেন প্রাণদণ্ডের আদেশের মত কঠোর ও নির্মম। সোমার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়, যেন একটা বীভৎস কালো ছায়া ধীরে ধীরে সমস্ত আলোক গ্রাস করে ফেলেছে। দৈনিক চার পাতা টাইপ করা, ঘণ্টা পড়ানো, তিন পাতা যোগ-বিয়োগ ক'রে অ্যাকাউণ্ট লেখা, পৃথিবীর সর্বত্র এই তো চাকরির রূপ। কিন্তু এক পাল শিশুকে বাঁচিয়ে রাখা, এত বড় অদ্ভুত চাকরিটা কি সোমার মত মেয়ের জন্যেই ইতিহাসে সঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল?

সোমা বলে—মাপ করবেন, প্রবীর বাবু। এ-কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে চাকরি করতে এসেছি, অন্যকে বাঁচাবার জন্যে নয়।

শিশুভবনের ঘরের আবহাওয়া সত্যিই যেন কিছুক্ষণের মত শোকার্ত হয়ে ওঠে, উৎসবের আঙিনায় হঠাৎ বজ্রপাতের মত।

প্রবীর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে থাকে। শুধু প্রবীর কেন, শিশুভবনের কয়েকটি ছেলেমেয়ের মুখ দেখেও বোঝা যায়, সোমার কথার অর্থ তারা বুঝতে পেরেছে এবং তাদের ক্ষণিকের আনন্দ-হর্ষ বেদনায় ঢাকা পড়ে গেছে।

সোমা আবার কথা বলে। গলার স্বরে একটা ভীত অসহায় ও অক্ষম মানুষের মিনতি ফুটে ওঠে—চুপ করে থাকলে চলবে না প্রবীর বাবু, আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন।

প্রবীর—কিসের ব্যবস্থা বলুন? চলে যাবেন?

সোমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারে না। চলে যেতে কোন বাধা নেই। এই প্রবীর মাষ্টারই হয়তো আবার লণ্ঠন হাতে পথ দেখিয়ে কাঙ্কী-পুর রোড ষ্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু তার এত বড় দুঃসাহসের অভিযানকে একদিনের মধ্যেই এভাবে পরাজয়ে লাঞ্ছিত ক'রে আবার কি চক্রবেড়ের গলির জীবনে ফিরে যেতে হবে? সেই লোক-হাসানো নাটকের নায়িকা হওয়ার চেয়ে আত্মহত্যা ভাল। তবে সোমা চায় কি?

প্রবীর মাষ্টার আশ্বাসের সুরে বলে—আপনার পক্ষে হঠাৎ এত মুষড়ে পড়ার কোন কারণ নেই। নয়নবাবু তো আপনাকে কথাই দিয়েছেন যে কোন অসুবিধা হলে......।

সোমা হয়তো কল্পনা করতে পারে না, কিন্তু প্রবীর মাষ্টার জানে, নয়নবাবু ইচ্ছে করলে সোমাকে সব অসুবিধার যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। নয়নবাবুর দানের ওপর এই শিশুভবনের প্রাণ নির্ভর করছে, নয়নবাবুরই আর্থিক দাক্ষিণ্যের জন্য বাণীপীঠের একশোটি ছাত্র লেখাপড়া শেখে আর কাব্যতীর্থ ও প্রবীর মাইনে পায়। সেই নয়নবাবু

যদি আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তবে সোমার মত চাকরিগতপ্রাণ মেয়ের পক্ষে সত্যিই চিন্তিত হবার কিছু নেই। ষাট টাকা মাইনে অনায়াসে একশো টাকা হ'তে পারে। শিশুভবনের উন্নতির জন্য স্বাস্থ্যের বরাদ্দ অনায়াসেই দু'গুণ হয়ে যেতে পারে। এই মাটির বাড়িকে একমাসের মধ্যে পাকা দালানে পরিণত করতে কোন অসুবিধা নেই নয়ন বাবুর। যিনি ইচ্ছে করলে সবই পারেন, তিনিই যখন সোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তখন আর···

কিন্তু সোমার মন এই মুহূর্তে যে সান্ত্বনা খুঁজছে, নয়নবাবুর প্রতিশ্রুতির মধ্যে তো সেই সান্ত্বনা নেই। তিনি কাজ দিয়েছেন, কাজের হিসেব নিয়ে মাইনে দেবেন। ভাল কাজ করলে হয়তো মাইনে বাড়িয়ে দেবেন, এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু কাজ করতে না পারলে? কাজের প্রভু হিসাবে নয়নবাবু কি সোমাকে সকল অক্ষমতা মাপ ক'রে শুধু মাইনে দিয়ে যাবেন?

সোমা বলে—অসুবিধে হলে নয়নবাবুকে হয়তো জানাবো, কিন্তু কাজটাই যদি না করতে পারি ·····।

দায়িত্বের স্বরূপ দেখে, খুবই ভয় পেয়েছে সোমা। সব ভয় দুর্বলতা অক্ষমতা ও হতাশা নিয়ে প্রবীরের কাছে নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিতে আজ আর সোমার সম্মানে বাধছে না। তার জীবনের সব সম্মানই যে ডুবতে বসেছে।

প্রবীর উত্তর দেয়—কেন করতে পারবেন না? ধৈর্য ধ'রে যদি কটা দিন থাকতে পারেন, তবে আপনার সব ভয় একে একে ভেঙে যাবে। কাঞ্চীপুরে যতদিন আছেন, ততদিন নিজেকে একা মনে করবেন না।

এইটুকু সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যেই সোমার অসহায় চিন্তাগুলি যেন পিপাসু হয়েছিল। কাজের জীবনে সাহায্য করতে, কাজের ভুল থেকে রক্ষা করতে, যদি একটি বন্ধুত্বের প্রশ্রয় পাশে পাশে থাকে, তবে কাঞ্চীপুরের

মত শ্রীনহীন পল্লীগ্রামেও তার প্রতিদিনের জীবনের শূন্যতা মেয়ে শূন্যতা হয়ে থাকবে না। ভদ্রারা না থাকলে, কলকাতায়ই কখনও এতদিন বেঁচে থাকতে পারতো না সোমা, সোমার তাই বিশ্বাস। আর এ'তো একেবারে অজ পাড়া গাঁ, রূপ নেই, সাড়া নেই, গতি নেই।

সোমার মনটা যেন একটা মূর্চ্ছা থেকে সুস্থ হয়ে জেগে ওঠে। দু'টি ছেলে অনেকক্ষণ থেকে হাতপাখা নিয়ে বাতাস করছিল। সোমা হাসিমুখেই আদরের সুরে ধমক দিয়ে বলে—ও কি? আমাকে বাতাস করতে কে বলেছে?

সোমা ছেলেদের হাত থেকে পাখা দুটো কেড়ে নেয়। ছেলে দু'টিও আকস্মিক প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে সোমার গা ঘেঁসে বসে পড়ে। একটি ছেলে সোমার মুখের দিকেই যেন ছবি দেখার ভঙ্গীতে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে থাকে। আর একজন সাহস ক'রে সোমার শাড়ির আঁচলটা বার বার ছুঁয়ে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। একে একে আরও আসতে থাকে, সোমার চারদিকে আবার একটা কলরবমুখর শিশু-মানুষের ব্যূহ রচিত হয়। সোমার কাছে কে কতটা এগিয়ে আসবে, তার জন্যে একটা তাড়াহুড়ার প্রতিযোগিতা চলতে থাকে।

ছেলেমেয়েগুলির বেশীর ভাগই জীর্ণশীর্ণ চেহারা। পরিধানের মধ্যে শুধু একটা রঙিন খদ্দরের প্যান্ট, গায়ে জামা বলতে কোন বস্ত্র কারুর নেই। একটা ছেলে জ্বরে ধুঁকছে বলে মনে হলো।

প্রবীর বলে—মাত্র ছ'মাস হলো এই শিশুভবন তৈরী হয়েছে। বিনোদ-দা আর আমিই এটা করেছিলাম, কিন্তু চালবার শক্তি ছিল না। নয়নবাবুর অনুগ্রহ, যেটুকু দেখতে পাচ্ছেন, তিনি সাহায্য এবং উৎসাহ না দিলে তার অনেকখানিই সম্ভব হতো না।

সোমা বলে—হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছি।

শিশুভবনের রূপ অথবা নয়নবাবুর অনুগ্রহের রূপ, সোমার মন্তব্যটা

কার ওপর বিদ্রূপ ক'রে উঠলো বোঝা যায় না। প্রবীর মাস্টার নিজের উৎসাহেই সোমাকে যেন কাঞ্চীপুরের ইতিহাস শোনাতে থাকে।—বিনোদদা আর আমি যে বাণীপীঠ করেছি, সেটাও এখন নয়নবাবুর অনুগ্রহে চলছে। তিনি সাহায্য না দিলে……।

সোমার বুঝতে বাকি থাকে না, এটা নয়নবাবুরই অনুগ্রহের রাজ্য। তিনি সাহায্য করেন বলেই কাব্যতীর্থের মত মহৎ মানুষের অন্নের সংস্থান হয়, আর এই ভদ্রলোকের মত শিক্ষিত কর্মী মানুষ জীবিকা লাভ করেন। সোমা বুঝতে পারে, এঁরাও তার মত ষাট টাকা মাইনের দল। দেশসেবার বিনিময়ে নয়নবাবুর কাছ থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকেন। তবু নয়নবাবুকেই প্রশংসা করতে হয়, তিনি তো ইচ্ছে করলেই কাঞ্চীপুরে একটা চালের কল করতে পারতেন, এইভাবে আরও বড় একটা ষাটটাকা মাইনের দল পুষতে পারতেন। তার ফলে বরং উলটো তিনি টাকার দিক দিয়ে লাভবানই হতেন। কিন্তু তিনি বেছে বেছে সেবার কাজেই টাকা বিলিয়ে দিচ্ছেন, নিছক দানের ব্যাপার, আদৌ ব্যবসা নয়।

সোমা জিজ্ঞেসা করে—এরা সবাই কি কাঞ্চীপুরের ছেলে?

প্রবীর—কাঞ্চীপুরের কেউ নেই, সবাই ভিনগাঁয়ের।

প্রবীর মাষ্টার এদিক ওদিক তাকিয়ে একটি ছেলের দিকে লক্ষ্য করে ডাক দেয়—মাধাই!

মাধাই প্রবীরের দিকে তাকায়, ইঙ্গিত বুঝতে পারে। এগিয়ে এসে সোমাকে প্রণাম করে।

প্রবীর বলে—এই ছেলেটির ঠাকুরমা তীর্থ করতে চলে গিয়েছে, কবে ফিরবে ঠিক নেই। যাবার সময় নাতিকে আমার কাছে ছেড়ে দিয়ে গেল। কাজেই……।

প্রবীর আবার ডাকে—পবন, মনু, বিশু, হারু, চারি……।

গোটা পাঁচ ছয় ছেলেমেয়ে উঠে এসে সোমাকে প্রণাম করে। প্রবীর

একে একে পরিচয় করিয়ে দেয়, দরিদ্র ক্ষুধাবিকৃত [illegible] মানুষের ইতিহাস থেকে উধৃত এক একটি কাহিনী।

প্রবীর—এই দলটাকে বিনোদদা নরসিংহতলার হাট থেকে কুড়িয়ে এনেছেন। এদের বাপ-মা আছে, মতিগঞ্জে মজুরগিরি করে। তবু তারা ছেলেমেয়েগুলিকে হাটে হাটে ভিক্ষে করতে ছেড়ে দিয়েছে। মাসে একবার করে বাপ-মার দল গ্রামের হাটে আসেন, আর ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে ভিক্ষে-করা পয়সা নিয়ে চলে যান।

মানুষের ছেলেমেয়ে হয়েও মানুষী মমতার কক্ষ থেকে পথচ্যুত কতগুলি শিশুর আত্মা। সোমা ছেলেমেয়েগুলিকে করুণা ভরা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকে। বাপ-মা'র কোলে যারা স্থান পেল না, তারাই বাপ মা'র পয়সার ঘাঁকতি মেটাবার জন্যে হাটে হাটে জীবন বিলিয়ে দিতে বসেছিল। এদের দুঃখটা যেন বিশেষভাবে নিজের দুঃখ দিয়ে অনুভব ক'রতে পারে সোমা।

প্রবীর মাস্টারের আহ্বানের অপেক্ষায় না থেকে একটি ছেলে ব্যস্তভাবে এসে সোমাকে প্রণাম করে—আমি নেপাল।

সোমা হেসে ফেলে—এটি কে প্রবীরবাবু?

প্রবীর উত্তর দিতে গিয়েও চুপ ক'রে যায়। একটি কাগজে উত্তরটা লিখে সোমার দিকে এগিয়ে দেয়—সদানন্দ নামে এক দাগী চোর ছিল ঠাকুরপুরে, তারই ছেলে নেপাল, সদানন্দ এখন জেলে।

একে একে আরও প্রণাম এসে সোমার পায়ে পড়তে থাকে। একে একে আরও পরিচয় জানা যায়, আরও ইতিহাস শোনা হয়। অতসী, হরি, বিন্দু, নারাণ……এদের সংসারে কেউ নেই, একেবারে অনাথ। একজনের নাম সুমন্ত—পাগলের ছেলে। আর একটি মেয়ের নাম জনা—ওর মা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এক একটা ঘটনা, করুণ মর্মান্তিক ও ভয়ানক। প্রবীর কখনো সংক্ষেপে বর্ণনা করে শোনায়,

কখনো বা [illegible] লিখে জানায়। সব কথা ছেলেমেয়েদের সামনে বলা যায় না, ওরা যেন মানসম্মান বুঝতে শিখেছে।

একটি মাত্র শিশু সোমাকে প্রণাম করতে পারলো না, প্রণাম করার মত বয়সও হয়নি। বছর দুই বয়স, রোগা অথচ ফুটফুটে মুখখানা, ছেলেটাকে কোলে নিয়ে জনা দাঁড়িয়েছিল।

সোমা জিজ্ঞেসা করে—এটি কে? জনার ভাই?

প্রবীর—না। জনা ওর কেউ নয়।

না বললেও কথাটা মিথ্যে বলে মনে হয়। সব গরিব ঘরের বোন যেমন ছোট ভাইকে কোলে কাঁধে টেনে নিয়ে বেড়ায়, বড় জোর আট বছর বয়স হবে এই একরত্তি মেয়ে জনাও যেন একটা বিরাট দিদিয়ানার দায়ে ছেলেটাকে সেইভাবে স্নেহভরা পরিশ্রম দিয়ে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রবীর যেন কি একটা সঙ্কোচে স্পষ্ট ক'রে জবাব দেবার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই সংক্ষেপে বলে—ওর মা নিজেই এসে ওকে দিয়ে গেছে।

সোমা—কেন? কে ওর মা?

প্রবীর বলে—এবার আমি উঠি। বাণীপীঠে যাবার সময় হয়ে গেছে।

সোমা কতকটা নিজের মনের অজ্ঞাতসারেই হাত বাড়িয়ে ছোট ছেলেটাকে জনার কোল থেকে নিজের কোলে তুলে নেয়। জিজ্ঞাসা করে—তোমার নাম কি?

জনা উত্তর দেয়—ওর নাম ভোলা।

প্রবীর ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতে সোমাও সৌজন্য রক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আসে। ভোলার দিকে তাকিয়ে কি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে প্রবীরকে অনুযোগ করে—আপনাদেরও কাণ্ড! এতটুকু ছেলেকে মা-ছাড়া ক'রে কখনো রাখতে আছে?

প্রবীর—আমরা তো চাইনি, ওর মা নিজেই জোর ক'রে দিয়ে গেছে।

সোমা—কে ওর মা ?

আবার সেই প্রশ্ন। সোমার মত ভদ্রয়ানায় লালিত মেয়ের রুচি ও সংস্কারের ওপর দুঃসহ আঘাত দেবার ইচ্ছা ছিল না প্রবীরের। এরই মধ্যে শিশুভবনের কক্ষে কোন্ এক ক্লেদাক্ত জগৎ থেকে কুড়িয়ে আনা দলিত মানবতার যে পরিচয় সোমাকে শুনতে হয়েছে, ওই যথেষ্ট। সোমার মত মেয়েকে ভয় পাইয়ে দিতে ও ধৈর্য ভেঙে দিতে যথেষ্ট। তার ওপর ভোলার পরিচয় আর না শোনানই ভাল। সন্দেহ নেই, প্রবীরের ভাবনাগুলির সব সংযত সতর্কতা ফাঁকি দিয়ে সোমার ওপর একটা সমবেদনা অলক্ষ্যে তার মনের আনাচে কানাচে একটু একটু ক'রে ছড়িয়ে পড়ছিল। সত্যিই তো, মাসিক ষাট টাকার বৃত্তির লোভ দেখিয়ে এ মেয়ের ওপর একটা অসম্ভবের সাধনা চাপিয়ে দেওয়া নিষ্ঠুরতা বৈ কি!

সোমা আবার বলে—আমার মত হলো, এতটুকু বাচ্চা ছেলেকে শিশু-ভবনে নেবেন না। একে ওর মার কাছে ফিরিয়ে দিন।

প্রবীর—ওর মা ওকে কাছে রাখতে চায় না বলেই দিয়ে গেছে।

সোমা—কেন ?

প্রবীর—এখানে থাকলে মানুষ হবে, ওর মা'র তাই ধারণা।

সোমা—ওর মা কি খুবই গরিব ?

প্রবীর—না।

সোমা—তবে ? এ কোন্ ধরণের প্রবৃত্তি ? আপনি চেনেন এর মাকে ?

প্রবীর—চিনি, ওর মা'র নাম সিন্ধু, শ্যামনগরের বাজারে থাকে।

সোমা—কি করে ?

প্রবীর বিব্রতভাবে বলে—বাজারেই থাকে।

সোমার সমস্ত দেহ শিউরে ওঠে, হাত দুটো যেন হঠাৎ আঘাতে শিথিল হয়ে আসে, কোল থেকে ভোলা প্রায় পড়ে যেতে থাকে। সোমার

চোখের দৃষ্টি... শিখার মত—বাজারের মেয়ের ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে ...টাকা মাইনে দিয়ে আমাকে এনেছেন, কি বলুন?

বলবার মত কোন উত্তর প্রবীরের মুখে আসে না।

সোমা বলে—আপনারা কেন আমাকে এভাবে অপমান করলেন?

প্রবীর হঠাৎ কঠোর স্বরে একটা প্রশ্ন করে—ভোলাকে কোলে নিয়েছেন বলেই কি আপনার অপমান হয়েছে?

সোমা—নিশ্চয়, আমি হাসপাতালের জমাদারণী নই। সস্তায় শিক্ষিতা চাকরানি খুঁজছেন, অথচ নাম দিয়েছেন শিশুভবনের অধ্যক্ষা। মানুষকে ঠকাবার ষড়যন্ত্র।

প্রবীর—আমাকে এসব কথা বলার কোন অধিকার আপনার নেই।

সোমা—মিথ্যে কথা ব'লে আমাকে এখানে এনেছেন কেন?

প্রবীর—আমি আপনাকে আনিনি।

সোমার ক্ষুব্ধ দৃষ্টির সব অভিযোগ ও নিন্দা তুচ্ছ ক'রে প্রবীর আরও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়—নয়নবাবু আপনাকে এনেছেন।

প্রবীরের যুক্তির আঘাতে সোমার সব বাচালতা স্তব্ধ হয়ে যায়। এ মন্তব্যের মধ্যে কোন মিথ্যে নেই। নয়নবাবুই সোমাকে চাকরি দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন, এবং সোমা চাকরি নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে, তবে সেটা হয় নয়নবাবুর, নয় সোমার। এর জন্যে প্রবীর মাস্টারকে এক তিলও দায়ী করবার কোন অজুহাত নেই।

যুক্তির কথা নয়। সোমা ভাল ক'রে জানে, সে নিজেই এক দুরন্ত অভিমানের ভুলে ভদ্রজীবনের নীড় ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ চলে এসেছে। এর জন্যে আর কেউ দায়ী নয়। কিন্তু এই তো সেই গ্রাম্য একলব্যের মূর্তি, কাঞ্চীপুর রোড ষ্টেশনে সব অন্ধকারের ধাঁধাঁ ভেদ ক'রে প্রথম আলোকের সঙ্কেতরূপে যে দেখা দিয়েছিল। লণ্ঠন হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, এই তো সেই। কিছুক্ষণ আগেই যার মুখের ভাষায় সান্ত্বনার

আভাষ পেয়ে সোমার মন থেকে একাকিত্বের শঙ্কা মুছে [illegible]ল, এ[illegible] সেই ভদ্রলোক। তবু কোন যুক্তির জোরে প্রবীর মাস্টারকে দায়ী করা যায় না। ভুল ক'রে এই ভয়ংকর অভিশাপের মত চাকরিটার মধ্যে তিলে তিলে মরতে হবে, এর জন্যে প্রবীর মাস্টার দায়ী নয়। প্রতিদিন নিঃশব্দে তার সারা জীবনের রুচি ও সংস্কার দিয়ে [illegible]ড়া সত্তাকে এক [illegible]ল জীবজগতের সেবায় নিঃশেষ করে দিতে হবে, তার জন্যে প্রবীর মাস্টারের মন বিচলিত হবার কোন কথা নেই। পুরো দুদিনেরও পরিচয় নয়, প্রবীর মাস্টার সোমার জাতকুলমানের মর্যাদা রক্ষার জন্যে দায়ী হবে, এর মধ্যে কোন যুক্তি নেই।

প্রবীর চলে যাবার জন্যে উদ্যত হয়। একটু ইতস্তুতঃ করে। তারপর [illegible]—আচ্ছা আমি এবার যাই।

সোমা সহজভাবেই বলে—একটা প্রশ্ন আছে।

প্রবীর—তাড়াতাড়ি বলুন। আমার অন্য কাজ রয়েছে।

সোমা—শুচিদির বাড়িতে দেখলাম, আপনি বাইরের বারান্দায় বসে [illegible]চ্ছিলেন। কেন?

প্রবীর এ সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি?

সোমা—না।

প্রবীর—আমার নাম প্রবীর পাটনী, আপনার ঠাকুর ঘরে বা থাকার ঘরে ঢুকলে, কিম্বা খাবার জল ছুঁয়ে দিলে আপনার জাত চলে যাবে। বুঝেছেন?

সোমা—বুঝেছি।

নিজেকে খুব শক্ত করে নিয়েই এতক্ষণ প্রশ্ন করছিল সোমা এবং খুব শক্তভাবেই উত্তরগুলি গ্রহণ করে। বিচলিত হবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

প্রবীর চলে যায়। এতক্ষণে সব রহস্যও স্পষ্ট হয়ে যায়। লোকটা

...কই ... সোমার জাতকুলমানের সম্ভ্রমকে দরদ দিয়ে বুঝতে পারেনে, ...টার হৃদয়টাও সে জাতেরই নয়।

শিশুভব...র বাইরের আঙিনায় একটা মাটির বেদীর গায়ে হেলান দিয়ে ঘাসের ওপর বসেছিল সোমা। পাশে একটা তুলসীর ঝারি থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে। ...না এসে অনেকক্ষণ হলো ভোলাকে আবার কোলে নিয়ে চলে গেছে। ছেলেরাও দূর থেকে গুরুমার নিশ্চল গম্ভীর মূর্তি দেখে দূরেই সরে গেছে।

অন্য সময় হলে, এর চেয়ে কম বিপদে পড়লে, এবং এর চেয়ে ঢের অল্প আঘাত পেলেও সোমার মন সহ্য করতে পারতো না। চোখ দুটো ঐ তুলসী ঝারির মতই হয়ে উঠতো। কিন্তু কেঁদে হাল্‌কা হবার অভ্যাস বোধ হয় জীবনে শুরু হয়ে গেল, এবং এখানে সেটা আর তার পক্ষে শোভাও পায় না। তার চিন্তার আকাশপটে যে দিগ্‌দাহ সুরু হয়েছে, তার জ্বালা শুধু একা একা শুক্‌নো চোখে চুপ করে সহ্য করাই উচিত। সোমাও নি...বে সহ্য করে।

জীবনে নিয়তির হাতে নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছে সোমা। কাঞ্চীপুরে এসেও তার কল্পনা নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু সোমার মনে হয়, কাঞ্চীপুরের সব বঞ্চনার ষড়যন্ত্রকে যেন শেষ কথায় চরম করে দিয়ে চলে গেছে প্রবীর মাষ্টার। কিন্তু এই বঞ্চনাটা যে কি, সেটা স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারে না সোমা, বোধ হয় বুঝতে চেষ্টাও করে না।

পুকুরের তালের প্রাচীরের আড়ালে অপরাহ্ণের সূর্য ঢাকা পড়েছে অনেকক্ষণ। একটী প্রৌঢ় বয়সের স্ত্রীলোক ব্যস্তভাবে সোমার কাছে এসে দাঁড়ায়, একেবারে মুখের কাছে মুখ নিয়ে দেখতে থাকে।—দেখি, গুরুমা কেমন হলো!

সোমা বিরক্ত হয় না। শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করে—আপনি কে?

—আমাকে আবার আপনি ক'রে বলো কেন [illegible] তারার
এখানেই তো কাজ করি।

—কি কাজ?

—আমি চাকরানি মানুষ, রান্না করি।

—কত মাইনে পাও?

—মাইনে কই দেয়? আমিও চাই না। বিনোদ পণ্ডিত বলে, দেশের কাজ ক'রবে তারার মা, তার জন্য আবার মাইনে কি?

তারার মা'র দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকে সোমা। এ যেন বহুরূপী কাঞ্চীপুরের আত্মার আর এক মূর্তি। দেশের কাজ করছে; এই বিশ্বাসেই ওর প্রাণ ভরে আছে, মাইনে নেয় না। নিজের মনটা [illegible]নার জ্বালায় ক্ষুব্ধ হয়ে থাকলেও তারার মা'র চিত্তের ঐশ্বর্যকে বুঝবার মত শ্রদ্ধার দৃষ্টি আপনা হতেই সোমার দু'চোখ ছাপিয়ে জেগে ওঠে। এই প্রৌঢ়া গ্রাম্য দরিদ্রার পাশে নিজেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র বলে স্বীকার করে নিতে সোমা আজ কুণ্ঠিত হয় না।

সোমা জিজ্ঞেস করে—দেশের কাজ ক'রে আর সবাই তো মাইনে নেয়, তোমার নিতে বাধা কি?

তারার মা—আর কে মাইনে নেয়?

সোমা—বিনোদ পণ্ডিত, প্রবীর মাস্টার।

তারার মা—নেয় তো বটে, কিন্তু থাকে কই? নিজেরা তো এক বেলা পেট পুরে খেতে পায়, কি তাও পায় না ভগবান জানেন।

সোমা—এ দশা কেন?

তারার মা—চরকা ফরকা হেন তেন কি না কাজ ওদের আছে বল? ওতেই সব ফুরিয়ে যায়। ঐ এক পাগল ধরণের মানুষ, ওদের কথা ছেড়ে দাও গুরুমা। আমাদের প্রবীর মাস্টার...।

তারার মা গলার স্বর খুব শান্ত ভাবে নামিয়ে আনে, সোমার কানের

ভদ্রলোক [illegible] যেন চুপে চুপে বলে—আমাদের প্রবীর মাস্টার, জাতে [illegible], সেটা জান তো? ওর বাপ মা ভাই সব আছে, কি দুঃখে দিন যাচ্ছে [illegible]হা! সেদিন ধুপখালের হাটে প্রবীর মাস্টারের মায়ের সঙ্গে দেখা হলো, বুড়ি কেঁদে ভাসিয়ে দিলে, ছেলে থাকতেও তার ছেলে নেই, ছেলে ভদ্দর লোক হয়ে গেছে, বাপমার দুঃখ একবার উঁকি দিয়েও দেখতে যায় না।

সোমার নিঃশব্দ আগ্রহে উৎসাহিত হয়ে তারার মা যেন কাঞ্চীপুরের গোপন রহস্যের বার্তা একে একে শুনিয়ে যেতে থাকে—আর এই যে আমাদের বিনোদ পণ্ডিত, বিয়ে করেছে বড়মানুষের মেয়েকে। শুচির বাপের বাড়ির অবস্থা খুব ভালো। কিন্তু হলে হবে কি? বিনোদ পণ্ডিত মেয়েটাকে না খাইয়ে শুকিয়ে মারছে, একটি দিনের জন্যও বাপের বাড়ি যেতে দেয় না।

সোমার বহুক্ষণের বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে হাসির পুলক ফুটে ওঠে। তারার মা নিজেকে নিন্দে ক'রে, প্রবীর মাস্টারকে আর কাব্যতীর্থকে নিন্দে ক'রে যে-কাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছে, তার তাৎপর্য বুঝতে আর ভুল হতে পারে না সোমার। তারার মা যে-কাহিনীকে অপরাধী কাঞ্চীপুরের কুৎসারূপে চুপে চুপে শুনিয়ে যাচ্ছে, সোমার মনে সেই কাহিনীই অশ্রুতপূর্ব পুণ্য কথার রূপে এক মুগ্ধ আবেশ সৃষ্টি করে। এত মহৎ হয়েও যারা এত ছোট হয়ে আছে, পরের দুঃখের মূর্তির দিকে যারা প্রতি মুহূর্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, নিজের দুঃখ দেখতে পায় না, তাদের কাছে [illegible] পরাভব মেনে নিয়ে, সব অক্ষমতা স্বীকার ক'রে এই কাঞ্চীপুরের কাছ থেকে চুপে চুপে পালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু মিথ্যা অহংকারের ভুলে তাদের আর ছোট ক'রে দেখতে চায় না সোমা।

তারার মা'র প্রশ্নেই আবার সোমার এই ক্ষণিকের ধ্যানস্থ সম্বিৎ চমকে ওঠে। তারার মা বলে—তুমি কি নিজের জন্যে ভিন্ন ক'রে রাঁধবে [illegible]?

সোমা—না।

তারার মা খুশী হয়ে বলে—তাই ভাল, এক হেঁসেলেই সব হয়ে যাবে, ভিন্ন ঝঞ্ঝাট ক'রে লাভ কি? তা ছাড়া, আমার ছোঁয়া খেতে ভয় করবার কিছু নেই গুরুমা, ছোট জাত নই, আমাদের জলচল আছে।

সোমা—তার জন্যে নয়, শুধু আজ রাত্রিটাই তো, না খেলেও চলবে। আমার জন্যে রান্না করতে হবে না।

তারার মা সোমার কথার ইঙ্গিত স্পষ্ট বুঝতে পারে না। আপত্তি ক'রে বলে—একেবারে না খেয়েই থাকবে, ও কি কথা?

সোমা—না, আমি ভাতটাত খাব না। শুধু একটু জল গরম করে দিও।

তারার মা—কেন?

সোমা—চা'য়ের জন্যে।

তারার মা—সঙ্গে চা এনেছ তো? এখানে ওসব বালাই নেই।

সোমা—হ্যাঁ।

তারার মা—বেশ, এবার তুমি নিজের ঘরে গিয়ে বাতি দাও, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

আঙিনার পূবদিকে কতগুলো ঝুমকো জবার গাছ, তারই পাশে সোমার থাকার ঘরটা নতুন তৈরী করা হয়েছে বলে মনে হয়।

সোমা ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, আজ রাত্রিটুকু ভোর করে দিতে পারলেই যে-ঘরকে পেছনে রেখে চিরকালের মত বিদায় নিয়ে চলে যাবে সোমা, আর এক মুহূর্তের জন্যও ফিরে তাকাবে না। সোমার মনে আর অভিমান নেই, রাগ নেই, অভিযোগ নেই। মনটা সব অহংকারের বোঝা শূন্য ক'রে দিয়ে একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে।

ঝুমকো জবার গাছটা পুরনো, কিন্তু ঘরটা একেবারে নতুন। ভিতটা

শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে গেছে, কিন্তু দেয়ালে গাঁথা জানালা ও দরজার চারদিকটা এখনো ভেজা ভেজা, কাঁচা মাটীর গন্ধ। সোমা তার নিজের ঘরের ভেতরে ঢুকে একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। কারণ, ঘরটা একেবারে আসবাবহীন নয়। কাঁচা কাঁঠাল কাঠের তৈরী একটা সাধারণ রকমের খাট, দেখেই বোঝা যায় সাত তাড়াতাড়ি করা হয়েছে। দেয়ালে দু' জায়গায় তিন সারি ক'রে তাক আছে। জলচৌকির মত দেখতে একটা বস্তু, টেবিলের কাজ চলতে পারে। সোমা দেখতে পায়, তার বইয়ের প্যাকেটটা এই চৌকির ওপর রাখা রয়েছে। বাক্স বিছানা স্টোভ, চায়ের বাসন, ছবি আঁকার সরঞ্জাম—কাজের জিনিষ বলতে যা কিছু সোমা সঙ্গে এনেছিল সবই যেন অদৃশ্য এক যত্নের ছোঁয়ায় ঠিক জায়গা মত সাজানো রয়েছে।

অনেক কিছু কাজের জিনিস, যা সঙ্গে আনতে পারেনি সোমা, তাও এখানে কে যেন সাজিয়ে রেখে গেছে। একটা জলের কুঁজো, একটা হাতপাখা, মশারি টানাবার দড়ি, একটা ল্যাম্প। কে এই দরদী শিল্পী, পরের ঘর সাজিয়ে দেবার জন্য যার এত গরজ? যিনিই হউন, তিনি বোধ হয় আবেগের বশে একটু বেশী রকম অনধিকার চর্চা ক'রে গেছেন।

যাই হোক, মাত্র আজ রাত্রিটুকু। কাঞ্চীপুরের আতিথ্যকে মাত্র আর কয়েকটি ঘণ্টা সহ্য ক'রে বেঁচে থাকতে হবে, তার পরেই মুক্তি। তাই আর নতুন করে বিচলিত ও চিন্তিত হবার কোন প্রয়োজন নেই। ঝুমকো জবা গাছের পাশে এই নতুন মাটির ঘরে, এ'কে জীবনের নীড় ব'লে ভুলেও ভুল করবে না সোমা। বরং ঘরটাকে একটা যত্নসজ্জিত ফাঁদ বলেই মনে হয়, ব্যাধ আড়ালে সরে আছে। ভুল ক'রে এখানে একবার ঘুমিয়ে পড়লে জাতকুলমান দিয়ে তৈরী সোমার জীবনের সব সম্ভ্রম চিরকালের মত লুপ্ত হয়ে যাবে।

সোমা আলো জ্বালে। গরম জলের হাঁড়ি নিয়ে তারার মা উপস্থিত

হয়। পেছু পেছু শিশুভবনের ছেলেমেয়েরা হল্লা করে ছুটে আসে। তারার মা ধমক দেয়—যা যা রাক্ষসগুলো, এদিকে এসেছিস তো ভাল হবে না।

সোমা জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে ?

তারার মা—তোমার চা খাওয়া দেখতে এয়েছে।

সোমা—দেখতে আর হবে না, আরো চা তৈরী ক'রে ওদের খাইয়ে দাও।

শিশুভবনের আঙিনায় একটা পিদিমের আলোয় চা তৈরী করে তারার মা। ছেলেমেয়েগুলি অপলক চোখে চেয়ে থাকে, তাড়াহুড়ো ঠেলাঠেলি বা খাই-খাই চীৎকার নেই। তারার মা যার হাতে যেমন চায়ের খুরি তুলে দেয়, সে'ও তেমনি চুপচাপ খেয়ে সরে পড়ে। সোমা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে।

দেখতে পায় সোমা, তার নিজের বোন চুনিপান্নার মতই কতগুলি কচি মানুষের তৃষ্ণার্ত প্রাণ যেন আঙিনায় বসে কৃতার্থভাবে মানবীয় স্নেহের প্রসাদ খাচ্ছে। এখানে দাঁড়িয়ে ওদের মুখের দিকে তাকালে ঠিক ভিখিরী ছেলের পাল বলে মনে হয় না। ওদের আগ্রহটা ঠিক চা খাওয়ার ক্ষুধা তৃষ্ণা বা লোভের মত নয়। গুরুমার মমতা আদায় ক'রে, ভাই-বোনের জটলার মত গা ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে বসে, তারার মা'র যত্ননিপুণ হাত থেকে যেন জীবনের একটা প্রাপ্য গ্রহণ করছে সবাই। মিষ্টি চা না হয়ে যে-কোন বস্তু হতো, ঠিক এমনই আগ্রহ ও আনন্দে বোধ হয় ওরা ছুটে আসতো।

জনার কোলে সেই ভোলা, সব চেয়ে ছোট। তারার মা ভোলার জন্যে এক বাটি চা এগিয়ে দিতে যায়। সোমা নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা আর্তনাদ করে ওঠে—আহা! ওকে দিও না, এইটুকু বাচ্চাকে চা খাওয়াতে আছে ?

ভোলার ভঙ্গি হঠাৎ এই প্রগল্‌ভ মমতার আতিশয্য সোমার নিজের কাছেই বড় বিসদৃশ মনে হয়। সিন্ধু নামে কোন্ এক জীবের ছেলেকে না চিনে কোলে নিয়ে কী অশুচি বোধ করেছিল সোমা, এই তো কয়েক ঘণ্টা আগে।

ভোলাও ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। জনা সান্ত্বনা দেয়, ভোলা কান্নার স্বর আরও চড়িয়ে দেয়।

সোমা অপ্রস্তুত হয়ে, বোধ হয় নিজের মনের দুর্বলতাকে সংযত ক'রে রাখার জন্যেই এবার কথাগুলি শক্ত ক'রে বলে—ওকে এক মুঠো চিনি দিয়ে দাও তারার মা, এক রত্তি ছেলে, কী লোভী!

ছেলেমেয়েদের চায়ের আসর ভাঙলে, সোমা এক বাটি চা নিয়ে খাটের ওপর বসে। তারার মা'ও সোমার ঘরের ভেতর দরজার কাছে মেঝেতে ক্লান্তভাবে বসে, আর এক বাটি চা নিয়ে তৃপ্তিভরা চুমুক দিয়ে খায়।

প্রথম চুমুকের তৃপ্তিতেই তারার মা যেন গলে গিয়ে মন্তব্য করে—আঃ, কাঞ্চীপুরের ভাগ্যি ভাল, লক্ষ্মী সরস্বতী দুই হলো।

সোমা—কি বলছো তারার মা?

তারার মা—বিনোদ পণ্ডিতের বউ শুচি হলো কাঞ্চীপুরের লক্ষ্মী, আর তুমি হলে সরস্বতী।

সোমা হাসতে থাকে—কোথায় শুনলে ওকথা? কেউ বলেছে?

তারার মা বাটিতে চুমুক দিতে গিয়েই থেমে যায়, সোমার দিকে যেন অনুযোগ ভরা দৃষ্টি তুলে তাকায়।—শুনবো আবার কোথায়? দুটো ভাল কথা বলতে পারি না, তুমি কি আমাকে এমনি মুখ্যু মানুষ মনে করলে?

সোমা লজ্জিত হয়।—ছিঃ, আমি তোমাকে মোটেই তা মনে করি না তারার মা। যাক্, শুচিদি কাঞ্চীপুরের লক্ষ্মী নিশ্চয় কিন্তু আমি মোটেই সরস্বতী নই তারার মা, লেখাপড়া খুব কমই শিখেছি।

সোমা একটু চুপ ক'রে থেকে ব'লে—তা না হ'লে যাট টাকা মাইনের চাকরি নিয়ে এখানে আসতে হয়?

তারার মা মন্তব্য করে—তোমার কপাল ভাল।

সোমা চুপ করে যায়, তারার মাকে আর যুক্তি দিয়ে তার মন্দ কপালের ইতিহাস বোঝাবার চেষ্টা না করাই ভাল।

তারার মা ব্যস্ত ভাবে উঠে দাঁড়ায়—এবারে হেঁসেলে গিয়ে ঢুকি। তোমার জিনিসপত্তর সব বুঝে গুণে দেখে নাও গুরুমা। যদি আবারও কিছু গুছিয়ে সাজিয়ে দিতে হয় তো এখুনই বল।

সোমা—আমার ঘরের জিনিসপত্তর কি তুমিই গুছিয়ে দিয়ে গেছ?

তারার মা—হ্যাঁ গো, প্রবীর মাস্টার যেমনটি বলেছে আমি তেমনটি সাজিয়ে রেখেছি।

সোমা—প্রবীর মাস্টার এসেছিলেন এখানে?

তারার মা—হ্যাঁ, কিন্তু ঘরে ঢোকেনি, তুমি নিশ্চিন্তি থেকো।

সোমা—ঘরে ঢোকেননি কেন?

তারার মা—ওমা! সে ঢুকবে কেন এখানে? সব ছোঁয়া যাবে না? তোমার ঘরে জল রয়েছে, বাসনপত্র রয়েছে, কাপড় চোপড় রয়েছে......।

তারার মা চলে যায়। সোমার ভাবনাগুলি যেন আত্মধিকারের জ্বালায় বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যেতে চায়। কিন্তু এই প্রবীর মাস্টার নামে লোকটিও তো অদ্ভুত বেহায়া, যেচে নিজের গায়ে এই অপমানের কালিমা মাথার কি দরকার? জন্ম-অপরাধীর মত অস্পৃশ্য মূর্তি নিয়ে শুদ্ধশোণিত সজ্জাতদের অনুগ্রহের সিংহদ্বারে উঁকি দিতে আসে কোন্ উপহারের লোভে? ওর রক্ত বিদ্রোহ করে না কেন?

শুধু প্রবীর মাস্টার নয়, এত শ্রদ্ধেয় কাব্যতীর্থ ও শুচিদিকেও ক্ষমা করতে পারে না সোমা। এ কী রকম ব্যবহার? হয় তাকে বাড়িতে

আসতেই দিও না! কিন্তু নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে নিয়ে বাইরের বারান্দায় পাত পেড়ে দিতে শুচিদির মনুষ্যত্বে কি একটুও বাধ্‌লো না?

সোমা বুঝতে পারে, একদিনের পরিচিত কাঞ্চীপুরের বন্ধন থেকে পালিয়ে যাবার আগে, একটা সমবেদনার উপহার সবার অলক্ষ্যে রেখে সে চলে যাচ্ছে, পৃথিবীর হাতে তার চেয়ে ঢের বেশী নিগৃহীত একটি মানুষের উদ্দেশ্যে।

আরও ভাবতে গিয়ে সোমার মনটা যেন ভয় পেয়েই আরও বেশী সতর্ক হয়ে ওঠে। এই সমবেদনার ইতিহাসকে সূচনাতেই শুদ্ধ করে দেওয়া উচিত, যেন কোন ভুলের প্রশ্রয় পেয়ে পরীক্ষার মূর্তি হয়ে তার জীবনের পথে দেখা না দেয়। একটা গোপন স্মৃতি হ'য়েও এই সমবেদনা যেন তার মনের ভেতর ঠাঁই নিতে না পারে। এখানকার ভুলের হিসাব এখানেই শেষ ক'রে দিয়ে ভদ্রলোকের মেয়ের সম্ভ্রমটুকু বাঁচিয়ে নিয়ে চলে যেতে হবে।

আলোটাকে একটু উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে সোমা খাটের ওপর বসে। বিছানাটা আর না খোলাই ভাল, জেগে জেগে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া যাবে। চোখে পড়ে, একটি খোলা চিঠি তাকের ওপর চাপা রয়েছে, যেন সোমারই উদ্দেশ্যে।

সোমার কাছে লেখা চিঠি নয়, গ্রামসেবা কমিটির প্রেসিডেন্ট নয়ন চৌধুরীর কাছ থেকে সেক্রেটারী প্রবীর পাটনীর কাছে লেখা চিঠি।

চিঠির কতগুলি লেখার নীচে লালকালির দাগ। শিশুভবনের অধ্যক্ষার ওপর কি কি কাজের ভার দেওয়া হলো, তারই একটি তালিকা দিয়েছেন নয়নবাবু।

(ক) ছেলেমেয়েদের জাতীয় সঙ্গীত শেখানো।

(খ) অঙ্কের মধ্যে যোগবিয়োগ গুণ ভাগ আর নামতা।

(গ) একটু বেশী করে ডিসিপ্লিন।

(ঘ) . একটু কম ক'রে ইতিহাস।

(ঙ) মাঝারি রকমের ভূগোল জ্ঞান।

চিঠির শেষাংশে প্রবীর মাস্টারের প্রতি অনেকগুলি নির্দেশ :

> আপনি নিজে স্টেশনে এসে ওঁকে নিয়ে যাবেন, ওঁর সব রকম স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখবেন, ওঁর থাকার জন্যে একটা নতুন ঘর তুলে কতগুলি দরকারী আসবাবপত্রও তৈরী করে দেবেন। কলকাতার মানুষ উনি, একটা বড় রকমের আদর্শ নিয়ে এসেছেন, সুতরাং ওঁকে কোনমতে নিরুৎসাহ না করা আপনারই দায়িত্ব।......আপনার ও কাব্যতীর্থের গত মাসের বৃত্তি পাঠালাম।

সোমার কাছে একটা প্রহেলিকা এতক্ষণে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। কাঞ্চীপুর রোড স্টেশন থেকে শিশুভবন পর্যন্ত যে গ্রাম্য একলব্য সোমাকে আলো হাতে পথ দেখানো থেকে সুরু ক'রে এখানে এসে এই ঘরটিকে পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের উপচারে সাজিয়ে রেখে গেছে, সে শুধু নয়নবাবুর নির্দেশ, পালন করেছে, তার চেয়ে এক তিলও বেশী কিছু নয়। সে শুধু বৃত্তিদাতা প্রেসিডেন্টের হুকুমে নিয়মমত চাকরি ক'রে গেছে। সোমার মনের গভীরে নিহিত সেই ভাবতে-ভালো-লাগা সংশয়টা নিতান্ত মিথ্যা, নিতান্ত অলীক, এসবের মধ্যে প্রবীর মাস্টারের আগ্রহের কোন স্পর্শ নেই।

কী বিভ্রম, কী লজ্জা, কী দুর্বলতা। এতক্ষণ যেন একটা নিশির ডাকের ছলনার সঙ্গে অকারণে এত মান-অভিমান দিয়ে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছে সোমা। ঝুমকো জবা গাছের পাশে এই যত্নসজ্জিত নতুন মাটীর ঘর, এটা ফাঁদ নয়, কোন ব্যাধও আড়ালে দাঁড়িয়ে নেই, এটা নিছক একটা ফাঁকি।

নয়নবাবুর চিঠিটা আর একবার পড়ে সোমা। প্রতি ছত্রে আশ্বাস আছে, প্রতি কথায় স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি আছে। শিশুভবনের অধ্যক্ষার

জন্যে যে কর্তব্যের তালিকাটি দেখা যাচ্ছে, সেটাও মোটেই অগ্নিপরীক্ষার ব্যাপার নয়, ভয় করবার কিছুই নেই।

তারার মাকে ডাক দিয়ে বলে সোমা—ছেলেদের খাইয়ে তুমি আমার কাছ থেকে একটা চিঠি প্রবীর মাস্টারকে এখুনি দিয়ে আসবে তারার মা···আর শোন, আমি খাব, আমার চাল নিও।

নয়নবাবুর চিঠি আর একবার সাবধানে পড়ে সোমা। হ্যাঁ, গ্রামসেবা কমিটির সেক্রেটারীকে ইচ্ছামত কাজের হুকুম দেবার অধিকার শিশুভবনের অধ্যক্ষার আছে। নয়নবাবু এই চিঠিতে স্পষ্ট করেই সোমাকে সেই অধিকার দিয়েছেন।

চিঠি লিখতে আরম্ভ করে সোমা।

আজ সকাল থেকে কাঞ্চীপুরের লোক দলে দলে ছুটেছে, এখান থেকে প্রায় ক্রোশ তিনেক দূরে মরা কালিন্দীর ওপারে একটা জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলটার নাম পায়রা পরীর বন।

পায়রা পরীর বন, পায়রা আছে হাজার হাজার, যারা হলো এই বনভূমির সম্রাজ্ঞী এক পরীর প্রজা। কিন্তু প্রজাদের যেমন দুচোখে স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়, সম্রাজ্ঞীকে সেভাবে কেউ অবশ্য আজ পর্যন্ত দেখতে পায়নি। ক্বচিৎ কোন শীতজ্যোৎস্নার রাত্রে মরাকালিন্দীর পাশে জেলা বোর্ডের সড়কে দাঁড়িয়ে হাটফেরত বেসাতীর দল দেখতে পায়, বনের মাথার ওপর পরী উড়ে বেড়াচ্ছে, মস্ত বড় বড় দুটো পাখা, কুয়াশার চেয়েও কোমল, আর সারা গায়ে ফুলের গয়না।

কল্পলোকের আইন অনুসারে এই বনের মালিকানা স্বত্ব পায়রা পরীর হলেও, মতিগঞ্জের কাছারীর নথি অনুসারে এটা হলো ভৈরববাবুর জমিদারী। বড় বড় শাল অর্জুন আর ডুমুর গাছ, শ্বেত পুনর্ণবা আর কন্টিকারীর ঝোপ, আরও শত রকমের ফুল লতা কাঁটা গুল্ম ও ওষধির

উপনিবেশের মত পায়রাপরীর বন। শত রকমের পোকা ও পতঙ্গ, শত বর্ণের পাখি, সাপ গোসাপ সজারু আর খাটাসের লীলাভূমি। ডুমুরের ডালে ডালে লক্ষ মধুকরের কীর্তি মৌচাকগুলিও প্রকাণ্ড রসাল ফলের মত শোভা পায়। পায়রাপরীর বন থেকে ভৈরববাবুর আয় মন্দ হয় না। যার ইচ্ছে ভৈরববাবুর কাছে পাঁচ টাকা জমা দিয়ে একটা পাশ কিনে আনতে পারে, যার ফলে এক সপ্তাহ ধরে পায়রাপরীর বনে চাক ভেঙ্গে মধু যোগাড় করা যায়। জ্বালানির জন্যে শুকনো ঝোপঝাপ বা মরা গাছের ডাল পেতে হলে জমা দিতে হয় এক মাসের জন্যে দশ টাকা।

কিন্তু সম্প্রতি ভৈরববাবু একটা বড় রকমের লাভের বন্দোবস্ত করেছেন। সমস্ত পায়রাপরীর বনটাকে লীজ দিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধমার্কা ঠিকেদারের কাছে। দি মিনার্ভা বিলডার্স, একটা ঠিকেদার কোম্পানী যুদ্ধের প্রয়োজনে কাঠ সাপ্লাই করার ভার নিয়ে পায়রাপরীর বনের পাশে মাঠের ওপর ক্যাম্প ফেলেছে। এক শতের ওপর করাতী কুলি মিস্ত্রি ও দারোয়ান এসেছে—কয়েকটা বড় বড় কলের করাতও আছে।

মিনার্ভা বিলডার্সের করাত চলছে অবিশ্রান্ত, বড় বড় শাল আর অর্জ্জুনের মৃতদেহগুলি স্তূপাকারে পড়ে থাকে, আতঙ্কিত পায়রার দল ঝাঁকে ঝাঁকে আর্তকূজন করে উড়ে বেড়ায়।

কিন্তু এখান থেকে মাইল খানেক দূরে নবগ্রামে আজই একটা বৃক্ষ রোপণ উৎসব খুবই সমারোহের সঙ্গে শেষ হলো। পৌরোহিত্য করলেন কাব্যতীর্থ। সর্বকামফলপ্রদ বৃক্ষরূপী জনার্দনের ছায়াঘন করুণাকে মাটির পৃথিবীতে আহ্বান ক'রে মুগ্ধ মনের তৃপ্তি নিয়ে একা একা এই পথে কাঞ্চীপুর ফিরে যাচ্ছিলেন কাব্যতীর্থ। তিনি বিশ্বাস করেন, এ মাটি সত্যিই আঁচল পেতে মানুষের মুখের পানে চেয়ে আছে, সে-আঁচল শুধু প্রাণের ফুলে ও ফলে ভ'রে দিতে হয়, কখনো শূন্য ক'রে রাখতে নেই। ভুবনস্য ধর্ত্রী পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ···কিন্তু কাব্য-

তীর্থের মুগ্ধমনের গুঞ্জরণ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। মিনার্ভা বিলডার্সের ক্যাম্পের কাছে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, শাল আর অর্জুনের মৃত দেহগুলির দিকে তাকালেন। তারপর নিজের মনেই বলে উঠলেন—কী নিষ্ঠুর! কী ভয়ানক!

ক্যাম্পের ভেতর ঢুকে পদস্থ গোছের এক ভদ্রলোকের কাছে এসে দাঁড়ালেন কাব্যতীর্থ।—আমার একটা বক্তব্য ছিল, কাকে বলি?

পদস্থ গোছের ভদ্রলোক বললেন—আমাকে বলুন, আমিই এই কোম্পানীর ওভারসিয়ার।

কাব্যতীর্থ—বনটাকে এভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে কেন?

ওভারসিয়ার—উচ্ছেদ মানে কি মশাই? জঙ্গল কাটা হচ্ছে।

কাব্যতীর্থ—কেন?

ওভারসিয়ার—কাঠের জন্য।

কাব্যতীর্থ—কাঠের জন্যে বনটাকে নির্মূল করবেন, আমাদের যে সর্বনাশ হবে।

ওভারসিয়ার বিরক্ত হয়ে বলেন—আবোল তাবোল বকবেন না মশাই। সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়ে লীজ নেওয়া হয়েছে। লোকসান হলে মিনার্ভা বিলডার্সের হবে। আপনার সর্বনাশটা কি হবে মশাই?

কাব্যতীর্থ হাত জোড় করেন—না, একাজ করবেন না। পায়রা পরীর বন নির্মূল করে দিলে অন্ততঃ বিশটা গ্রাম মরুভূমি হয়ে যাবে।

ওভারসিয়ার সন্দিগ্ধভাবে কাব্যতীর্থের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর ডাক দিলেন—দারোয়ান?

কাব্যতীর্থ তেমনি হাতজোড় করে আবেদন জানাচ্ছিলেন—দেখতেই তো পাচ্ছেন, গাছগুলির গায়ে সিঁদুর মাখানো। গাঁয়ের লোক পূজো করে গেছে। মাত্র কতগুলি কাঠের লোভে এই গাছ কাটবেন না,

আমাদের ছায়া মেঘ বৃষ্টি পাখির ডাক এভাবে শেষ করে দেবেন না। আমাদের রোগের ওষুধ এই বনের লতাপাতা, আমাদের······।

ওভার্সিয়ার হাসছিলেন। দারোয়ান কাব্যতীর্থের ঘাড়ে হাত দিয়ে বলে—শালা পাগলা কাঁহাকা!

কাব্যতীর্থকে ধাক্কা দিয়ে ক্যাম্পের বাইরে নিয়ে আসে দারোয়ান। কাব্যতীর্থ বলে—জোর করলে কিছু হবে না ভাই। আমি গাছ কাটতে দেব না।

প্রত্যুত্তরে দারোয়ান আরও জোরে একটা ধাক্কা দেয়। কাব্যতীর্থ মুখ থুবড়ে পড়ে যান। তবু খুব বেশী আঘাত লাগে না, মাত্র ভুরুর ওপরটা সামান্য কেটে গিয়ে রক্ত দেখা দেয়।

কাব্যতীর্থ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে সত্যি পাগলের মতই চেঁচিয়ে বলতে থাকেন—এ বন নষ্ট করতে দেব না, দেব না, দেব না·· ···।

কাব্যতীর্থের মত মানুষের পক্ষে পাগল হয়ে যাবারই কথা। এই পায়রাপরীর বন, যেন বনস্পতিময় আদিম পৃথিবীর একটি পুরাতন ভালবাসার হৃদয় কাঞ্চীপুরের প্রতিবেশীরূপে দাঁড়িয়ে আছে, আজ কতকাল ধরে। কত ঝড়ো হাওয়ায়, কত বনফুলপরিমলের সৌরভে, কাঞ্চীপুরকে কত রূপকথা দান করে আস্‌ছে এই পায়রাপরীর বন।

কাব্যতীর্থ চেঁচিয়ে বলছিলেন—এ বন গেলে আমরা ভিখিরী হয়ে যাব, আমাদের গ্রাম পুড়ে যাবে, এ বন নষ্ট করতে দেব না।

একটি দু'টি করে পথচারী গ্রামের লোক ব্যস্তভাবে কৌতুহলী হ'য়ে কাব্যতীর্থের কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর আরও আসে। খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যায় চারদিকে। দলে দলে নানা গ্রামের লোক ছুটে আসতে থাকে। প্রবীর মাস্টারও খবর পেয়ে ছুটে আসে। বাণীপীঠের ছেলেরাও এসেছে।

বেলা দুপুর হতে না হতেই হাজার খানেক মানুষের একটা জনতা

মিনার্ভা বিলডার্সের ক্যাম্প ঘিরে ফেলে একসঙ্গে হাতযোড় ক'রে অনুরোধ করে—বন নষ্ট করবেন না।

ক্যাম্প ছেড়ে সব চেয়ে আগে পালিয়ে যায় দারোয়ান আর ওভার্সিয়ার। ওভার্সিয়ার উর্ধ্বশ্বাসে সাইকেল চালিয়ে ষ্টেশনের দিকে পালিয়ে যান, দারোয়ান দৌড়তে দৌড়তে। একদল করাতীও ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে একটা গাছের ছায়ায় শান্তভাবে কাব্যতীর্থ বসে ছিলেন। ভুরুর ওপর কপালের হাড়টা ফুলে উঠেছিল। চাদরের একটা প্রান্ত দিয়ে ভুরুর ওপর ক্ষত-চিহ্নটা হাত চিয়ে চেপে রাখেন কাব্যতীর্থ। একটু বিচলিত ভাবেই বলেন—প্রবীর, তুমি আমাদের গাঁয়ের লোকগুলোকে শান্ত কর ভাই, যেন কারও গায়ে হাত না দেয়।

জনতা তখন চীৎকার করে দুটো করাতের কলকে হিঁচড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, ঠাকুরপুরের বিলে ডুবিয়ে দেবার জন্যে। প্রবীর গিয়ে বাধা দেয়।

মিনার্ভা বিলডার্সের কিছু লোক তখনও সন্ত্রস্তভাবে বসে ছিল। প্রবীর তাদের অনুরোধ করে—আপনারাও চলে যান, আর এখানে আসবেন না। আমরা গাছ কাটতে দেব না।

ক্যাম্প শূন্য হয়ে যায়। গাঁয়ের লোকদেরও প্রবীর অনুরোধ করে—বাস্, আজ এই পর্যন্ত। আপনারাও ঘরে ফিরে যান।

সবাই ঘরে ফিরে যায় এবং সবশেষে কাব্যতীর্থ প্রবীর মাস্টার এবং বাণীপীঠের ছেলেরাও ফিরতে থাকে। তখন বিকেল হয়ে এসেছে। ঠাকুরপুরের বিলের ওপর সূর্য নাম্‌ছে অস্তস্নানের জন্য, জলে রং ধরেছে।

তারার মা সেই রাত্রেই সোমার চিঠি প্রবীর মাস্টারকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু আজ সকাল পার হয়ে গেছে কখন্, তবু চিঠির প্রত্যুত্তর এল না। চিঠির নির্দেশমত, সকাল হলেই প্রবীর মাস্টারের একবার এসে দেখা করবার কথা। কিন্তু প্রবীর তো আসেইনি, এমন কি চিঠির বদলে

চিঠি দিয়ে একটা জবাবও দেয়নি। যেমন দায়িত্ববোধ তেমনি সৌজন্যবোধ।

"সেক্রেটারী, গ্রাম সেবা মণ্ডল, সমীপেষু……।

চিঠিটার ভাব ভাষা ও বিষয় আদ্যোপান্ত মনে পড়ে সোমার। শিশুভবনের জন্য ভারতবর্ষের একটা বড় মানচিত্র চাই, মহাত্মা গান্ধীর একখানা ছবি চাই। ছেলেমেয়েদের গায়ে জামা বলে কোন বস্তু নেই, এই বীভৎস দৃশ্য সোমা সহ্য করতে পারবে না। অবিলম্বে এক ডজন ফ্রক আর দু'ডজন শার্ট চাই। একজন কবিরাজ বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হোক্, প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের একবার ক'রে দেখে যাবে। আর, এতগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, দুধের বরাদ্দ মাত্র আধ সের! দৈনিক অন্ততঃ সের পাঁচেক ক'রে দুধ চাই।

একসঙ্গে এতগুলি দাবী। কিন্তু এর মধ্যে বিসদৃশ ব্যাপার এমন কি-ই বা আছে? এটা সোমার ব্যক্তিগত স্বার্থের দাবী নয়, এবং এর জন্যে তাকে টাকা খরচ করতে হবে না। এটা প্রবীর মাস্টারেরও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এবং তার পক্ষেও নিজের পয়সা খরচ করতে হবে না। খরচ হলে হবে নয়নবাবুর, গ্রামসেবা মণ্ডলের বদান্য প্রেসিডেন্টের। সোমার অধিকার, শিশুভবনের অধ্যক্ষা হিসেবে সেবামণ্ডলের সেক্রেটারীকে সে নির্দেশ দিতে পারে। এবং বেশ স্পষ্ট ক'রেই দিয়েছে। এখন সেক্রেটারীর কর্তব্য, নয়নবাবুর কাছে গিয়ে ধর্না দিয়েই হোক্ আর যেমন ক'রেই হোক্, এই নির্দেশ বর্ণে বর্ণে পালন করা।

সবই খুব সাবধানে নিয়ম বাঁচিয়ে রীতি অনুযায়ী লিখেছিল সোমা, সরকারী অফিসের রিকুইজিশন নোটিশের মত। কিন্তু এই সব সরকারী দাবীর মধ্যে কোথা থেকে এক অগোচরের দাবী ঢুকে শেষ পর্যন্ত সোমাকে আবার সাংঘাতিকভাবে ভুল করিয়ে দিল। চিঠির শেষদিকের লেখাগুলি মনে পড়ে সোমার।

"……পুনশ্চ, সকালবেলা সময় ক'রে একবার আসবেন। তারার মা'র কাছে শুনলাম, আপনি আমার ঘরের ভেতর ঢোকেননি, আমার জিনিসপত্র 'ছোঁয়া' যাবে বলে। ধন্য আপনার সংস্কার। এ'তে যে আমার শিক্ষাদীক্ষাকে আপনি কতখানি ছোট ক'রে দেখলেন, তা বোধ হয় বুঝতে পারেন নি। যাই হোক্, আপনাকেই আপনার ভুল শুধরে নিতে হবে। একবার আসবেন, এই ঘরেই চা খেয়ে যাবেন, কি 'ছোঁয়া' গেল কি না গেল, তার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।"

এই পুনশ্চটাই সব ভুল ক'রে দিয়েছে। এটা তো আর শিশুভবনের সরকারী দাবী নয়, নিতান্ত ব্যক্তিগত। হয় একটা অন্যায়বোধের যন্ত্রণা থেকে, নয় কোন রুদ্ধ সমবেদনার উপদ্রব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই সোমা প্রবীর মাস্টারকে সামান্য একটা অনুরোধ করেছিল। সে আসুক্, বুঝে যাক্, সকলেই মানুষকে সংস্কারের চোখ দিয়ে দেখে না।

প্রবীর মাস্টার আসেনি। অনুরোধের মর্যাদা বুঝবার মত মানুষ এরা নয়। এরা শুধু নয়নবাবুর বৃত্তির দাপটে হুকুম তামিল করতে পারে। সব জেনে শুনে আবার ভুল করে যেচে অপমান গায়ে মেখেছে সোমা। যত চিন্তা করা যায় অপমানটা ততই যেন তীক্ষ্ণ হয়ে মনের ভেতর বিঁধতে থাকে। জীবনে কোনদিন কোন একদিনের পরিচিত পুরুষকে চা খেতে আহ্বান করবে, দু'দিন আগেও সোমা এমন অসম্ভব ঘটনা কল্পনা করতে পারেনি। এমন পরিষ্কার ভাষায় কোন যুবককে নিমন্ত্রণলিপি সে লিখতে পারে, এটাও বিস্ময়ের বিষয়। কোন্ এক দুনিরীক্ষ্য গ্রহের প্রকোপে যেন সোমার চিরদিনের অভ্যস্ত অহংকারের জীবনকে মুহূর্তে মুহূর্তে ওলটপালট করে দিতে আরম্ভ করেছে। এই বোধ হয় অধঃপতনের আরম্ভ।

অপমানটা আরও দুঃসহ, কারণ এই অধঃপতনও যে নিতান্ত ব্যর্থ। প্রথম নিমন্ত্রণলিপিও প্রত্যাখ্যাত হয়।

সোমা নিজের ঘর ছেড়ে আঙিনায় নেমে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে। পুকুরের ঘাটে ছেলেরা হৈ চৈ ক'রে স্নান করছে, সোমা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তালের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছেলেদের স্নানের দৃশ্য দেখে। যারা বয়সে একটু বড়, তারা জল তোলপাড় ক'রে সাঁতার দিয়ে স্নান করছে। যারা ছোট, সিঁড়িতে ব'সে জলে পা ডুবিয়ে এক একটা তালপাতার ঠোঙা দিয়ে জল তুলে মাথায় ঢালছে।

এর মধ্যে শুধু একমাত্র জনা নিজের জন্যে ব্যস্ত নয়। ভোলাকে অনেক ওপরের একটা সিঁড়িতে সাবধানে বসিয়ে রেখে জনা নিজে নীচে নেমে এসে জল তুলে নিয়ে যায়, ভোলাকে স্নান করায়, হাত দিয়ে ঘষে ঘষে ভোলার পায়ের ধুলো-ময়লা ধুয়ে দেয়। ভোলা আনন্দে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে।

এই জনা মেয়েটাকে দেখতে কেমন ভয় করে সোমার। ওর মা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা ক'রেছে, কিসের লোভে জনাকে নিজের কোল থেকে নামিয়ে পৃথিবীর কোলে ফেলে দিয়ে জনার মা স'রে পড়লো কে জানে? এক রত্তি মেয়ে জনা, ভোলা ওর কেউ নয়। কিন্তু ভোলার জীবনের সত্যিকারের অধ্যক্ষা এই জনা। শিশুভবনের গুরুমা হয়েও সোমার পক্ষে যেকাজ করা অসম্ভব, শিশুভবনের শিশু হয়েও জনার পক্ষে সেটা কত অনায়াস-সাধ্য। মা হওয়ার বোন হওয়ার যে নিয়মগুলি সংসারে প্রচলিত আছে, জনা যেন তার মিথ্যা চরম করে প্রমাণিত করে ছেড়েছে। কোন সর্ত নেই, সম্পর্ক নেই, স্বার্থ নেই, ঘাট টাকা মাইনের দাবী নেই—জনা যেন একটা প্রাণের আবেগ, ভোলাকে সর্ব্ব অকল্যাণের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা পাহারা দিয়ে ফিরেছে। কেমন ক'রে এটা সম্ভব হয়, সোমার মন এই প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায় না। তারার মা অবশ্য

এই রহস্যের ব্যাখ্যা ক'রে মাঝে মাঝে মন্তব্য করে—জনা, তুই নিশ্চয় আগের জন্মে ভোলার মা ছিলি।

তা'হলে তো ভোলাকে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান বলতে হয়। জন্মে জন্মে একই মা পেয়ে আসছে। যাক্ গিয়ে, এসব তত্ত্ব নিয়ে বেশী চিন্তা করতে গেলে শুধু নিজেকে অনর্থক বিব্রত করা হবে। সোমা নিজের ঘরে ফিরে আসে।

পর পর দুটি চিঠি লেখে। একটি চক্রবেড়ের ঠিকানায়, মা'কে। আর একটি শ্যামবাজারের ঠিকানায়, ভদ্রাকে।

মা'কে এক কথায় আশ্বস্ত ক'রে সোমা লেখে—বেশ ভাল আছি, চাক্‌রিটা ভাল, জায়গাটা ভাল, লোকজনগুলি খুবই ভাল, কোন চিন্তা ক'রো না।

ভদ্রাকে লেখে—একরকম বেঁচে আছি, চাক্‌রিটা অদ্ভুত, জায়গাটা বিচিত্র, লোকগুলি দুর্বোধ্য, জানি না আবার কবে তোদের সঙ্গে দেখা হবে।

চিঠি লেখা শেষ ক'রে, আবার বাইরে বের হবার জন্য তৈরী হচ্ছিল সোমা। কি ভেবে চুপ ক'রে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। তারপর আর একটি চিঠি লেখে।

"শ্রীনয়নচন্দ্র চৌধুরী, প্রেসিডেণ্ট গ্রামসেবা মণ্ডল সমীপেষু......।

লিখতে গিয়ে একবার হাত কাঁপে, বুকের ভেতর শ্বাসবায়ুর ছন্দ যেন এলোমেলো হয়ে যায়, কপালটা স্বেদাক্ত হয়ে ওঠে। প্রতিশোধের একটা ক্ষুদ্র স্পৃহা যেন শিশু সরীসৃপের শীতাক্ত স্পর্শের মত সোমার চিন্তাকে শুঁড়িয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার অসুবিধার কথা আপনাকে জানাইবার জন্য আপনিই বলিয়াছিলেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সমিতির সেক্রেটারী প্রবীরবাবুকে স্পষ্টভাবে এই নির্দেশ

দিবেন যে, শিশুভবনের কাজে অথবা আমার ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজনে তিনি যেন সাহায্য করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ না করেন। দুঃখের বিষয়, কতগুলি কাজের বিষয় তাঁহাকে জানাইয়াও উত্তর পাই নাই।......

সংক্ষেপে এবং অতি দ্রুত চিঠিটা শেষ ক'রে ফেলে সোমা। ঠিকানা লিখে চিঠিগুলি সব এক সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরে এসে তারার মা'র কাছে দাঁড়ায়।

সোমা—ডালের হাঁড়িগুলো ওরকম খোলা রেখো না তারার মা, পাতা দিয়ে ঢেকে দাও। নইলে দেখতে কেমন ঘেন্না করে।

তারার মা বিরক্তভাবেই উত্তর দেয়—ঘেন্না করলে চল্‌বে কেন? বিনা মাইনেতে দেশের কাজ এইরকমই হয়ে থাকে!

সোমা—থাক্‌গে ওসব কথা, কাল রাত্রে প্রবীর মাস্টারের কাছে আমার চিঠিটা ঠিক পৌঁছেছিল তো?

তারার মা—হ্যাঁ গো, তার হাতে দিয়েছি, আমার সামনেই তো সে চিঠিটা পড়লে।

সোমা—বেশ বেশ। আজ এই চিঠি ক'টা ডাকে যাবে।

তারার মা—চৌকাঠের ওপর রেখে দাও।

সোমা—আমি শুচিদির বাড়িতে একবার যাচ্ছি।

তারার মা—এস, দেরি করো না।

কাব্যতীর্থের স্ত্রী শুচি অনেকক্ষণ ধ'রে অস্থিরভাবে এদিক ওদিক করছিলেন। একবার ঘরের ভেতরে, একবার বাইরে, তারপর নেমে এসে অপরাজিতার বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন।

সোমাকে দেখতে পেয়ে বলেন—এস ভাই।

সোমা—শুচিদি, বড় ব্যস্ত আছেন মনে হচ্ছে ?

শুচি—হ্যাঁ ভাই।

সোমা ঠাট্টা করে—কাব্যতীর্থমশাই বোধ হয় ফিরতে দেরি করছেন ?

শুচি পথের দিকে দূরান্তে দৃষ্টি তুলে বলে—তার জন্যে নয়, কি একটা হাঙ্গামা বেধেছে নদীর ওপারে, গাঁয়ের লোকজন সব সেইদিকে দৌড়ে গেছে।

সোমা—কাব্যতীর্থ মশাইও বুঝি সেখানে গেছেন ?

শুচি—উনি সেখানেই ছিলেন, শুনলাম ওঁকে কোন্ কোম্পানীর লোকেরা মেরেছে।

সোমার মুখটা হঠাৎ যন্ত্রণার আঘাতে বিবর্ণ হয়ে যায়। কাব্যতীর্থের মত মানুষকে মেরেছে, ঘটনাটা কল্পনা করতেও কেমন ভয়ানক অস্বস্তি হয়, এ যে দেববিগ্রহ লাঞ্ছিত করার চেয়েও জঘন্য অপরাধ।

বেদনারুদ্ধ নিঃশ্বাস মুক্ত করে দিয়ে সোমা বলে—এ আপনাদের এক অদ্ভুত দেশ শুচিদি, এখানে সবই সম্ভব।

শুচির উদ্বিগ্ন দৃষ্টিটা তেমনি পথের দিকেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে। সোমা সান্ত্বনার সুরে বলে—বেশী চিন্তা করবেন না শুচিদি, গাঁয়ের লোকজন যখন সবাই তাঁকে সাহায্য করতে ছুটে গেছে তখন……।

শুচি—বেশী চিন্তা কিছুই করছি না। সে পাগলকে তো আমি ভাল ক'রে চিনি, হাসতে হাসতে ফিরে আসবে। কিন্তু প্রবীর ঠাকুরপোও গেছে কি না, তাই ভয় হয়।

সোমা—কেন ?

শুচি—ওর গায়ে যারা হাত দিয়েছে তাদের সামনে পেলে কি ক্ষমা করে ছেড়ে দিয়ে আসবে প্রবীর ঠাকুরপো ? প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বে, তা'তে তার প্রাণ থাক্ আর যাক্। সেই জন্যে ভয়। তবে একটা ভরসা, সে সামনে আছে, রক্তারক্তি ঘটতে দেবে না।

সোমা—আপনার প্রবীর ঠাকুরপো দেখছি, একটি খাঁটি লক্ষ্মণ ভাই।

শুচি—তা ঠিকই বলেছ।

সোমা—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো শুচিদি?

শুচি—বল।

সোমা—এমন লক্ষ্মণ ভাইটিকে আপনারা ঘরের বাইরে পাত পেড়ে খেতে দেন কেন? ছোঁয়া যাবার ভয়ে?

শুচি—এ প্রশ্ন ক'রে আর আমাকে লজ্জা দিও না ভাই। এ আমার মনের দোষ নয়, অভ্যাসের দোষ। অথচ এ পোড়া অভ্যাসের কোন মানেও বুঝি না।

সোমা—কাব্যতীর্থ মশাইও কি অভ্যাসের দোষেই……।

শুচি—না ভাই, তার মনেও এ দোষ নেই, অভ্যেসেও ছিল না।

সোমা—তবে তিনি এসব কুসংস্কার মেনে চল্‌ছেন কিসের জন্যে?

শুচি যেন একটা লজ্জার বাধায় কিছুক্ষণ ইতস্তত: করে, তারপর স্পষ্ট ক'রেই বলে ফেলে—আমার জন্যে।

সোমার মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে শুচি আবার বলে—তুমি ভদ্রলোককে যা ভাব্‌ছো, সে তা নয় সোমা। সে আমাকে আশীর্বাদ ক'রে বলেছে—আমার এ ভুল একদিন ভেঙ্গে যাবে। আমিও জানি, একদিন ভাঙবে, ওর কথা তো মিথ্যে হবার নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় ভয় হয় সোমা, কি জানি ক'বে কেমন ক'রে এ ভুল ভাঙবে।

শুচির চোখ দুটো হঠাৎ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। সোমা অনুতপ্ত ও অপ্রস্তুত হয়ে বলে—আপনি কিছু মনে করবেন না শুচিদি। আপনাকে লজ্জা দেবার জন্যে আমি এসব প্রশ্ন করিনি।

শুচি শান্ত স্বরে উত্তর দেয়—কিছু মনে করিনি। মনে করবার কিছু নেই।

এরপর আর কোন প্রসঙ্গ খুঁজে পায় না বলেই হয়তো সোমা জিজ্ঞেস করে—আপনার রান্নাবানা সারা হয়ে গেছে?

শুচি—আরম্ভই করিনি তো সারা হবে কি? এসব খারাপ খবর শুনলে কি আর কোন কাজে মন লাগে? কখন্ যে ফির্‌বে কে জানে!

কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, কোন পরিকল্পনা ক'রে সোমা এসময় শুচির সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। নেহাৎ একটা ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছে। আসার আগে, পথে আসতে এবং এখানে আসার পরেও সোমা জানতো না যে, এক অকারণ অপমানের ইতিহাস তদন্ত ক'রে জানবার জন্যেই অগোচর ইচ্ছার ঝোঁকেই এখানে সে এসেছে। কিছুক্ষণের প্রসঙ্গহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে সোমার মনে পড়ে, কী সেই পরম জ্ঞাতব্য, যা জানতে না পারা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

সোমা জিজ্ঞেস করে—প্রবীরবাবু কখন্ গেছেন আপনি জানেন?

শুচি—অনেকক্ষণ, সেই কোন্ সকালে!

সোমার প্রশ্নাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে শুচি যেন একটা নতুন অর্থ এতক্ষণে বুঝতে পারে। কথাগুলি সান্ত্বনার মত কোমল ক'রে নিয়ে শুচি বলে—তোমার ওখানেই তো যাচ্ছিল, চা খেতে ডেকেছিলে না?

সোমার সারা মুখে এক ঝলক্ রক্তাভ ছায়া চকিতে ছড়িয়ে পড়ে। কি যেন বলতে চেষ্টা ক'রেও বলতে পারে না।

শুচি আরও স্পষ্ট ক'রে সান্ত্বনা দেয়—কি আর করবে ভাই বল? ব্যাণ্ডীপীঠের ছেলেরা এসে হাঙ্গামার খবর দিল, শোনা মাত্র ছুটে চলে গেল।

সোমা উঠে দাঁড়ায়—আমি যাই শুচিদি।

সোমার আকস্মিক ব্যস্ততায় শুচি একটু বিব্রত হয়েই বলে—যাবে? আচ্ছা এস, বেলাও অনেক হয়েছে।

আবার ভুল। ক্ষণিক অন্ধতার ভুল, শিক্ষার ভুল, কলকাতার তৈরী মনের ভুল এবং হয়তো বয়সের অভিমানের ভুল। মানুষ চিনতে বার বার ভুল করছে সোমা।

নিজের হাতে জ্বালানো এক মহা মূঢ়তার আগুন, নিজেই নিভিয়ে দেবার জন্য সোমা যেন ছুটে ফিরে যায় শিশুভবনের দিকে।

সমস্ত পথটা যেন একটা নিঃশ্বাসের ঝোঁকে অতিক্রম ক'রে শিশুভবনে ফিরে আসে সোমা। আঙিনায় ঢুকেই চেঁচিয়ে ডাকে—তারার মা!

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তারার মা সাড়া দেয়—কি বল্‌ছো?

সোমা—আমার চিঠিগুলো কই?

তারার মা—সে কি? কখন্ ডাকে দিয়ে এসেছি, আমি কাজ ফেলে রাখি না গুরুমা।

শাস্তিভীত অপরাধীর মূর্তির মত অবসন্নভাবে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরে যায়। বিছানার ওপর কিছুক্ষণ নিঃসাড়ভাবে বসে থাকার পর সোমা বুঝতে পারে যে, মাথাটা বড় ভার হয়ে বার বার ঝুঁকে পড়ছে।

হীন অহংকারের কলঙ্কে স্বাক্ষরিত সেই মিথ্যা অভিযোগের লিপিকা, এতক্ষণে নয়ন চৌধুরীর দরবারে রওনা হয়ে গেছে। অভিযোগগুলি এমন একজনের বিরুদ্ধে, যে আজ সকালে তার জীবনের প্রথম লেখা আমন্ত্রণপত্রের সম্মান রাখতে সাগ্রহে সাড়া দিয়ে আসছিল।

অনেকদিন অনেক যুক্তি প্রশ্ন দিয়ে বিচার ক'রেও নিজেকে যতখানি চিনতে পারেনি, আজকের অনুশোচনায় ভরা চোখের দৃষ্টি দিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজের স্বরূপ তার চেয়ে বেশী স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারে সোমা।

সোমা বুঝতে পারে, জীবনে এই প্রথম সে এক ঘৃণ্য নীচ কাজ করেছে। শুধু বুঝতে পারে না, কার জন্যে করলো।

সোমা বুঝতে পারে, প্রবীর মাস্টারের ওপর তুচ্ছ কারণে অথবা অকারণে এতবেশী রাগ করা তার পক্ষে কত অশোভন। বুঝতে পারে না, কেন রাগ হয়।

সোমা বুঝতে পারে, নতুন হাওয়ার আনন্দে পতঙ্গের প্রগলভ্ চাঞ্চল্যের মত কাঞ্চীপুরের অতিরিক্ত সমাদরে তার আচরণগুলি নির্লজ্জ রকমের দুরন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার চিত্তলোকের গহনে যে এক শুক্তির তৃষ্ণা স্বাতীজলের আশায় অস্থির হয়ে উঠেছে, এইটুকু শুধু বুঝতে পারে না সোমা।

বেলা বাড়ছে, বুঝতে পারে সোমা, কিন্তু স্নান করার উৎসাহ কেন নেই, হয়তো সেটা বোঝবার চেষ্টা করে না।

তারার মা এসে খেতে ডাকে।

সোমা বলে—এবেলা আর খাব না।

তারার মা রাগ ক'রে চলে যায়। তারার মা'র রাগ করার অর্থ বুঝতে পারে সোমা। শুচিদিও না খেয়ে আছেন, স্বামী ঘরে ফিরে এসে না খাওয়া পর্যন্ত শুচিদির খাওয়া হতে পারে না। সবই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু সোমার পক্ষে না খেয়ে থাকবার কোন কারণ নেই, এটাও যুক্তি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে না সোমা।

বিকেল হয়ে আসে। শিশুভবনের আঙিনা ছেলেমেয়েদের খেলার চাঞ্চল্যে অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু নদীর ওপারে কে জানে কতদূরে, হাঙ্গামাটা শান্ত হলো কি না এখনো জানতে পারা গেল না। সবাই নিরাপদে সুস্থ ভাবে ফিরে এলে হয়। ক্ষণে ক্ষণে সোমার মন দুশ্চিন্তায় উপদ্রুত হতে থাকে, চেষ্টা ক'রেও একটা বই মন দিয়ে পড়া যায় না। কিন্তু ঠিক শুচিদির অনুকরণ ক'রে এভাবে অস্থির হয়ে দুশ্চিন্তার অভিনয় করা সোমার পক্ষে যে শোভা পায় না, সোমা সেটা বুঝতে চায় না।

সন্ধ্যেও হয়ে গেল। সোমা ঘর ছেড়ে উঠে আসে। তারার মাকে অনুনয় ক'রে বলে—তুমি কষ্ট করে একবার যাও তারার মা, শুচিদির কাছে জেনে এস সবাই ফিরেছে কি না।

আলোটা কেঁপে কেঁপে জ্বলে। শিশুভবনের অন্য ঘরে ছেলেমেয়েদের আবোল-তাবোল গানের শব্দ শোনা যায়। সন্ধ্যা হাওয়ার ছোঁয়া লেগে আঙিনার কেড়ার ধারে একটা কাপাস গাছের শুঁটি ফেটে যায়, শ্বেত মেঘের চূর্ণ অবয়বের মত এক রাশ তুলো উড়ে এসে সোমার ঘরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঘরটা যেন ক্ষণিকের মত স্বপ্নেদেখা এক ফুলছড়ানো বাসরঘরের মত অলীক হয়ে ওঠে।

—গুরু-মা!

তারার মা ফিরে এসে ডাকে। সোমাও ঠিক ঘুমিয়ে পড়েনি, তবু চমকে উঠে উত্তর দেয়—কি খবর?

তারার মা—সবাই ফিরে এসেছে। সবাই খেয়েছে। তুমি খাওনি শুনে সকলে খুব রাগ করেছে।

সোমা—কে রাগ করলো?

তারার মা—সবাই। শুচি, বিনোদ পণ্ডিত, প্রবীর মাস্টার ····।

সোমা—আমি খাইনি, সেকথা প্রবীর মাস্টারও শুনেছে নাকি?

তারার মা—হ্যাঁ, আমিই তো বললাম।

সোমা—উনি কি বললেন?

তারার মা—প্রবীর মাস্টার উল্টো আমাকেই ঠাট্টা করলো, আমি তোমাকে ধমক দিয়ে কেন খাওয়াইনি, সেই জন্যে।

সোমা হেসে ফেলে—উনি একবার ধমক দিতে এলেই তো পারতেন।

তারার মা—আসতো নিশ্চয়, কিন্তু এক্ষুণি দু'জনে আবার মত্তিগঞ্জ চলে গেল।

সোমা একটু চমকে ওঠে—মত্তিগঞ্জ? কেন?

তারার মা—ঐ আজকের হাঙ্গামার ব্যাপার নিয়ে। আর বল কেন? ছেলে দু'টোর জন্যে বড় দুঃখ হয়, দেশের কাজের জন্যে মিছিমিছি কি হায়রানি হচ্ছে!

অন্য সময় হ'লে সোমা হয়তো আবার এই সংবাদের ওপরেই নিজের বুদ্ধি দিয়ে গবেষণা করতে বসে যেত। কিন্তু আর সে সাহস নেই, নিজের যুক্তির ওপর অত্যুচ্চ শ্রদ্ধাও আর নেই। আর চিন্তা করতে গেলেই ভুল হবে। নিজের বিদ্যেবুদ্ধি দিয়ে কাঞ্চীপুরের অত্যদ্ভুত রহস্যময় আত্মাকে ধরতে যাওয়া বৃথা। বরং, সন্নত শিরে, প্রিয়শিষ্যার নম্রতা নিয়ে কাঞ্চী-

পুরের হৃদয়ের কাছে ধরা দেবার জন্যেই সোমা যেন এরই মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেছে।

কাঞ্চীপুরের ঘরের মেয়ের মতই সোমা বলে—আমাকে খেতে দাও তারার মা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

নয়নের বৈঠকখানা। বছর কয়েক আগে এই বৈঠকখানাতেই ঐ তক্তপোষে বসতো গাঁয়ের মক্কেলেরা, আর চেয়ারটাতে বসতেন নয়নের বাবা বটকৃষ্ণ উকিল। আজও সেই তক্তপোষ এবং সেই চেয়ার রয়েছে। কিন্তু চেয়ারে বসে আছেন বটকৃষ্ণের ছেলে নয়ন, আর তক্তপোষে কাব্যতীর্থ ও প্রবীর মাস্টার। নয়ন উকীল নয়, সে গ্রাম সেবা মণ্ডলের প্রেসিডেন্ট। আর তক্তপোষে বসে রয়েছেন যে কাব্যতীর্থ এবং প্রবীর মাস্টার, তাঁরাও মক্কেল নয়, তাঁরা হলেন গ্রাম সেবা মণ্ডলের কর্মী। দু'পুরুষেই কী বিরাট পরিবর্তন! অথচ এই পরিবর্তনের তাৎপর্য অনেকে বুঝতে না পেরে অযথা নিন্দে করে।

আবার এমন অনেকে আছেন, যাঁরা এই পরিবর্তনের মহিমা খুব বেশী করেই উপলব্ধি করেন। যেমন, স্বরাজ অয়েল মিলস্'এর মালিক মঙ্গলদাস মুলুকচাঁদ। ইনিও কংগ্রেসের একজন উৎসাহী সভ্য এবং এতক্ষণ ইনিই এখানে বিশেষ প্রয়োজনে বসেছিলেন। এই মাত্র তিনি খুশী হয়ে ব'লে গেলেন—বাস্ বাস্, ইসিকো তো বোলে ক্রান্তি। বাহিরটা সোব সেই আছে, সেই ইমারত, সেই সব কুছু। কিন্তু ভিতরটা বিলকুল বদল হোয়ে গেছে।

নয়নের জরুরী চিঠি পেয়েই আজ প্রবীর মাস্টার ও কাব্যতীর্থ এখানে এসে পৌচেছেন। কাব্যতীর্থের মাথায় একটা পটি বাঁধা। ভুরুর ওপর ক্ষতটাকে ওষুধ লাগিয়ে শুচি নিজের হাতে পটি বেঁধে দিয়েছে, কাব্যতীর্থের আপত্তি গ্রাহ্য করেনি। পথে এসে ইচ্ছে করলে পটিটা খুলে ফেলে দিতে

পারতেন কাব্যতীর্থ, কিন্তু তেমন ইচ্ছে করাটাই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ওটা শুচি নিজের হাতে বেঁধে দিয়েছে।

নয়ন প্রথম কাব্যতীর্থের মাথার পটিটার দিকেই নজর দেয়।—আপনার মাথার ব্যাণ্ডেজটা একটু বেশী বড় হয়ে গেছে ব'লে মনে হচ্ছে।

কাব্যতীর্থ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নয়ন—লোকের সামনে বের হতে আপনার লজ্জা হচ্ছে বোধ হয়।

কাব্যতীর্থ—আজ্ঞে না। আপনার সামনে আর লজ্জা কি?

নয়নের প্রশ্ন আর প্রশ্নের ভাষা শুনে চমকে ওঠে প্রবীর মাস্টার। কাব্যতীর্থের সঙ্গে নয়নকে এভাবে কথা বলতে কোনদিন সে শোনেনি। কাব্যতীর্থের ব্যাণ্ডেজটাকে, না কপালের ক্ষতটাকে, কোন্‌টাকে বিদ্রূপ করছে নয়ন?

নয়ন বলে—মিনার্ভা বিল্ডার্সের যিনি মালিক, তিনি হলেন বিনয় চৌধুরী। চেনেন বোধ হয়?

কাব্যতীর্থ—না।

নয়ন—তিনি আমার ছোড়দা, আমার কাকার ছেলে।

নয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার আরম্ভ করেন।—ভৈরববাবুও এসেছিলেন। এই দু'জনের কাছেই আমি আজ লাঞ্ছিত হয়েছি আপনাদের অপরাধের জন্য।

কাব্যতীর্থ—অপরাধ?

নয়ন—হ্যাঁ, প্রথম তো আপনারা অহিংসা নীতির ব্যতিক্রম ক'রে মিনার্ভা বিলডার্সের ক্যাম্প আক্রমণ করেছেন এবং তাদের লোকজনকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়……।

কাব্যতীর্থ—আমরা মোটেই আক্রমণ করিনি। আমরা শুধু অনুরোধ করেছিলাম…।

নয়ন—দু'হাজার লোক নিয়ে অনুরোধ করলে 'ওটা ঠিক অহিংসার ব্যাপার হয় না কাব্যতীর্থ মশাই।

কাব্যতীর্থ—সেটাই অহিংসা নয়নবাবু। দু'হাজার লোক অনায়াসে মারধর করতে পারতো, কিন্তু তা না করে শুধু অনুরোধ করেছে।

নয়ন—আপনারও কি এই ধারণা প্রবীর বাবু?

প্রবীর মাস্টার যেন জোর ক'রে নিজের মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। নয়নের প্রশ্নে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দেয়—অনুরোধ করে হোক্, আর গলা ধাক্কা দিয়ে হোক্, যেকোন ভাবে ওদের তাড়িয়ে দেওয়াই হলো অহিংসা।

নয়ন মাটির দিকে তাকিয়ে আবার কিছুক্ষণ কি ভাবেন। তারপর বলেন—যাক্, বোঝা যাচ্ছে যে অহিংসা সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা ও আমার ধারণার অনেক তফাৎ। হয়তো আমার ধারণাই ভুল।

কাব্যতীর্থ বিচলিত হয়ে ওঠেন।—না না নয়নবাবু, ভুল আমাদেরও হতে পারে। আপনি শুধু যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন কোথায় আমাদের ভুল, তাহ'লে…।

নয়ন—না কাব্যতীর্থ মশাই, ওভাবে কাউকে জোর ক'রে বোঝানোও আমার অহিংসা নীতির সঙ্গে খাপ খায় না।

নয়নের যুক্তির মহিমায় বোধ হয় হতভম্ব হয়ে কাব্যতীর্থ অসহায়ভাবে প্রবীরের দিকে তাকালেন। প্রবীর প্রশ্ন করে—ভৈরববাবু আর আপনার ছোড়দা, এঁদের কাছে আপনার লাঞ্ছিত হবার কি কারণ থাকতে পারে?

নয়ন—ছোড়দা বললেন, আমি আত্মীয়দ্রোহী হয়েছি। ভৈরববাবু বললেন, রাজনৈতিক মতভেদের জন্য আমি ঈর্ষাবশে তাঁর ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের পথেও উপদ্রব আরম্ভ করেছি।

প্রবীর—তাঁরা যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু আপনি সেসব গ্রাহ্য করবেন কেন?

নয়ন—অভিযোগগুলি সত্য বলেই গ্রাহ্য করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনারা এই কাণ্ড করেছেন, আর আপনারা হলেন আমার লোক। সুতরাং…।

কাব্যতীর্থ লজ্জিত ভাবে বলেন—আহা, ওভাবে বললে কথাটা কেমন ভুল বলা হয় নয়নবাবু। আমরা আপনার লোক, আপনিও আমাদের লোক।

নয়ন—কিন্তু বৃত্তিটা তো আমিই দিয়ে থাকি, আমাকে কেউ বৃত্তি দেয় না।

বৈঠকখানা ঘরটা কিছুক্ষণের জন্য মূর্চ্ছাহতের মত শুব্ধ হয়ে থাকে।

কাব্যতীর্থ বলেন—আচ্ছা, এইবার আমরা চলি।

নয়ন বিব্রতভাবে বলে—কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি পেলাম না তো!

কাব্যতীর্থ—কিসের প্রতিশ্রুতি?

নয়ন—আপনারা শুধু শিশুভবন ও বাণীপীঠের কাজ ছাড়া অন্য অবান্তর কাজে শক্তির অপচয় করবেন না।

কাব্যতীর্থ হেসে উত্তর দেন—এরকম প্রতিশ্রুতি কি হতে পারে নয়নবাবু?

নয়নের অট্টালিকার ফটক পার হয়ে সড়কের জনতার মধ্যে এসে কাব্যতীর্থ একটা হাঁপ ছেড়ে দাঁড়ান। প্রবীরকে কাছে টেনে নিয়ে কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে চলতে থাকেন। মতিগঞ্জ সহরের সরু ও সর্পিল জনবহুল পথের সব চাঞ্চল্য ও মুখরতা ভেদ ক'রে ছু'টি নিঃশব্দ প্রাণের মত কাব্যতীর্থ ও প্রবীর মাস্টার একমনে হেঁটে চলে যাচ্ছিলেন। সবে মাত্র সন্ধ্যার আলো জ্বালা জনপদের বুকে একটু একটু ক'রে মত্ততা জাগছে। সিনেমা ঘরে ভিড়, শুঁড়ির দোকানে ভিড়, ব্যাঙ্কে দোকানে ও গদিতে হিসাব ছাপিয়ে উপ্‌চে পড়া টাকার কাঁড়ি গুণে গুণে কারবারীর আত্মা আত্মহারা। যুদ্ধের শরণাগত, মুদ্রায় পরিস্ফীত, ইংরাজের ভারতরক্ষা উৎকোচে বশীভূত সারা ভারতবর্ষের বিকৃত সত্তারই একটি প্রতিচ্ছবি।

এত উল্লাস, এত উচ্ছলতা, তবু কাব্যতীর্থের বেদনার্ত দৃষ্টিটা যেন অসহায়ভাবে এ দৃশ্যের মাঝখানে ঘুরতে থাকে। মনে হয়, এ যেন টাকায় বিকিয়ে যাওয়া এক মহাশ্মশানের রূপ।

স্টেশনের দিকে অনেকদূর এগিয়ে এসেছেন কাব্যতীর্থ আর প্রবীর মাস্টার। সহরটা এখানে প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, তারপর আব্ছা অন্ধকারে একটা খোলা মাঠের আরম্ভ। মতিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি এখানে সন্ধ্যাদীপ জ্বালে না।

কিন্তু এই মাঠই তো কাব্যতীর্থের শিশুকাল থেকে পরিচিত সুধাময় ঠাকুরের পাট, বিস্মৃত এক বৈষ্ণব রাজার শ্রীস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে মাঠের মাঝখানে। স্তম্ভশীর্ষে আজ আর কোন পতাকা নেই, একটি শিশু অশ্বত্থ আকাশমুখী আনন্দে চঞ্চল হ'য়ে ডালপালা দোলায়। এই মাঠেই তো মেলা বসতো প্রতি বছরে, মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনে।

ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্সের হুমকি সুধাময় ঠাকুরের পাটে বাৎসরিক মেলা নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছে। কাব্যতীর্থ আর একটু এগি[illegible] গিয়ে বুঝতে পারেন, আর একরকমের মেলা বসে গেছে এখানে। এ মেলা বৎসরান্তের কোন মহালগ্নের মাঙ্গলিক উৎসব নয়। এ মেলা বসে আছে মাটির প্রতি কণিকা কলুষিত ক'রে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কাব্যতীর্থ দেখতে পান, মাঠের দু'দিকে দু'টো বসতি। একদিকে ফৌজের ছাউনি, তার মাঝখানে বৈষ্ণব রাজার শ্রীস্তম্ভ, নিতান্ত খুঁটোর মত তাঁবুর দড়ি শরীরে জড়িয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। তার গা ঘেঁষে একটা মদের ক্যান্টিন। শত শত তাঁবু, বিদেশের সেনা।

আর একদিকে মুখোমুখি আর একটু তফাতে, মাঠের ওপর আর একটা নতুন বস্তি। নতুন নতুন চাঁচের বেড়া, টিন ও খড়ের চালা দিয়ে তৈরী আর গ্যাস বাতি দিয়ে সাজানো সরকারী বন্দোবস্তে চালিত বেশ্যার উপনিবেশ। 'ইন বাউণ্ডস্'—ইংরাজীতে লেখা একটা কাষ্ঠফলক বড়

আলোর নীচে দাঁড়িয়ে বিদেশী সৈনিককে নৈশ লাম্পট্যের সঙ্কেত জানায়। শত শত কুটীর—কাব্যতীর্থের দেশের শত শত মেয়ে।

প্রবীরের হাতটা নিজের মুঠোয় শক্ত ক'রে ধরে তাড়াতাড়ি হাঁটেন কাব্যতীর্থ। মনে হয়, এই তো মহালগ্ন, পুঞ্জ পুঞ্জ কলুষের ভার মানুষের সত্যকে প্রায় চূর্ণ করে আনছে। এই সময়েই তো নীলকণ্ঠ জাগেন আর বিষপান করেন। যুগে যুগে এই লগ্নেই তো রুদ্রের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। এক যুগের আবর্জনাকে একদিনে পুড়িয়ে দেবার, এক শতাব্দীর পাপের পাহাড়কে একদিনে গুঁড়ো করে দেবার আহ্বান।

প্রবীর বলে—বিনোদদা, একটু দাঁড়াও।

স্টেশনে ঢুকতেই এক সারি আলোকোজ্জ্বল দোকানের মধ্যে একটা বইয়ের স্টলে উঁকি দিয়ে প্রবীর জিজ্ঞেস করে—গত সপ্তাহের হরিজন পত্রিকা এসেছে?

দোকানী বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রবীর—দিন।

পত্রিকা নিয়ে দোকানের আলোর সামনেই লেখাগুলির ওপর একবার তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে প্রবীর হঠাৎ কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কাব্যতীর্থের দিকে তাকিয়ে বলে—বিনোদ দা।

কাব্যতীর্থ এগিয়ে এসে বলেন—কি?

পত্রিকার লেখাগুলির মধ্যে একটা জায়গা প্রবীর আস্তে আস্তে কাব্যতীর্থকে প'ড়ে শোনায়, গান্ধীজীর আহ্বান—

"...হিন্দুস্থানমেঁ ভয়ংকর জ্বালামুখী ফুটেগী! তুম লোগ উসকে সাক্ষী রহনা, ঔর জব বহ সমীপ আ জায় তো উসমেঁ কুদ্ পড়না...... ।"

—হিন্দুস্থানে ভয়ংকর জ্বালামুখী ফুটে উঠবে। তোমরা সবাই তার সাক্ষী হয়ে থেক। আর, যখন এই জ্বালামুখীর শিখা সম্মুখে এগিয়ে আসবে, তোমরা তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সত্যিই যে রুদ্রের আহ্বান, নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ প্রাণকে এক বিরাট মরণ আহবে আত্মাহুতি দেবার আহ্বান। আসমুদ্র হিমাচল ভারতের রণগুরুরূপে আবার এক কৌপীনবস্ত্র মর্ত্যক্ষেত্র সেই বিরাট তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করেছেন। উনিশশো বিয়াল্লিশের পয়লা জুলাইয়ের সন্ধ্যারাত্রির আলোছায়ায় মতিগঞ্জ স্টেশনের পথে দাঁড়িয়ে দু'টি নিঃস্ব গ্রাম্য মানুষের বিশ্বাসী চিত্তে সেই ইঙ্গিতের প্রেরণা এক অদৃশ্য ঝঞ্ঝাবায়ুর মত প্রবেশ করে।

কাব্যতীর্থ বলেন—আর একবার পড় তো ভাই।

প্রবীর পড়ে—"হিন্দুস্থানমেঁ ভয়ংকর জ্বালামুখী ফুটেগী···।

সত্যিক্যারের ধূপখালের পাশে গ্রামটারও নাম ধূপখাল। খালের জল জোয়ারের সময় বেশী খরা, ভাটার সময় একটু মিঠা, কারণ সমুদ্রের সঙ্গে তার নিত্যদিনের মিতালি। কাঞ্চীপুর থেকে চার ক্রোশ দক্ষিণে ধূপখাল, ধূপখাল থেকে আর দশ ক্রোশ দক্ষিণে মাটীর রাজ্য শেষ হয়ে গেছে—সমুদ্র। লোনা জোয়ারের মত সমুদ্র বাতাসের ছোট ছোট ঝড় প্রতি রাত্রে ধূপখাল গ্রামের নিম বাব্‌লার ডালে ডালে দৌরাত্ম্য ক'রে যায়। সমুদ্র যে এত নিকটে সেটা দিনের বেলার মুখরতার মধ্যে ঠিক স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় না। কিন্তু রাত্রে অন্য রকম। দূর সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙ্গা উচ্ছ্বাস যেন মাঝে মাঝে তরঙ্গ মেঘারাশির মত শেষ রাত্রির ঘুমন্ত ধূপখালের স্বপ্ন স্পর্শ করে চ'লে যায়।

—আমি আগেই না তোকে বলেছিলাম পবুর মা, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাস্‌নি। এখন তো দেখ্‌লি, ছেলে তোর কেমন ভদ্দর লোক হয়েছে আর শত্তুর হয়েছে।

একটা ছেঁড়া জাল দিয়ে জীর্ণ শরীরটাকে জড়িয়ে জ্বরে ধুঁকছিলেন প্রবীরের বাবা জয়ন্ত পাটনী। প্রবীরের মা হাট থেকে ফিরে নুনের

খালি ঝুড়িটা মাত্র মাথা থেকে নামিয়ে একটু জিরিয়ে নেবার জন্য বসেছেন, অমনি কথাগুলি চেঁচিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন জয়ন্ত পাটনী।

একদিন নয়, দু'দিন নয়, আজ এক বছর হলো বুড়ো জয়ন্ত পাটনী জপের মত এই একই অভিযোগ আর ধিক্কার উচ্চারণ করছেন। জয়ন্ত পাটনীর বুক চরম পরাজয়ের আঘাতে দীর্ণ হয়ে গেছে। ছেলে তার মানুষ হয়নি।

অনেক ভদ্দর লোকের ছেলের বাপ-মা বড় আশার লোভে ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়েও সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকেন—ছেলে সাহেব না হয়ে যায়। অনেক ছেলে সত্যিই শেষ পর্যন্ত সাহেব হয়ে যায়, মেম বিয়ে করে, বাপ-মাকে পর ভাবে। জয়ন্ত পাটনীরও যে সে-ভয় হয়নি, তা নয়। কুটুমেরা তো আরও বেশী ক'রে ভয় দেখিয়েছিল—সর্বস্ব খুইয়ে ছেলেকে তো বিদ্যে শেখাচ্ছ, পরে ভদ্দর লোক হ'য়ে গিয়ে তোমাকে বাপ বলে ডাকতে লজ্জা না করলে হয়।

জয়ন্ত পাটনী তবু ছেলেকে বিদ্যে শিখিয়েছে—পাঠশালা থেকে মতিগঞ্জের স্কুল, মতিগঞ্জ থেকে কলকাতার কলেজ। নৌকা বেচে, ঘর বেচে, ঋণ ক'রে, ছেলের পড়ার খরচ যুগিয়েছে। কিন্তু সবই ব্যর্থ। প্রবীরের ভাই, ঐ শ্যামু, বয়স পনর বছর পার হ'য়ে গেছে, কিন্তু এখনো পাঠশালার মুখ দেখতে পারলো না। জয়ন্ত পাটনী কাটমূখ্যু শ্যামুকে দেখে বরং এখন খুশীই হন। এ ছেলে আর ভদ্দর লোক হয়ে পর হয়ে যাবে না।

বড় ছেলের পড়ার খরচ, আর এদিকে নিজেরা তিনটি প্রাণীর প্রাণ বাঁচাবার খরচ—বুড়ো বয়স পর্যন্ত একটি মাত্র নৌকা সম্বল ক'রে জয়ন্ত পাটনী দিনের বেলা ধূপখালে খেয়া খেটেছে, আর রাতের বেলা পরের নৌকায় দাঁড় টেনেছে। প্রবীরের মা'ও পরের খামারে ধান ভেনেছে। দিন প্রতি এক সের চালের বিনিময়ে ছোট শ্যামুও মাঠে মাঠে পরের গরু

চরিয়েছে। কিন্তু আর নয়, এবার জয়ন্ত পাটনীর সংসারের দম ফুরিয়ে গেছে ঠিকই। এত লেখাপড়া শিখেও প্রবীর আজ পর্যন্ত একটি পয়সা রোজগার করতে শিখলো না।

জয়ন্ত পাটনী ধুঁকতে ধুঁকতে বলতে থাকেন—আরে হতভাগা, ভদ্দর লোকই বা হতে পারলি কই? একটা প্যায়দার চাকরীও জোটাতে পারলি নি? ভদ্দর লোকেরা তো ঐ বিদ্যেতেই ম্যাজিস্টার হয়।

প্রবীরের মা পথশ্রমকাতর পা'দুটোকে মাটীতে টান ক'রে দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছিলেন। অলসভাবে নিজের হাতে রুক্ষ ও শীর্ণ পায়ের পাতা দুটো টিপ্‌তে টিপ্‌তে শান্তভাবে প্রত্যুত্তর দেন—আঃ, কেন অমন করে নিজের ছেলেকে গালমন্দ করছো? যেমন আছে, তেমনি হয়েই যদি ভালভাবে বেঁচে থাকে তো ভগবানের দয়া। আর কি চাও?

জয়ন্ত পাটনীর চীৎকার হঠাৎ কোমল হয়ে আসে।—কিছু চাই না পবুর মা, একবার এসে নিজের বাপ মা ভাইয়ের দুঃখু নিজের চোখে দেখে, একবার কেঁদে চলে যাক্, তাহ'লেই আমি…।

বুড়ো জয়ন্ত পাটনী কেঁদে ফেলেন। অপোগণ্ড শিশুর মত অসহায়ভাবে টেনে টেনে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। বহু খালের লোনা জলের আস্বাদে অভ্যস্ত পুরনো ছেঁড়া জালের ওপর জয়ন্ত পাটনীর শেষ বয়সের চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

প্রবীরের মা বলেন—থাম থাম। একদিন না একদিন তোমার ছেলে আসবেই।

জয়ন্ত পাটনী থামেন, যদিও আশ্বস্ত হন না। অনেকক্ষণ পরে বিড় বিড় করে আবার একটা দুঃসহ ক্ষোভের সঙ্গে বোঝাপড়া করেন—বড় জাতের সঙ্গে এত মাখামাখি ভাল নয়। ওরা সব করতে পারে।

ঠিক এই সন্দেহ প্রতিবেশীদের মধ্যে আরও অনেকে সমর্থন করেন। প্রবীর ভদ্দর জাতের খপ্পরে পড়েছে। ও'জাতকে বিশ্বেস নেই।

কেন বিশ্বেস নেই ?

জয়ন্ত পাটনীর ঘরের আঙিনাতেই ধূপখালের আর দশ-পাঁচজন জাতকুটুম এসে কতবার আলোচনা করেছেন—হায়রে, বাপমা খেতে পায় না, আর ছেলে যত বামুনকায়েতের দলে ভিড়ে স্বদেশী করছেন। তোকে ছুঁলে যারা স্নান করে, তাদের সঙ্গে আবার স্বদেশী কিরে ?

প্রবীর এসেছিল প্রায় দু'বছর আগে একবার। তখনও জয়ন্ত পাটনীর বুকে দম ছিল, আজকের মত পঙ্গু হয়ে পড়েননি। প্রবীর এসে এই ঘরের দাওয়ার ওপর জাল পেতে ঘুমিয়েছে। সকালবেলা উঠে নিজেই সখ করে মাছ ধরতে চলে গেছে। উঠোনের চারধারে এই যে এতগুলি শ্বেত করবী আর টগরের গাছ, এসবই প্রবীরের নিজের হাতের রচনা। একমাস ছিল প্রবীর, তারই মধ্যে সারাদিন খেটে খেটে বাগান করেছে—ওরই তৈরী দুটো কুমড়োর মাচান এখনো রয়েছে, ভেঙে চুরে। খেয়া খেটে ঘাট থেকে ফিরে জয়ন্ত পাটনী এই ঘরেই বসে তামাক খেয়েছেন, প্রবীর তাঁর পা টিপে দিয়ে গল্প করেছে কত। জয়ন্ত পাটনীর সুখ আর গর্ব যেন তাইতেই চরম হয়ে উঠেছিল। প্রবীরের কাছে এর চেয়ে বড় আর কিছু তাঁর পাওনা আছে ব'লে মনে হ'তো না।

কিন্তু, প্রবীর আর আসেনি। জয়ন্ত পাটনীর এত কঠিন দেহেও ঘুণ ধরেছে। একটা মাত্র নৌকা ছিল, তাও গবর্ণমেণ্ট নিয়ে গেছে জাপানীদের জব্দ করার জন্যে। শুধু শ্যামু বেশী করে গরু চরায় আর মা লোনা কাদা ছেঁকে নুন তৈরী ক'রে হাটে হাটে বিক্রী করেন। কিন্তু পোষায় না, হয় না, তিনটে প্রাণীর একবেলার ক্ষুধাও মিটতে চায় না। জয়ন্ত পাটনী এখন সত্যিই ছেলের কাছে আশা করেন দুটো টাকা পয়সার সাহায্য। আর, ছেলে হয়ে এখন যদি প্রবীর এটুকুও না করতে পারবে, তবে কবে করবে ?

প্রবীর আর আসেনি, চাকরিও পায়নি। কাঞ্চীপুরের লোক মাঝে

মাঝে এদিকের হাটে বেচা-কেনা করতে আসে। প্রবীরের মা একদিন শুনলেন তাঁর ছেলে স্বদেশী করছে, আর চাক্‌রির আশাও নেই।

তারপর থেকে এইভাবেই ধূপখালের জয়ন্ত পাটনীর সংসার দুঃসহ দীনতার জ্বালায় তিল তিল করে পুড়ছে। জয়ন্ত পাটনীও যেন সারাদিন ধরে চীৎকার ক'রে তাঁর পোড়া অদৃষ্টকে ধিক্কারে ধিক্কারে আরও জর্জরিত করেন।

অকস্মাৎ একটা সংবাদ যেন শান্তিজল ছিটিয়ে জয়ন্ত পাটনীর মনের জ্বালা ক্ষণিকের মত শান্ত করে।

শ্যামু মাঠ থেকে অসময়ে ফিরে এসে চীৎকার ক'রে ডাক দেয়—মা শুনেছ?

মা তার পথশ্রমকাতর পা দু'টিকে তেমনি অলসভাবে নিজের হাতে আস্তে আস্তে টিপছিলেন। শ্যামুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—কি? এখনই ফিরে এলি যে, চরাতে যাস্‌নি?

শ্যামু তার আনন্দের আবেগের মতই অস্থির ভাবে কথাগুলি বলতে থাকে—দাদা হেডমাস্টার হয়েছে, কাঞ্চীপুরের লোকের কাছে খবর পেলাম।

মা'র মুখটা তো এমনিতেই শান্ত, তার ওপর হাসিটা বড় স্নিগ্ধ হয়ে ফুটে ওঠে। বলেন—তা'তো হবেই, আমি আগেই জানতাম।

জয়ন্ত পাটনী তাঁর গায়েজড়ানো ছেঁড়া জাল টেনে সরিয়ে দেন, যেন তাঁর জর হঠাৎ থেমে গেছে। তিনিও বহুদিন আগেকার মত শান্ত স্বরে বলেন—শ্যামু, আমাকে ধ'রে একবার বাইরে ক'রে দে তো। দাওয়ার ওপর একটু বসি।

শ্যামুর হাত ধ'রে আস্তে আস্তে উঠে এসে দাওয়ার ওপর তৃপ্তভাবে বসেন জয়ন্ত পাটনী। তখুনি আবার বলেন—শ্যামু, আমার মৃদঙ্গটা দে।

মাকড়সার জালে ঢাকা মৃদঙ্গটা শিকেয় ঝুলছিল দু'বছর থেকে।

শ্যামু মৃদঙ্গটা নামিয়ে ভাল করে ঝাড়া-মোছা ক'রে নিয়ে জয়ন্ত পা...
কোলের ওপর রাখে।

মা বলেন—শ্যামু, আমাকে কাঙ্কীপুর নিয়ে যেতে পারবি?

শ্যামু—কেন পারবো না?

মা—তাহ'লে একদিন চল্। একবার ও'কে দেখে আসি। কতদিন দেখিনি।

শিশুভবনের ছেলেমেয়েরা আজ বড় খুশী। তারার মা আশ্চর্য হয়ে বলেছে—তুমি তো ঠিক কলকাতার মেয়েদের মত নও গুরুমা।

আজ সকাল থেকে আরম্ভ ক'রে সন্ধ্যেটা পর্যন্ত একটা একটানা কাজের ঘোরে সময় পার হয়ে গেছে সোমার। আজ প্রথম বই সেলেট নিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়া শিখিয়েছে। একটা ছড়া আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছে, একটা গান গেয়েছে, আর একটা গল্পও বলেছে। লব-কুশের গল্প, সীতামায়ের দুটী ছোট ছোট ছেলে, দুটি বনচারী ভাই; রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞের ঘোড়াকে লব-কুশ যখন বন্দী করে ধরেছে, তখন গল্পটাকে সেইখানে রেখে দিয়ে সোমা উঠে যায় রান্নাঘরের দিকে। তারার মা উনুন ধরায়, আর সোমা বঁটি নিয়ে বসে, আজকের রান্নার বরাদ্দ মত কতগুলি কুমড়ো আর ঢেঁড়স নিজেই কেটেকুটে আর ধুয়ে ডালায় সাজিয়ে রেখে চলে যায়।

পুকুরের ধারে তালগাছের ছায়ায় একটা নতুন উনুন করিয়েছে সোমা। ছেলেমেয়েদের পরিধেয় ছেঁড়া ও নোংরা একগাদা কাপড় মাটির হাঁড়িতে ক্ষারে সেদ্ধ হয়। মাধাই ও সুমন্ত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে, সোমা সামনে থেকে কাজে সাহায্য করে।

ছেলেমেয়েদের খাওয়ার সময়ও 'আজ সকলের সঙ্গে ছিল সোমা। তারার মা'র মত সোমাও আজ সকলকে নিজের হাতে ডালভাত পরিবেশন

করে খাওয়ায়। আজ হঠাৎ ছেলেগুলো খায়ও বেশী ক'রে, ভাতে টান পড়ে।

তারার মা'র হাতে আজ কুড়িটা টাকা দিয়েছে সোমা—কাপড় কিনে নিয়ে এস।

তারার মা—কিসের কাপড় ?

সোমা—ছেলেমেয়েদের একটা ক'রে গায়ে দেবার জামা করবো।

তারার মা আঁৎকে উঠে বলে—অ্যাঁ? তুমি, কি শেষে একটা কেলেঙ্কারি করবে গুরু-মা ?

সোমা চমকে উঠে—কেলেঙ্কারি ? কি যা তা বলছো ?

তারার মা আরও জোর ক'রে বলে—হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি ?

তারার মা কাপড় কিনতে চলে যায়।

আজকের দিনটা সমস্ত মনের আগ্রহ দিয়ে এইভাবে শিশুভবনের জীবনে ছোট ছোট নতুন ঘটনা ঘটিয়ে কাজের দীক্ষা গ্রহণ করেছে সোমা। এ কাজের সীমা কতদূর, সার্থকতা কতটুকু, স্থায়িত্ব কতখানি—এসব প্রশ্ন নিয়ে আর বিচার করতে ইচ্ছা করে না। হয় তো এটা তার জীবনে দু'দিনের খেলাঘর মাত্র, হোক্ না তাই, দু'দিনের জন্যেই সে খেলাঘরকে ভাল করে সাজিয়ে রাখলে দোষ কি ?

সন্ধ্যাবেলা এল সাঁওতাল বউ একটা গাই নিয়ে, দুধ দুইতে। রোজই সন্ধ্যে বেলা সাঁওতাল বউ এই শিশুভবনের আঙিনায় এসে দুধ দুইয়ে কেঁড়ে ভর্তি করে, আর সব দুধ এখানে বসেই গাঁয়ের আরও পাঁচজনের কাছে বিক্রি করে চলে যায়। শিশুভবনের জন্যে মাত্র আধসের।

সাঁওতাল বউকে দেখতে বড় ভাল লাগে সোমার। বয়স হয়েছে পঞ্চাশের ওপর, তবু ঝর্ণার মত সুরে হাসে, সন্ধ্যাতারার মত তাকায়। সাঁওতাল বউ আজ বাঙালী হয়ে গেছে, সিঁথিতে সিঁদুর পরে, নিজের নাম গঙ্গা আর গাইটার নাম সুরভি। কবে কোন্ অতীতে এক

ঝুলিমায়ের পিঠে পুঁটলি-বাঁধা হয়ে মাটি-কাটার দলের সঙ্গে কাঞ্চীপুরে এসে আজ একেবারে কাঞ্চীপুরের মেয়ে হয়ে গেছে সাঁওতাল বউ।

সুরভির অভ্যেসও অদ্ভুত। শিশুভবনের আঙিনায় ঢুকেই দুরন্ত আগ্রহে ছটফট ক'রে প্রথমে একটা ডাক দেয়। ছেলেমেয়েগুলিও যেন সুরভির প্রতীক্ষায় ছিল, ডাক শোনামাত্র ছুটে আসে। কেউ সিং ধরে, কেউ লেজ টানে—সারা আঙিনায় শিশুজনতার সঙ্গে ছুটোছুটি না করে সুরভি শান্ত হয় না এবং তার আগে তাকে দোহানো যায় না।

মাত্র আধসের দুধের খদ্দের শিশুভবন, তবু বড় খদ্দেরের বাড়ি না গিয়ে এখানে দুধ দুইতে আসে কেন সাঁওতাল বউ?

সোমা জিজ্ঞেস করে—তুমি এখানে এসে গরু নিয়ে দুধের বাজার বসাও কেন?

সাঁওতাল বউ বলে—আমি কি করবো বল? গরুর মরজি। অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে দুইতে গেলে দুধ টেনে রাখে। নইলে আমার কি সাধ যায়, আধসের দুধের জন্যে এতদূর গরু টেনে আনতে?

সাঁওতাল বউ তার কথা শেষ ক'রে খল্ খল্ স্বরে হাসে। কিন্তু সোমার বুকের ভেতরটা অদ্ভুত বেদনায় শিউরে ওঠে, জোরে নিশ্বাস টানে, সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। একটা অস্বস্তির ভারে হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সোমা। সাঁওতাল বউয়ের গল্প বিশ্বাস হয় না।

সাঁওতাল বউ সুরভিকে টেনে নিয়ে এসে দুধ দুইবার আয়োজন করে। সোমা বলে—আজ থেকে রোজ আরও আধসের করে দুধ দেবে।

সাঁওতাল বউ হাসে—কে খাবে গুরু-মা?

সোমা বিরক্ত হ'য়ে বলে—খাবার লোক আছে।

সাঁওতাল বউ একবার চকিতে সোমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আবার হাসে—তোমার তো খাবার লোক কেউ নেই ব'লে মনে হচ্ছে গুরু-মা।

সোমার রাগ হয়—এখানে ছোট ছেলে আছে তুমি জান না?

সাঁওতাল বউ হাসে—কে? ভোলা?

সোমা বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তারার মা ফিরে আসে অনেকক্ষণ পরে, সুরভিকে নিয়ে সাঁওতাল বউও চলে গেছে অনেকক্ষণ। দু' থান খদ্দরের কাপড় আর দু'খানা চিঠি নিয়ে আসে তারার মা। সোমা নিজের ঘরে গিয়ে আলো জ্বালে।

"সুমি, লক্ষ্মী মেয়ে আমার, ফিরে এস ···।"

মা লিখেছেন চিঠি। চিঠিটা বার বার দু'বার আদ্যোপান্ত পড়ে সোমা। বার বার অনেকবার চেষ্টা করেও নিজেকে আর সামলাতে পারে না। চিঠিটা চোখের ওপর চেপে ধ'রে কেঁদে ফেলে। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট মেয়ের মতই আজ সোমার ডাকতে ইচ্ছে করে—মা, তুমি এসে নিয়ে যাও।

যে মেয়ে একা চলে আসতে পারে, সে কি একা ফিরে যেতে পারে না? তাকে নিয়ে যেতে হবে কেন? কে জানে, সোমা হয়তো এ সত্যকে আজ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নয়, সে আর এখান থেকে একা একা নিজের সাহায্যে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে হবে, কেড়ে নিয়ে যেতে হবে। মা যে জানেন না, এই নির্বাসন তাঁর মেয়ের কাছে ধীরে ধীরে মধুর হয়ে উঠছে। ঝোঁকের মাথায় ষাট টাকা মাইনের চাকরি করতে এসে চক্রবেড়ের গলির একটা একঘরে বাসার অভিমানিনী মেয়ে এখানে ভুল ক'রে এরই মধ্যে এমন এক অনুভবের দুর্গ রচনা করে ফেলেছে, যার অন্তরতম প্রকোষ্ঠে সে আজ নিজেই বন্দিনী। ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ জেনেই কি সোমার চেতনা ফুঁপিয়ে উঠেছে—মা তুমি এসে নিয়ে যাও?

তারার মা চায়ের জল দিয়ে যায়। সোমা জোর করে নিজেকে আবার কাজের মধ্যে আনমনা করে আনে। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে, চা

তৈরী করে, ঘরের ভেতর পাইচারী ক'রে ক'রে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

দু'পাতা ভরে চিঠি লিখে মাকে প্রতি কথায় সান্ত্বনা দেয়—আমি খুব ভাল আছি, কোন অসুবিধা নেই, কোন চিন্তা করো না।

দ্বিতীয় চিঠিতে মতিগঞ্জের পোষ্ট-অফিসের ছাপ। চিঠিটা খুলতে সোমার হাত কাঁপে।

নয়নবাবুই লিখেছেন, সোমার চিঠির উত্তর।

"কাঞ্চীপুরের শিশুভবনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ও দায়িত্ব আর কতদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে, তা জানি না। কিন্তু যতদিন আছে, ততদিন আপনি অবশ্যই ওখানে থাকবেন এবং ততদিন আপনার প্রত্যেকটি অসুবিধার জন্য আমিই দায়ী থাক্‌বো।...

"তবে যেকোন দিন আপনাকে হয়তো কাঞ্চীপুর ছেড়ে আস্‌তে হবে, কারণ আমি অন্য কোন গ্রামে আমার আদর্শ অনুযায়ী বড় ক'রে একটি শিশু শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করবো। বলা বাহুল্য, আপনাকেই এই কেন্দ্রের ভার নিতে হবে।......

"মাপ করবেন, প্রবীর বাবুকে কোন নির্দেশ দিতে আমি অসমর্থ। আপনার যেকোন অসুবিধার কথা আপনি আমাকে জানালেই আমি আমার যথাসাধ্য সেটা দূর করতে চেষ্টা করবো।......

"আপনার প্রাপ্য বেতন প্রতি মাসে এখান থেকেই আপনার বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আশা করি আপনার কোন আপত্তি নেই......"

পড়া শেষ করেই সোমা চিঠিটা ভাঁজ করে তাকের ওপর রেখে দেয়,

হাত কাঁপবার মত কিছুই এর মধ্যে নেই। যদিও এক দুর্বোধ্য রহস্যের আভাস এর প্রতি ছত্রে পাওয়া যাচ্ছে, কোথায় যেন ঘটনায় ঘটনায় একটা সংঘাত বেধেছে।

এইটুকু শুধু বুঝতে পারে সোমা, তার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে গড়া হীনবুদ্ধির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। সাময়িক পাগলামির বশে নয়নবাবুর সাহায্যে যাকে আঘাত দেবার অভিসন্ধি সে করেছিল, তার গায়ে আঘাত লাগলো না। সে জান্‌লোও না কিছুই। একটা অভিশাপের শঙ্কা থেকে সোমার মন মুক্তিলাভ করে। চিঠিটা পড়ে এতদিন পরে মনের খুশীতে একটা সত্যিকারের মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ পেয়েছে সোমা। মনে হয়, তার জীবনের আশে পাশে যেমন এক ভুল করিয়ে দেবার নিয়তি ঘুরছে, তেমনি ভুল থেকে বাঁচিয়ে দেবারও নিয়ত রয়েছে। সোমা তার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একবার বাইরের দিকে তাকায়।

কি কথা মনে করতে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে নয়নের চিঠির কথা আর একবার মনে পড়ে সোমার। কাঞ্চীপুর থেকে চলে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন নয়নবাবু। নয়নবাবু পয়সা খরচ করতে যেমন বদান্য, তাঁর আদর্শটাও তেমনি বদান্য। একটা বড় করে শিশু শিক্ষার কেন্দ্র খুলবেন, আর বলা বাহুল্য সোমা তখুনি সেই কেন্দ্রের ভার বহন করতে ছুটবে! নয়নবাবুর বিশ্বাসটাও বড় বাহুল্য। সোমার ঠোঁট দুটো একটা বিদ্রূপের হাসিতে কুঁচকে ওঠে।

অনেকক্ষণ দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল সোমা, মন্দির দ্বারে পাথরের পুরোনায়িকার আভঙ্গ মূর্তির মত। কিন্তু সত্যিই সে তো পাথরের মূর্তি নয়। এ পথে কোন পথিকের পদধ্বনি যদি এখুনি শোনা যায়, তবে সে তো আর মন্দির মর্মরিকার মত স্তব্ধ হয়ে থাকবে না। অন্ততঃ একবার তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখবে, অভ্যর্থনা করা যায় কি না?

সোমা লক্ষ্য করবার আগেই একেবারে ঘরের কাছাকাছি চলে এসেছিল প্রবীর মাস্টার। হঠাৎ চমকে উঠলেও সোমা শান্তভাবে বলে—আসুন।

প্রবীর মাস্টার ঘরের ভেতর ঢুকলে সোমা খাট দেখিয়ে দিয়ে বলে—বসুন।

পটের ছবির মত গোটানো একটা মানচিত্র খুলে প্রবীর মাস্টার বলে—এই নিন আপনার ভারতবর্ষের মানচিত্র, আর এই গান্ধীজীর ছবি। আপাততঃ এ ছাড়া……।

সোমা বলে—রাখুন।

চায়ের সরঞ্জাম তুলে নিয়ে সোমা রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। বলে যায়—একটু অপেক্ষা করুন। আসছি।

প্রবীরের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে, সোমা দু'পা পিছিয়ে সরে গিয়ে আবার আগের মতই দরজার কপাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়, প্রবীরের চা-খাওয়া দেখতে থাকে। এখন সোমাকেই বরং দেখায় ব্যাধিনীর মত যার নিপুণ হাতে পাতা ফাঁদের মাঝখানে এক লুব্ধ বনবিহঙ্গ ভুল করে এসে বসেছে। এখনই যে নীল আকাশের অবাধ গর্ব দিয়ে গড়া ওর পাখা দুটি এই জালে জড়িয়ে যাবে, তা সে জানে না। ব্যাধিনী যদি নিতান্ত করুণা ক'রে নিজেই ছেড়ে না দেয়, তবে আর ওর মুক্তির আশা নেই।

চা-খাওয়া শেষ হতেই প্রবীর খালি কাপটা হাতে নিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে, তারপর বাইরে যাবার জন্যে দরজার দিকেই অগ্রসর হয়।

থামুন! দরজার কাছে পথ-অবরোধ-করা এক প্রহরীর কঠিন মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে সোমা প্রবীরকে সাবধান করে।

প্রবীর অপ্রস্তুতভাবে থমকে দাঁড়ায়। সোমা জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাচ্ছেন?

প্রবীর—কাপটা ধুয়ে নিয়ে আসছি।

সোমা হাত বাড়িয়ে বলে—আমার হাতে দিন।

আর কোন দ্বিধা না ক'রে প্রবীর সোমার হাতে কাপটা ছেড়ে দিয়ে খাটের ওপর বসে।

মেঝের ওপর কাপটা রেখে দিয়ে আবার সোমা যেন প্রস্তুত হয়।

সোমা বলে—ভারতের মানচিত্র এনেছেন, গান্ধীজীর ছবিও এনেছেন। শিশুভবনকে ভোলাবার মত রঙীন খেলনাগুলো ঠিকই হয়েছে।...কিন্তু আর সব কই?

প্রবীর—আর কি?

সোমা—শিশুভবনকে বাঁচাবার জন্যে যা চেয়েছিলাম, এক ডজন ফ্রক, দু'ডজন সার্ট, দৈনিক অন্ততঃ সের পাঁচেক দুধ, একজন কবরেজ।

প্রবীরের মাথাটা ক্ষণিকের মত হেঁট হয়ে থাকে, যেন তার দুঃসহ অক্ষমতার মৌন স্বীকৃতি। শুধু সোমা আজ ব্যাধিনীর মত নির্মম। গভীর কৌতুকের পুলকে প্রবীরের নিরুত্তর মূর্ত্তিটার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে।—শিশুভবনের কাজ হলো এতগুলি শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার কাজ। আমি সেই কাজের জন্য যা যা চেয়েছি সেসব কোথায়?

প্রবীর আলোটার দিকে তাকিয়ে তবু চুপ করে বসে থাকে। যেন তার কপর্দ্দকহীন জীবনের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে চোখ দুটো উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সোমা বলে—এ মাসটি শেষ হলেই যে আমাকে ষাটটী টাকা দিতে হবে, তার সঙ্গতি আছে তো?

প্রবীর এবার উত্তর দেয়।—না।

সোমা বলে—তা'হলে নয়নবাবুর কাছে গিয়ে টাকার জন্যে ধর্ণা দিন, আমি তো আর আমার মাইনে ছেড়ে দেব না।

প্রবীরের চোখের দৃষ্টি হঠাৎ প্রখর হয়ে ওঠে—আপনি কি মনে করেন যে, টাকার জন্যে নয়নবাবুর কাছে ধর্ণা দেওয়া আমার অভ্যেস?

সোমা—ধর্ণা না দিন, নির্ভর করেন তো।

প্রবীর—না, আপনি ভুল বুঝেছেন, টাকার জন্যে কারও ওপর নির্ভর করতে শিখিনি।

বন্দী বিহঙ্গ যেন মরিয়া হয়ে জালের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য পাখা ঝাপটায়, সোমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে প্রবীর হঠাৎ বলে—আর, টাকা দিয়ে কাউকে কিনতেও শিখিনি।

প্রবীর চলে যাবার জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হয়। সোমা হেসে ফেলে—বসুন।

বিব্রতভাবে এবং হয়তো নিজের উষ্মায় কিছুটা লজ্জিত হয়ে প্রবীর বলে—আমার কাজ আছে।

সোমা—জানি। নয়নবাবুর সঙ্গে কি হয়েছে আপনাদের?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় প্রবীর চম্‌কে ওঠে—আপনি এ খবর কোথা থেকে পেলেন?

সোমা—আপনার কাছ থেকে। এই তো এখুনি বল্‌লেন।

প্রবীর—হ্যাঁ, নয়নবাবুর সঙ্গে আমাদের মতভেদ হয়েছে।

সোমা—সে জন্যে কি আপনি খুবই দুঃখিত?

প্রবীর—সে জন্যে দুঃখিত নই।

সোমা—তবে? নয়নবাবু আর টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন না, সেই জন্যে?

প্রবীর—না। বরং নয়নবাবুর সব টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি, ধর্মগোলার চাল বিক্রি ক'রে।

সোমা—তবে কিসের জন্যে আপনি দুঃখিত?

প্রবীর—আপনার জন্যে।

সোমা—তার মানে?

প্রবীর—আপনাকে চলে যেতে হবে, আমরা তো আর আপনাকে মাইনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না।

সোমা—একটু স্পষ্ট করে বলুন প্রবীর বাবু, কিসের জন্য আপনি দুঃখিত। আমাকে মাইনে দিতে পারবেন না, সেই জন্যে? না আমি চলে যাব সেই জন্যে?

প্রবীর স্পষ্ট ক'রে উত্তর দেবার জন্যই বোধ হয় কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবে, তারপর বলে—যেতে দিন ওসব কথা।

সোমা একটা ধূর্ত্ত হাসি চাপা দেবার চেষ্টা ক'রে বলে—একেবারে সবই যে অস্পষ্ট করে দিলেন!

প্রবীর উঠে দাঁড়ায়—আজ্ঞে না, আমি এইটুকুই শুধু বলতে চাই ছিলাম, আপনি মাত্র কদিনের জন্য এখানে এসে মিছিমিছি কতগুলি কষ্ট পেয়ে গেলেন।

সোমা—উঠছেন কেন?

প্রবীর—আপনি অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছেন।

সোমা—তা তো আছিই, আর দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছি না, তার ওপর আবার জ্বর এসেছে।

প্রবীর হঠাৎ ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে সোমার কপালে হাত রাখে। প্রবীরের হিতাহিতজ্ঞানহীন দুঃসাহসী হাতটাকে সোমা ধীরে ধীরে নামিয়ে দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সোমার মুখে একটা মন্তব্যও কঠোরভাবে বেজে ওঠে—ছুঁয়ে দিলেন যে?

প্রবীর সন্ত্রস্তভাবে দুপা পিছিয়ে যায়। এত ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের বাতাসটা যেন তার বুকের ভেতর গিয়ে পুড়তে আরম্ভ করে। হঠাৎ হাতজোড় করে প্রবীর—ভুল হয়েছে। মাপ করবেন।

এত সাবধানী, এত অহংকারী প্রবীর মাস্টার, এ কী করুণ চেহারা? চোখের কোন দুটো আবার হঠাৎ একটু যেন সজল হয়ে চিক্‌চিক্ করে। প্রবীর বলে—আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি নরসিংহের ভক্ত। পথে যেতে আসতে ঐ নির্জ্জন নরসিংহ মন্দিরের দরজা কতবার খোলা পেয়েছি,

কিন্তু কোনদিনও ভেতরে ঢুকে বিগ্রহের সামনে গিয়ে দাঁড়াইনি। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের মন্দিরের ঘরের বাতাস যেমন কখনো ছুঁই না, তেমনি আপনাকে ছুঁয়ে দেবার ইচ্ছেও আমার ছিল না, হঠাৎ ভুল হয়ে গেল।

প্রবীরের ভুল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কিছুক্ষণ নিষ্পলকভাবে কঠিন হয়ে তাকিয়ে থাকার পর সোমাও হঠাৎ ভয়ানক রকমের একটা ভুল করে ফেল্‌লো। সেই পথ-অবরোধ-করা ছলনাময়ী নায়িকার কঠিন মূর্তি যেন আকস্মিক বেদনার আঘাতে রেণু রেণু হয়ে ভেঙে পড়তে চাইছে। তার সব কৌতুক বিদ্রূপ ও ষড়যন্ত্র সার্থক হয়েছে। যা জানবার ছিল তার অনেক বেশী জানা হয়ে গেছে। সোমা এগিয়ে এসে প্রবীরের যোড় করা হাত দুটো ধরে বলে—কার কাছে মাপ চাইছেন প্রবীর বাবু?

আরও ভুল হলো। প্রবীরের হাতের ওপর ধীরে ধীরে নিজের কপালটা নামিয়ে দেয় সোমা, যেন তার সমস্ত সত্তা দিয়ে নম্র আগ্রহে এক দুর্লভ স্পর্শসুখ পান করতে থাকে।

প্রবীর আবার অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে—আপনার কপালটা যে পুড়ে যাচ্ছে, কখন্ জ্বর এল?

সোমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রবীর বিছানাটা পেতে ফেলে বলে—আপনি শুয়ে পড়ুন।

সোমার চোখ দু'টো লাল হয়েছিল, প্রবীর ল্যাম্পের আলোটা একটা বই দিয়ে আড়াল করে দেয়। হাতপাখাটা তুলে নিয়ে বলে—তবু আপনি বসে আছেন? শুয়ে পড়ুন, লজ্জা করবার কিছু নেই।

সোমা হেসে ফেলে—আর লজ্জা! তারার মা দু'বার দেখে গেছে।

প্রবীরের হাতপাখার চাঞ্চল্য হঠাৎ একবার থেমে যায়। অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন ভাবে। তারপর আবার সোমার মাথায় বাতাস দিতে দিতে বলে—আপনি মস্ত ভুল করলেন।

সোমা—ভুল ক'রে কিছুই করি নি। সবই ইচ্ছে ক'রে, ষড়যন্ত্র ক'রে করেছি, আপনার চোখ নেই তাই বুঝতে পারেন নি।

প্রবীর—কিন্তু কিসের জন্যে আপনার এত ষড়যন্ত্র ?

সোমা—যাতে কাঞ্চীপুর থেকে যেতে না হয়, তারই জন্য।

প্রবীর—সত্যিই আপনি যেতে চান না ?

এতক্ষণের অবিরাম ঝিঁঝিঁর ডাক হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, বাইরের অন্ধকারটাও যেন এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্যে কান পাতে। প্রবীর সোমার চোখের দিকে ক'টি মুহূর্ত্ত নিষ্পলক ভাবে তাকিয়ে থাকে।

সোমা—আমি যাব না প্রবীরবাবু।

•

•

ভারতবর্ষের চারদিক থেকে যেসব খবরের অদৃশ্য মৌমাছি মতিগঞ্জের মত সহরে এসে গুন্‌গুন্ করে, তা থেকে ভৈরববাবু অন্ততঃ এইটুকু অনুমান করে নিতে পারলেন যে, একটা কিছু ঘটতে চলেছে। নেতারা বলে, লোকে বলে, খবরের কাগজ বলে—একটা আন্দোলন আরম্ভ হবে শীগ্‌গির। কিন্তু ভৈরববাবু আরও বিজ্ঞসূত্রে খবর পান যে, এত উৎসাহিত হবার কোন কারণ নেই, এটা গান্ধী বুড়োর একটা ফাঁকা হুম্‌কি, আসলে কোন আন্দোলনই হবে না।

কিন্তু পলিটিক্স বোঝেন ভৈরববাবু। তিনি জানেন এ সব ব্যাপারে আসর খালি রাখতে নেই, কোন্ পার্টি এসে কখন্ টপকে বসে পড়বে কোন ঠিক নেই এবং তার ফলে আগামী মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে ভোটাভুটির দ্বন্দ্বে তাল ঠোকা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার হবে, তা তিনিই জানেন।

গান্ধী বুড়ো কি করে বা না করে তার জন্যে কোন পরোয়া আর প্রতীক্ষা না করেই মতিগঞ্জ সহরের দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়ে গেল—

ভৈরববাবুর দল গণবিপ্লবের অভিযান আরম্ভ করছেন, আগামীকাল সন্ধ্যে থেকেই। দেশবাসী যেন দলে দলে এ অভিযানে যোগদান করেন।

পরের দিন সত্যিই গণবিপ্লবের জন্য একটি অভিযাত্রী বাহিনী ভৈরববাবুর বাড়ীর আঙিনায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। ভৈরববাবুদের সেই ব্যাণ্ড পার্টি, আরও কয়েকজন ভলান্টিয়ার ও কর্ম্মী, তাদের অধিনায়ক ভৈরববাবুর বড়ছেলে বেচু। ভৈরববাবুর বাড়ীর ফটকের বাইরে একটা কৌতুহলী জনতা মতিগঞ্জের প্রথম গণবিপ্লবী বাহিনীকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে উঠছিল।

রক্ততিলক অনুষ্ঠানের পর অভিযাত্রীরা বের হবেন। একটা ছাত্রী সমিতির মেয়েরা এসে ব্যস্তভাবে আনুষ্ঠানিক উপচারের আয়োজন করছিল। ফুল, দীপ, ধূপ আর একটা বাটিতে রক্তচন্দন। বেচুর বোন নিরুপমা একটা পিন টিংচার আইডিনে ডুবিয়ে এক এক ক'রে ছাত্রী সমিতির সভ্যাদের আঙুলে ফুটিয়ে ফোঁটাফোঁটা রক্ত নিয়ে রক্ত চন্দনকে আরও রক্তাক্ত করছিল।

ভৈরববাবুর আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার পর, একটি মেয়ে বেচুর কপালে মাত্র রক্ত তিলকটা এঁকেছে, একজন পুলিশ অফিসার দু'জন কনস্টেবল নিয়ে উপস্থিত হলেন। কতগুলি সওয়াল ক'রে রিপোর্ট লিখে বেচুকে থানায় ডেকে নিয়ে চলে গেলেন। অভিযান স্থগিত রইল।

থানায় নিয়ে গিয়ে বেচুকে ধমকে সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হলো। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভৈরববাবু থানায় দৌড়াদৌড়ি করলেন, একশো চুয়াল্লিশ জারি করবার জন্যে থানা অফিসারকে অনেক মিনতি করলেন, নইলে দশের কাছে তাঁর মান আর থাকে না। থানা অফিসার ভৈরববাবুর অনুরোধ রাখতে পারলেন না।

বাড়ি ফিরে এসে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভৈরববাবু চিন্তা করলেন।

পুলিশ অফিসারদের মনোভাব দেখে কিরকম যেন সন্দেহ হয়, দিনকালের লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না।

নয়নও চুপ করে বসে ছিল না। একমাসের জন্য ভাল মাইনে দিয়ে মতিগঞ্জ সহর থেকেই একদল কর্মী যোগাড় করেছে। গ্রামাঞ্চল সফর করবার একটা পরিকল্পনাও করেছে। বিলি করবার জন্যে একটা পুস্তিকা ছাপিয়েছে বিশ হাজার কপি।

শোনা যাচ্ছে আন্দোলন হবে। শোনা যাচ্ছে, ভৈরববাবু গ্রামের দিকে প্রভাব বিস্তার করার উদ্যোগ করছেন। আর ঠিক এই সময়েই, একটা তুচ্ছ মতভেদের কারণে কাব্যতীর্থ ও প্রবীর মাস্টার সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তাকে একেবারে এক্‌লা করে দিয়েছে। এখন শুধু সে আর তার গ্রাম সেবাশ্রমগুলের কাঠের সাইনবোর্ডটা—ভৈরববাবুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হ'লে এর চেয়ে আর একটু বেশী সম্বল প্রয়োজন। এবং সময় থাকতেই সেটুকু তৈরী করে রাখা উচিত।

গান্ধীজী এখান থেকে অনেক দূরে, তিনি কি করবেন বা না করবেন কিছু ঠিক নেই। কালবিলম্ব না করে পুস্তিকার প্রতি ছত্রে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছে নয়ন চৌধুরী এবং তার জন্যে একটা কাজের প্রোগ্রামও দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করেছে। আগামী সোমবার প্রত্যেক গ্রামবাসীকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত নির্জলা উপবাস ক'রে সংগ্রামের উদ্বোধন করতে হবে। পুস্তিকার মুখবন্ধে শুদ্ধ অহিংসা, অনুচ্ছেদে তিতিক্ষা এবং উপসংহারে আত্মত্যাগ। ভৈরববাবুদের পতাকার চেয়েও বড় আকারের দেখতে, গান্ধীজীর একখানা ছবি আঁকিয়েছে নয়ন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তার আসন্ন গ্রামসফরের পরিকল্পনার কথাই ভাবছিল।

একজন পুলিশ অফিসার নয়নকে থানায় ডেকে নিয়ে গেলেন এবং পিসিমা খুব বেশী উতলা হবার আগেই বাড়ি ফিরে এল। আজকের ডাকে এসেছে, একটা চিঠি সাম্‌নে পড়েছিল। চিঠিটা খুলে পড়তেই নয়ন জানতে

পারম্ব ; কলকাতা থেকে হিতেনবাবুর স্ত্রী লিখেছেন—উনি ক'দিন হলো গ্রেপ্তার হয়েছেন।

আশ্চর্য্য, হিতেনবাবুর মত নিরীহ মানুষও গ্রেপ্তার হয়েছেন! নয়ন বুঝতে পারে লক্ষণগুলি ভাল নয়। ব্রিটিশ রাজশক্তি ভয় পেয়ে বড় বেশী নার্ভাস হয়েছে।

কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে এঘর ওঘর পাইচারী করে নয়ন, তার লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসে, যেখানে ব'সে পিসিমাকে জীবনে প্রথম শক্ত কথা বলেছিল এবং পিসিমা যেখান থেকে আঁচল দিয়ে চোখের জল লুকিয়ে চলে এসেছিলেন। আজ সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যেই যেন পিসিমাকে ডেকে পাঠায় নয়ন একটি পরামর্শের জন্য।

শুনতে পেয়ে পিসিমা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন, বিদ্রোহী ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর কাছে আজ পরামর্শ চাইছে, এটাও যে তাঁর প্রথম সৌভাগ্য।

পিসিমা ব্যাকুলভাবে বলেন—কি বাবা?

নয়ন—আমি কিছুদিনের জন্য দেরাদুন যাব পিসিমা।

পিসিমা একটু উদ্বিগ্ন হন—কেন শরীর ভাল লাগছে না?

নয়ন—শরীর মন দুই-ই ভাল নয়।

পিসিমা—তা হ'লে একবার ঘুরেই আয়।

নয়ন কিছুক্ষণ চুপ্ ক'রে থেকে যেন কথাগুলিকে মনের ভেতর গুছিয়ে নেয়। ঠিক সেই আগের দিনটির মতই একটা খোলা বইয়ের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে নয়ন বলে—হিতেনবাবু যে একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন, তারই জন্যে আপনার কাছে পরামর্শ চাইছিলাম।… সেই মহিলাকে আমি চাকরি দিয়ে কাঞ্চীপুরে পাঠিয়েছি, অথচ কাঞ্চীপুরের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক চুকে গেছে।

পিসিমা বোধ হয় তাঁর উৎফুল্লতা চাপা রাখতে পারছিলেন না। চেঁচিয়ে বলতে থাকেন—ও আমার কপাল! এর জন্যে আবার পরামর্শ?

এর জন্যে আবার চিন্তা? তুই সোমাকে এখুনি চিঠি লিখে দে, পত্রপাঠ চলে আসতে। ভদ্রলোকের মেয়ে, লেখাপড়া শিখেছে, আর জায়গা নেই গেছে কাঞ্চীপুরে শিশুভবন করতে। যত সব অনাছিস্টি কাণ্ড!

নয়ন বলে—আমি চিঠি দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আপনি একটু উদ্যোগ ক'রে তাকে আনিয়ে নেবেন।

পিসিমা আশ্বাস দেন—তুই নিশ্চিন্ত থাক্।

নয়ন বলে—আর একটা কথা ...।

পিসিমার কাছে প্রথম নির্লজ্জ হওয়ার মত দুঃসাহস যেন মনে মনে খুঁজছিল নয়ন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—মহিলার জন্য যতদিন না আমি একটা কাজ ঠিক করতে পারি, ততদিন পর্যন্ত তাকে এখানেই যদি রাখতে পারেন···।

পিসিমা বলেন—এখানে থাকবে না তো কোথায় থাক্‌বে? আমার দায়িত্ব নেই?

নয়ন—আর, ততদিন পর্যন্ত তার মাইনেটা যেন মাসে মাসে নিয়ম মত তার মায়ের কাছে পাঠানো হয়।

পিসিমা বলেন—তোকে কিছু ভাবতে হবে না।

পিসিমা নয়নকে একেবারে ভাবনাহীন করে দিয়ে তাঁর হাসিমুখের আনন্দ আঁচল দিয়ে লুকিয়ে ফেলার জন্যেই আবার ভেতর ঘরে চলে যান।

রাত্রি অনেক হয়ে আসে। পর পর দুটো চিঠি লেখে নয়ন। কাঞ্চী-পুরের কাব্যতীর্থকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেয়—আমি নিতান্ত বাধ্য হয়েই আপনাদের বৃত্তি দেওয়া বন্ধ করলাম।

সোমার উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিটা সংক্ষেপ করতে গিয়েও অতিরিক্ত বড় হয়ে ওঠে। দেশের কাজ, রাজনীতি, নতুন পরিকল্পনা ইত্যাদি নানা প্রখর কাজের কথার বর্ণনার মধ্যে মাঝে মাঝে প্রার্থনাকুল আবেদনের মত এমন কথাও থাকে—'চলে আসবেন সোমা দেবী, কোন অধিকারের

জোরে এ দাবী করছি না। আপনি কষ্টে আছেন, একথা মনে পড়লে আমি দেরাদুনে গিয়েও শান্তি পাব না…।'

ছোট ছোট ঘটনা, কিন্তু বড় দ্রুত। সারা হিন্দুস্থানে জ্বালামুখী ফুটবার আগেই মতিগঞ্জের দুই নেতা যেন জ্বালার আঁচ টের পেয়ে গেছে। পরের দিন মতিগঞ্জ ষ্টেশনেই দেরাদুন-যাত্রী নয়ন গ্রেপ্তার হয়। আরও আশ্চর্য, ঘণ্টা দুই পরে মতিগঞ্জ ষ্টেশনের আর এক প্ল্যাটফর্মে দার্জিলিং-যাত্রী ভৈরববাবুও গ্রেপ্তার হলেন।

জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে ভারত রক্ষা আইনে শৃঙ্খলিত দু'টি বিপজ্জনক সংগ্রামী জেলে চলে গেলেন। একজন ত্যাগী আর একজন বিপ্লবী।

·

দেখতে দেখতে সারা হিন্দুস্থানে জ্বালামুখী ফুটলো। বেয়াল্লিশের আগষ্ট-মাসের সূর্য প্রথম সাতটি দিন শান্তভাবেই শুভ্রাংশু শোভায় ভারতবর্ষের আকাশে দিনরাত্রির পথ এঁকে দিয়ে যায়, কিন্তু তারপরেই যেন কেমনতর হয়ে গেল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যা কখনো হয় নি। এক রক্তসংকাশ বহ্নিময় মহাদ্যুতি!

সহস্র দুঃখের অস্থি দিয়ে গড়া ভারত-ভূমির বক্ষপঞ্জরে মুক্তি-উল্লাসের কাঁপন লেগেছে। বোম্বাই, গুজরাট, অযোধ্যা, অন্ধ্র, মহাকোশল, বিহার —সেই মহাস্পন্দনের তরঙ্গিত অনল এসে লাগলো কাঞ্চীপুরে।

বাণীপীঠের প্রাঙ্গণে ত্রিবর্ণ পতাকার নীচে প্রার্থনা করছিলেন কাব্যতীর্থ। দশহাজার গ্রাম্য নরনারীর জনতা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে সমস্ত হৃদয়ের আগ্রহ দিয়ে সেই প্রার্থনা শুনছিল।

কাব্যতীর্থের সেই অতি প্রশান্ত সদাস্মিত মুখটা অদ্ভুত এক তেজোময় বর্ণের ছটায় যেন রঙীন হয়ে উঠেছে। দাও পুণ্য, দাও প্রেম, দাও শক্তি —ভারতভূমির হৃদয়োদ্ভূতা এই জ্বালামুখীকে আত্মাহুতি দিয়ে বরণ করবার জন্যে কাব্যতীর্থ যেন এক মহাপ্রাণের আবাহন করছিলেন:

—হে জ্বালামুখী, তোমার শুদ্ধ পাবকের লক্ষ শিখা দিয়ে পরাধীন ভারতের জীবন হতে এই সুদীর্ঘ কালরাত্রির পুঞ্জীভূত তমিস্রা দগ্ধ কর, চূর্ণী-ভূত কর। ভারতের সমীর হতে সকল গ্লানির জঞ্জাল ভস্মীভূত ক'রে দাও। ভারতের সলিলে নতুন স্বাদুতা আন, ভারতের মাটিতে নতুন সৌরভ আন।

হে আমার দেশের ইতিহাস, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা। আমার চেতনায় নেপথ্যে যারা নিঃশব্দ হয়ে আছ, হে লক্ষ সাধকের স্মৃতিময় সত্তা; সাড়া দাও সাড়া দাও। ভারতের জীবনে এই মহা অরুণোদয়ের জন্য যারা যুগে যুগে তিলে তিলে প্রাণ দিয়েছ, সেই নামহীন পরিচয়হীন হে অখ্যাত প্রণম্যদল, আজ নতুন করে আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। হে দুর্দ্ধর্ষ বরেণ্যদল, আজ নতুন করে আমাদের বরণ গ্রহণ কর। এস এস, এস আমার ভারত ইতিহাসের ধ্যানলোকে সমাহিত লক্ষ পুণ্যবান কীর্তিমান ও প্রেমিক, এই পুণ্য লগ্নে আমাদের আত্মায় আবার জাগ্রত হও। ভারতের নতুন সূর্যে তোমরা আবার ভাস্বর হও। ভারতের জননী-জায়া-ভগিনীকে তোমার সুললিত কারুণ্যে মধুরতর কর, ভারতের ভ্রাতা-পিতা-পুত্রকে জ্ঞানে ও চরিত্রে গরীয়ান্ কর। হে ভারত ইতিহাসের মহতো মহীয়ান্, আজ এই সংগ্রামের প্রথম মুহূর্তে ক্ষুদ্র কাঞ্চীপুরের গ্রাম্য প্রাণের প্রার্থনারূপে তোমাকে আহ্বান করি।

—হে আমার সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ, সরস্বতী তীর হতে তোমার হোমাগ্নি ধূমের পুঞ্জ পুঞ্জ পূত সৌরভ আজ আমাদের প্রতি গৃহে প্রেরণ কর। সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য করবাবহৈ, বহু যুগের স্তব্ধতার দুঃখ ভেদ করে তোমার মন্ত্রস্বর ভারতের আঙিনায় নতুন করে মুখরিত হউক্।

—হে মৌনী কপিলাবস্তু, তোমার সিদ্ধার্থের বাণী আবার নতুন করে শোনাও। জাগ সারনাথ, জাগ মৃগদাব, জাগ উরুবিল্ব, তোমার শীলাচারের পুণ্যে আবার ভারতের গৃহে গৃহে নতুন প্রদীপ জ্বাল। ভারতের প্রতি কুটির স্বাধীন ভারতের নব সঙ্ঘারামে পরিণত হউক্।

—জাগ্রত হও পাটলিপুত্রের পাষাণ। দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শী হে ধর্মাশোক, ভারত ভূমিতে আবার শান্তির সাম্রাজ্য সম্ভব কর।

—আহ্বান করি তোমাকে, ক্ষাত্রশক্তিসেবিতা হে আমার সুদূরাতীতা দুর্জয়া ভারত ভূমি! খৈবার গিরিবর্ত্মে বৈরী অনিকিনীর হিংস্র অশ্বক্ষুরধ্বনি চিরকালের মত স্তব্ধ কর। সমুদ্রচুম্বিত ভারত উপকূলের সুশ্যাম বেলাবলয় হতে বৈদেশিক জলদস্যুর তরণী দূরাপস্থত কর। শত হল্‌দিঘাটের পুণ্যে মহিমান্বিত হে ভারতের সঙ্কটত্রাণ ক্ষাত্র আত্মা, আবার শুদ্ধা দেশাত্মিকা শক্তিতে ভারত ভূমিতে জাগ্রত হও।

—জাগো ভারতের শস্য ও বনস্পতি, স্বাধীন ভারতের বলিষ্ঠ কৃষকের মমতাময় স্পর্শে আবার অন্নময় হও। ভারতের ভাস্কর, স্বাধীন ভারতের হৃদয়কে নতুন করে প্রতিমায়িত কর। দাও প্রেম, দাও পুণ্য, দাও শক্তি, হে মহাপ্রাণ আমাদের যাত্রা সফল কর।

কাব্যতীর্থের প্রার্থনা শেষ হয়। বিরাট জনতা যেমন নিঃশব্দে বসে প্রার্থনা শুনছিল, তেমনি নিঃশব্দে আবার ধীরে ধীরে যে যার ঘরে ফিরে যায়।

শুধু, ভাবাবিষ্টের মত প্রাঙ্গণের এক কোনে বসেছিল সোমা। এই বাণী সে জীবনে কখনো শোনে নি, এমন ক'রে শোনেনি, এখানে শুনতে পাবে তাও আশা করে নি। এ বাণী শোনার পর তার মনপ্রাণ যে এমন করে শিউরে উঠ্‌বে, তাও সে কল্পনা করতে পারে নি। চুপ করে বসে ছিল সোমা, তার চেতনার ওপর দিয়ে যেন এক অদৃশ্য তীর্থসলিলের স্রোত এই মাত্র প্রবাহিত হয়ে গেছে।

প্রবীর মাস্টার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়—চলুন।

সোমা যেন হঠাৎ তন্দ্রাভঙ্গ চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—কাব্যতীর্থ মশাই কোথায় গেলেন?

প্রবীর বলে—ঐ যে চলে যাচ্ছেন।

সোমা দেখতে পায় কাব্যতীর্থ একা একা একমনে ধীরে ধীরে হেঁটে

চলে যাচ্ছেন। পায়ে খড়ম, আদুড় গায়ের ওপর একটি চাদর, আ[illegible]টু পর্যান্ত বহর ধুতি! সোমার বিস্ময়াপ্লুত দৃষ্টিটা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করে— সত্যিই কি ওর নাম বিনোদ কাব্যতীর্থ, শুচিদির স্বামী, দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার যার অন্ন জোটে না, চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতে ঝুড়ি নিয়ে মরা কালিন্দীর হানা মাটি দিয়ে বাঁধে, মতিগঞ্জের নয়ন চৌধুরী যাকে জব্দ করার জন্যে বৃত্তি বন্ধ করে?

প্রবীর বলে—কি ভাবছেন?

সোমা—কাব্যতীর্থ মশাই কি সত্যই পৃথিবীর মানুষ?

প্রবীর কৃতার্থভাবে অথচ কেমন শান্ত গর্বের সঙ্গে হাসতে থাকে—আপনি এতদিনে ওঁকে চিনতে পেরেছেন মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি অনেক দিন আগেই চিনেছি।

সোমা ব্যগ্রভাবে অনুনয় করে—ওঁকে একবার থামতে বলুন প্রবীরবাবু, ওঁর কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে।

প্রবীর ডাক দিতেই কাব্যতীর্থ থেমে মুখ ফিরিয়ে তাকান। সোমা আর প্রবীর এগিয়ে গিয়ে সামনে পৌঁছতেই কাব্যতীর্থ হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন—কি? দু'জনে একসঙ্গে কি মনে করে?

কাব্যতীর্থ যেভাবে এবং যা মনে করেই কথাগুলি বলুন না কেন, সোমা আর প্রবীর দুজনেই হয়তো মনে মনে ক্ষণিকের মত একটা সংকোচে জড়িয়ে পড়ে। কথাগুলির মধ্যে যেন আকাশবাণীর স্পর্শ আছে।

সোমা বলে—আমি এসেছি, একটা প্রশ্ন করবো বলে।

কাব্যতীর্থ তেমনি হাসিমুখে সস্নেহভাবে বলেন—বল।

সোমার মনটা হঠাৎ খুশীতে ভরে ওঠে, কাব্যতীর্থ মশাই তাকে আজ 'আপনি' করে কথা বলতে ভুলে গেছেন।

সোমা আবদারের সুরে বলে—আপনি কেমন ক'রে এত আনন্দে থাকেন, কি মন্ত্রের জোরে, আমাকে বলতে হবে।

কাব্যতীর্থ হো হো করে প্রবল উচ্ছ্বাসে হাস্‌তে থাকেন।—আমি কি কানে মন্তর দিয়ে গুরুগিরি করি নাকি সোমা? অ্যাঁ?

সোমা—আমি কিচ্ছু শুনবো না, আমাকে বলতে হবে।

কাব্যতীর্থ আবার শান্ত হাসির সঙ্গে সস্নেহে বলেন—তুমি কি নিরানন্দে আছ সোমা?

সোমা—না কাব্যতীর্থ মশাই, আমি আনন্দেই আছি, কিন্তু আপনার মত নির্ভয় আনন্দে নয়।

কাব্যতীর্থ—ও, বুঝলাম।

মাটির দিকে একদৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কাব্যতীর্থ ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে যান। তার পর যেন মধুরমন্দ্র প্রতিধ্বনির মত স্বরে বলতে থাকেন—জীবনকে সৎপথে রাখলেই আনন্দ।

সোমা—কোন্‌টা সৎপথ কি করে বুঝবো?

কাব্যতীর্থ—নিজে যেটা সত্য বলে বিশ্বাস করবে, সেটাই সৎপথ। তাতে ভুল করলেও আনন্দ।

কাব্যতীর্থ আবার মুখ তুলে সস্মিতভাবে তাকান। সোমা ভাবছিল, এমন কথা তো আগেও সে কতবার শুনেছে, কিন্তু সেই শোনা আর আজকের শোনায় কত তফাৎ! আগে যেটা শুধু মুখস্থ করার নীতিকথা মনে হতো, আজ সেটাই প্রাণ বাঁচানো ওষধি বলে মনে হয়। নিজে যেটা সত্য বলে বিশ্বাস করবে, সেটাই সৎপথ। এত লোভ ও মায়ার ছলনা, এত ঘৃণা ও ভয়ের ভ্রূকুটি, এত সংস্কার ও ভালো-লাগা দিয়ে তৈরী জটিল আবর্তের মধ্যে স্খলন-পতন ও ত্রুটি থেকে আত্মরক্ষা করতে, এর চেয়ে সহজ মন্ত্র আর কি হতে পারে? পথের ধাঁধায় পীড়িত সোমার মনটা এখনই যেন কতকটা ভারমুক্তির আনন্দ অনুভব করে।

কাব্যতীর্থ বলেন—তুমি কখন্ আস্‌ছো প্রবীর?

প্রবীর—আমি এসেই রয়েছি বিনোদদা, শুধু এঁকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

—এস। কাব্যতীর্থ চলে যান। সোমা আর প্রবীর অন্যদিকে শিশুভবনের পথে অগ্রসর হয়।

প্রবীর যেন কৌতুক ক'রে ভয় দেখাবার জন্যেই সোমাকে বলে—আপনি কি কাণ্ডটা করলেন বুঝতে পারছেন?

সোমা চিন্তিতভাবে বলে—কাণ্ড? কি কাণ্ড করলাম?

প্রবীর—আপনি কাব্যতীর্থের শিষ্য হয়ে গেলেন।

অগাধ পুলকে গভীর এক হাসির আভা হঠাৎ সোমার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে, কোমল চিবুক আর ললিত ভুরু দিয়ে গড়া সোমার মুখটা বড় সুন্দর হয়ে ওঠে।

সোমা বলে—ও, তাই বলুন। আর মশাই বুঝি এ কাণ্ডটা অনেকদিন আগেই…।

প্রবীর বলে—হ্যাঁ!

এক অন্তরঙ্গ সাথীর কাছে মন খুলে জীবনের এক গোপন ঘটনার বৃত্তান্ত যেন বর্ণনা করে প্রবীর।—অনেক গুণী-জ্ঞানীর কাছে খোঁজ করে বেড়িয়েছি অনেকদিন, সবাই তাঁদের নিজের নিজের সত্য দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন—এই একমাত্র সত্য, এই পথে এস। একমাত্র বিনোদদাই উল্টো কথা বললেন—তুমি নিজে যেটা সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রবে সেটাই একমাত্র পথ।

সোমা আরও খুশী হয়ে বলে—এত সহজ পথ থাকতেও লোকে পথ চিনতে পারে না, আশ্চর্য!

প্রবীর সত্যিই আশ্চর্য হয়—কি বললেন? সহজ পথ?

সোমা যেন নিজের মনের আবেগেই আবৃত্তি করে—হ্যাঁ, কত সোজা ও সহজ পথ। নিজে যেটা সত্য বলে বুঝবে…।

প্রবীর আর কোন প্রশ্ন বা তর্ক করে না। অনেকটা পথ নীরবে অতিক্রান্ত হয়ে একটা ছায়া পেয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে প্রবীর। বহুকালের পুরনো একটা রাসমঞ্চের ধ্বংসস্তূপের ছায়া। পথটা এখান থেকে দুভাগ হয়ে একটা ডাইনে ঘুরে শিশুভবনের দিকে চলে গেছে, আর একটা চলে গেছে ধানক্ষেতের আলের মাথায় মাথায় ছোট একটা মাঠের দিকে, যেখানে কত গুলি বড় বড় পলাশ একপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু পলাশের ভিড় নয়, এখান থেকেই দেখা যায়, মাঠের ওপর কংগ্রেস শিবিরের সম্মুখে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রবীর বলে—আমাকে এখান থেকেই বিদায় দিন, সবাই আমার অপেক্ষা করছে। আর সময় নেই।

দূর জনতার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সোমা ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে। এ তো আর কল্পনার ছবি নয়, জ্বালামুখীর শিখাকে আত্মাহুতি দিয়ে বরণ করার জন্য ঐ যে প্রত্যক্ষ এক বিরাট প্রাণের সমাবেশ। শুভেচ্ছা ও আনন্দ, কিন্তু তার সঙ্গে একটা ছেড়ে-দিতে-মন-চায়-না উৎকণ্ঠা, সব মিলিয়ে সোমার গলার স্বর নিবিড় করে আনে—কোথায় যাবেন প্রবীরবাবু?

প্রবীর হাত তুলে দূর জনতার দিকে ইঙ্গিত করে—ঐ যে।

সোমা চোখ খুলে তাকায়। শান্তভাবেই বলে—যান।

—চলি। প্রবীর হাসিমুখেই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু পথের অপরদিক থেকে ছায়ার বাঁকে দুটি মানুষ এগিয়ে আসছে দেখা যায়। প্রবীর থমকে দাঁড়ায় ও তাকিয়ে থাকে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এল দুটি মূর্ত্তি। এক শীর্ণদেহ প্রৌঢ়া, শত তালি দিয়ে সেলাই করা জীর্ণ পরিচ্ছদটা ভিখারিণীর মতই, তবু চোখ মুখ নম্র পরিচ্ছন্নতায় ভরা, রোগা রোগা পায়ের পাতা দুটি পথচলা ধূলোয় ঢাকা। সঙ্গে একটি কিশোর বয়সের গ্রাম্য ছেলে।

শীর্ণদেহ নারীমূর্তি আর একটু নিকটে এগিয়ে আসতেই প্রবীর যেন একটা লাফ দিয়ে গিয়ে তার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে। সেই ধুলোয় ঢাকা রোগা রোগা পায়ের পাতায় মাথাটা লুটিয়ে দিয়ে ঘষতে থাকে প্রবীর। সোমা সন্ত্রস্ত ভাবে তাকিয়ে থাকে। মানুষকে এভাবে প্রণাম করতে জীবনে দেখেনি সোমা।

প্রবীর উঠে দাঁড়িয়ে বলে—মা, তুই কোথেকে এলি ?

সোমা কেন জানি দৃশ্যটাকে সহ্য করতে পারছিল না। কাঁটালতায় ঢাকা রাসমঞ্চের ইঁটের স্তূপের গায়ে হেলান দিয়ে শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে সোমা।

শ্যামু এগিয়ে এসে প্রবীরকে প্রণাম করে, শ্যামুর মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে প্রবীর আবার বলে—কেমন আছিস্ মা ?

মা বলেন—আমি ভালই আছি, বুড়োর বড় কষ্ট যাচ্ছে রে পবু।

প্রবীর কোন উত্তর দেয় না। মা একবার প্রবীরের আপাদমস্তক মূর্তিটার ওপর যেন দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর বলেন—তুই ভাল আছিস তো ?

প্রবীর—হ্যাঁ মা।

মা—শুনলাম তুই হেডমাষ্টার হয়েছিস।

প্রবীর একটু চুপ করে থেকে উত্তর দেয়—হ্যাঁ মা।

মা—তবে এবার বুড়োকে দুটো টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য কর পবু, নইলে যে আর চলে না।

প্রবীরের নিরুত্তর মূর্তিটা শুধু দিকপ্রান্তে শূন্য দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মা বলেন—তুই ঘরে যাসনা কেন রে ? একবার উঁকি দিয়ে দেখেও তো আসতে হয়।

প্রবীর বলে—যাব।

মা—কবে ?

প্রবীর—শিগ্‌গির যাব।

মা—আমি কিন্তু আজকেই ফিরে যাব পবু।

প্রবীরকে নিরুত্তর দেখে মা একটু চঞ্চল হয়ে বলেন—ব্যাপারীদের নৌকয় নরসিংহতলা পর্য্যন্ত এসেছি, দয়া করে বিনি ভাড়ায় নিয়ে এসেছে। ওরা আজই বিকেলে আবার ধূপখাল ফিরে যাবে। আমি এখুনই যাব পবু।

মা যেন কিসের আশায় কথার ইঙ্গিতে একটা তাগিদ দিচ্ছেন। প্রবীর বুঝলো কি না সে-ই জানে। মাকে আবার প্রণাম ক'রে প্রবীর বলে—আচ্ছা, এস মা।

মা'র শীর্ণ অথচ কত্র মুখ হঠাৎ যন্ত্রণাক্ত হয়। প্রবীরের দিকে তাকিয়ে মা'র চোখের দৃষ্টিটা যেন তৈলহীন প্রদীপের পোড়া সলিতার শিখার মত ধোঁয়াটে হয়ে ওঠে।—বুড়োর জন্যে সঙ্গে কিছু দিবি নে পবু ?

প্রবীর নীরব। মা একটু বেশী বিচলিত হয়ে বলেন—আমি তো তোর কাছে কোনদিন কিছু চাইনি পবু। কিন্তু আজকেও দিবি না ? বাঁচবো কি করে বল ?

মা'র হাতটা ধরে প্রবীর যেন একটা চীৎকার চেপে রাখবার চেষ্টা করে—আর কটা দিন তোরা জোর করে বেঁচে থাক্ মা, এখন আমায় তাগিদ দিস না। আমার কিছু নেই।

সেই মুহূর্ত্তে মার শীর্ণ মুখটা আবার স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বলেন—আচ্ছা।

মা'র হাত ছেড়ে দিয়ে আর কোন দিকে না তাকিয়ে প্রবীর পথ ধরে যেন ছুটে চলে যেতে থাকে। ছোট্ট ঘরের মায়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত একটি পলাতক আত্মা নিখিল জ্বালামুখীর দিকে।

এই চকিত দৃশ্যটার সীমাহীন নিষ্ঠুরতায় যেন মূর্চ্ছাহতের মত চোখ

বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল সোমা। চোখ খুলতেই বুঝতে পারে, সে কাঁদছিল। প্রবীরের মা আর ভাই কিছু দূর এগিয়ে চলে গেছে, শিশুভবনেরই দিকে, নরসিংহতলার সড়কটা ধরবে বলে।

এখনও সুযোগ আছে। সোমা প্রায় দৌড়ে দৌড়ে শিশুভবনের কাছাকাছি এসে প্রবীরের মা ও ভাইকে বলে—আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি এখুনি আসছি।

সোমা প্রায় তেমনি ব্যস্তভাবে প্রায় ছুটে গিয়ে শিশুভবনের নিজের ঘরটিতে ঢোকে। বাক্স খোলে, কুড়িটা টাকা তুলে নিয়ে আবার প্রবীরের মা'র কাছে এসে দাঁড়ায়।

সোমা বলে—এই নিন।

প্রবীরের মা'র শীর্ণ মুখটা হঠাৎ বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মত হয়ে ওঠে।—টাকা? কেন?

সোমা—আমি দিচ্ছি, নিন।

প্রবীরের মা শান্তস্বরেই প্রশ্ন করেন—ভিক্ষে দিচ্ছ?

সোমা লজ্জিত ও ব্যথিতভাবে বলে—না, না, এ আপনারই ছেলের টাকা, নিন।

প্রবীরের মা সোমার মুখের দিকে আরও বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকেন। দৃষ্টিটা যেন এক অতল প্রশ্নের সমুদ্রে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে।—আমার ছেলের টাকা, তোমার কাছে? তুমি কে মা?

সোমা—আমি এই শিশুভবনে ছেলে পড়াই। নিন।

সোমার মুখের দিকেই তাকিয়ে প্রবীরের মা ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন—না।

প্রবীরের মা আর শ্যামু এবার একটু বেশী ব্যস্তভাবেই পা চালিয়ে চলে যায়। তুমি কে মা? প্রশ্নটার উত্তর যেন হঠাৎ পেয়ে গেছেন প্রবীরের মা। শিশুভবনে ছেলে পড়ায়, রূপে গুণে জাতে অতি ভদ্র ঐ মরীচিকায়

তাঁর ধূপখালের কুঁড়ে ঘরের ছেলে হারিয়ে গেছে চিরকালের জন্য। প্রবীরের মা আর ফিরে তাকান না। শুধু সোমা দেখতে থাকে, যতক্ষণ দেখা যায়।

প্রথম গেল ভরাকুল থানা।

দশটি রাইফেল আর দু'টি রিভলভারের অগ্নিময় হিংসায় উদ্ধত ভরাকুল থানা দূরায়াত জনতার প্রথম শঙ্খরোল শোনামাত্র কাঁটাতারের বেড়া গায়ে জড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। কিন্তু তা'তে কোন ফল হলো না। শঙ্খরোলও থামলো না। দশ হাজার গ্রাম্য প্রাণের বাহিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে যেন এক সজীব গ্রানিটের প্রাচীরের মত থানার চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজের হুমকি বাতাসে ফাঁকা হয়েই মিলিয়ে গেল।

দশহাজার পুণ্যাত্মার জনতা নয়। দুঃখে অপরাধে ও দীনতায়, লোভে ক্ষোভে ও নিরন্নতায়, ধৈর্য্যে ক্ষমায় ও ভালবাসায়, ভাল-মন্দের রক্তমাংস দিয়ে তৈরী গ্রাম বাঙ্গলার মলিনমূর্তি জনতা। কে না আছে এর মধ্যে? বুড়ো-আধবুড়ো, তরুণ-কিশোর, ক্ষেতচাষী, বেসাতি, মাটিকাটা মজুর, ছোট-বড় জাত-কুজাত, কর্ম্মী, বিদ্যার্থী, স্বেচ্ছাসেবক। আছে পাগলা বাউল অভিরাম। আছে রাতভিখারী কানা ফটিক। মাত্র দু'দিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, সেই দাগী চোর সদানন্দও আছে। কিন্তু আজ সবাই মিলে মন্ত্রশুদ্ধ নিঃশ্বাসের মত এক আত্মভোলা প্রেরণায় এই অভিযানকে পুণ্যময় করে তুলেছে। জনতার পুরোভাগে ছিলেন কাব্যতীর্থ। শুধু দু'হাত তোলা জয়ধ্বনি আর বুকভরা প্রতিজ্ঞা সম্বল করে সবাই এগিয়ে এসেছে।

কাঁটা তারের আড়ালে দাঁড়িয়ে পুলিশ ইনস্পেক্টার জনতাকে হুঁসিয়ারী শুনিয়ে দিলেন, পনর মিনিটের মধ্যে স'রে যেতে।

জনতার পক্ষ থেকে কাব্যতীর্থ পুলিশ-ইনস্পেক্টারকে এক ঘণ্টা সময় দিলেন, যত ইচ্ছে গুলি চালিয়ে নিতে।

আগষ্ট মাসের মধ্যাহ্ন সূর্য প্রতি মুহূর্ত ক্ষয় করে ধীরে ধীরে পশ্চিম

আকাশে হেলে পড়তে থাকেন। প্রতি মুহূর্তে নিজের কাঁটা তারের বেড়ায় বন্দী ভরাকুল থানার কঠিন ঔদ্ধত্য একটু একটু ক'রে ক্ষয় হতে থাকে। একটি ঘণ্টা পর আবার শঙ্খরোলের ঝড় ওঠে, কাঁটা তারের বেড়ার ওপার থেকে দশটা রাইফেল ও দুটো রিভলবার ঝপ্ ঝপ্ করে জনতার পায়ের কাছে এসে পড়ে, আত্মসমর্পণ করে।

উর্দি খুলে রেখে বের হয়ে আসে ইনস্পেক্টার, দারোগা, কনষ্টেবল, দফাদার ও চৌকীদারের দল। কাব্যতীর্থের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে, গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি চায়। কাব্যতীর্থ খুশী হয়ে অনুমতি দেন।

সূর্য্য অস্ত যাবার আগেই দেখা যায়, ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে ভরাকুল থানার ওপর।

সন্ধ্যা গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে ভরাকুলের অন্ধকারে একটা নতুন ধরণের আগুন জ্বলে রাঙা হয়ে। উদ্ধত ভরাকুল থানার ত্রিশটা উর্দি আর রাশি রাশি নথিপত্র পুড়তে থাকে, ইংরাজের পীনাল কোডের রাশি রাশি অহংকারের জ্বলন্ত চিতা।

এবার ফিরে যাওয়ার পালা। জনতা দলে দলে ভাগ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের দিকে চলে যেতে থাকে। যাবার সময় অনেকে এগিয়ে এসে কাব্যতীর্থকে প্রণাম করে। প্রথম সত্যাগ্রহে জয়ী আনন্দচঞ্চল এক একটি দল ধীরে ধীরে দূরান্তরে চলে যায়। আর স্পষ্ট ক'রে কিছু দেখা যায় না। ওপরে তারায় ভরা আকাশ, নীচে গ্রাম প্রান্তর, তারই মধ্যে পথিক জনতার চলমান জয়ধ্বনির রেশ, পুণ্য পুলকে অন্ধকার শিউরে ওঠে।

সব শেষে সদানন্দ দাগীও এসে কাব্যতীর্থকে প্রণাম করে।—গ্রাম তো একেবারে নিষ্কণ্টক হলো না পণ্ডিত মশাই।

কাব্যতীর্থ—কেন সদানন্দ?

সদানন্দ—মাণিক চৌকীদারকে তো দেখলাম না। সব কাঁটার বড় কাঁটা গা-ঢাকা দিয়ে গ্রামের মধ্যেই লুকিয়ে রইল পণ্ডিত মশাই।

আর লাভ? কেউ না জানুক, সোমা জানে তার সমগ্র অনুভবের স্নায়ু কী এক পরম লাভের আস্বাদে পরিতৃপ্ত হয়ে আছে। কাঞ্চীপুরের এই হৃদয়ভরা ঐশ্বর্যের জগতে রাজেশ্বরী হওয়ার লাভ। দুর্লভকে নিবিড় করে পাওয়ার লাভ। সাধে কি আর শুচিদি বাপের বাড়ী যেতে চান না?

তারার মা এসে বলে—স্বরাজ হয়েছে গুরুমা।

সোমা হাসিমুখে তারার মা'র দিকে তাকায়—কে বললে?

তারার মা—ভরাকুল থানা পালিয়ে গেছে। ওরা সবাই ঘরে ফিরে এসেছে।

সোমা—বেশ।

ভোলার নিকারটা তুলে নিয়ে সোমা আবার সেলাই ধরে। তারার মা কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর যেন সোমাকে ভাল ক'রে শোনাবার জন্যই আচমকা চেঁচিয়ে বলে ওঠে—প্রবীর মাস্টারও ফিরে এসেছে।

সোমা একটু বিরক্তির সঙ্গেই উত্তর দেয়—শুনলাম তো, এত চেঁচিয়ে বলবার কি আছে।

তারার মা—এবার তুমি খেয়ে নাও।

সোমার মাথাটা হঠাৎ সেলাই করার কাজে আরও বেশী করে ঝুঁকে পড়ে, যেন মুখ লুকোবার একটা আড়াল খুঁজছে সোমা। তারার মাকে প্রত্যুত্তরে শোনানো দূরে থাক, ক্ষণিকের মত চোখ তুলে তাকাবার সাহসটুকু পর্যন্ত যেন তার হারিয়ে গেছে।

—খাও। তারার মা আবার বলে। বলার ভঙ্গীতে একটা ধমকের সুর ছিল। সোমা সেলাই ফেলে রেখে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা ভাতের থালা টেনে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে। তারার মা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, তারপর চলে যায়।

এইবার নিশ্চিন্ত সাহসে এক গেলাস জল খেয়ে আর ভাতে জল ঢেলে

সোমাও উঠে পড়ে। মনভরা প্রশান্তি নিয়ে আঙিনার চারদিকে ঘুরে ফিরে যেন কাঞ্চীপুরের বাতাসকে গায়ে মেখে বেড়ায়, চিরকালের মত আপন করার জন্যে। ইচ্ছে হয়, পুকুরে গিয়ে এই ঘোর সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা জলে [illegible]বিয়ে ডুবিয়ে স্নান করে আসে। কিন্তু তারার মা জানতে পারলে আবার [illegible]স্বরে ধমক দিয়ে কি বলে ফেলবে, কে জানে?

রাত হয়ে আসছে আরও নিঃশব্দ হয়ে, তুলসী ঝারির ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে একটা ঘাসী রঙের শাড়ি প'রে সোমা যখন আয়নার সামনে দাঁড়ায়, মুহূর্তেকের মত তার লজ্জারক্ত মুখের প্রতিচ্ছবিটা নিজের কাছে ধরা পড়ে যায়। নিজের চেহারাকে কখনো ভাল ক'রে সাজাবার প্রয়োজন হবে, কোনদিন এই কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়নি সোমা। মা'র মুখে বহু অনুযোগ শুনেও রঙীন শাড়ি পরেনি। বরং নিজের নগণ্যতাকে চরম করে তোলবার জন্যে সাধ্যমত যা করবার তাই সে এতদিন করে এসেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ? এ যে কান্তাধিনী অভিসারিকার গোপন রূপসজ্জার মত। অগোচরের নিয়তি যেন আজ সুযোগ বুঝে সোমার বাইশ বছর বয়সের মনটাকে এক মুঠো পরাগ দিয়ে চেপে ধরেছে।

—আর লজ্জা! ক্ষণিকের সংকোচে বিব্রত মনটাকে যেন নিজের মনেই বিদ্রূপ করে ওঠে সোমা। কি এমন অপরাধ? কার কাছে অপরাধের জবাব দিতে হবে? কাঞ্চীপুরের বনবাসে এসেই তো সোমা আবিষ্কার করতে পেরেছে যে, পৃথিবীতে এমন দুটি চক্ষুও আছে যা তার এই যেমন-তেমন মুখের দিকেই একটি মিনিট তাকিয়ে থাকতে পারলে মুগ্ধ হয়ে যায়। সে-চোখের কাছে মধুরতর হয়ে দেখা দিলে কি অপরাধ হবে? হোক্ অপরাধ, এর জন্যে তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার আছে, এমন কোন মাথা-কেনা উপকারী মহাজন তো দেখা যায় না।

লজ্জা দূরে থাক্, সোমা শেষ পর্যন্ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে একটা চন্দনের টিপও পরে, চুলের কাঁটা দিয়ে টিপটাকে তারার মত ক'রে আঁকে।

বাইরে যাবার আগে আলোটা নিভিয়ে দিতে গিয়েই দেখতে পায় একটি চিঠি পড়ে আছে বইগুলির ওপর। খুব সম্ভব আজকের ডাকেই এসেছে, তারার মা কখন্ রেখে গেছে কে জানে। সারা দিনের কাজের ব্যস্ততার মধ্যে এ চিঠি চোখেই পড়েনি।

চিঠিটা আদ্যোপান্ত পড়ে সোমার মুখে এক অস্বস্তিকর কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে পড়ে। তার বনবাসের সুখের দরজায় এ আবার কোন্ পুষ্পক রথের শব্দ?

নয়নবাবুর চিঠি। দাবি করবার কোন অধিকার নেই তবু দাবি করেছেন। শিশু ভবনের অধ্যক্ষা কষ্টে আছে শুনতে পেলে, তিনি দেরাদুনে থেকেও নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না। প্রতি মাসে চক্রবেড়ের ঠিকানায় মাইনেটা নিয়মিত পাঠিয়ে দেবেন। আশ্চর্য। সোমার সৌভাগ্যকে উত্যক্ত করার জন্যে অলক্ষ্যে এ আবার কোন্ পরিহাসের ষড়যন্ত্র গভীর হয়ে উঠেছে। এমন অগাধ মিনতি দিয়ে আহ্বান করা, এত সহৃদয় সৌজন্যে টাকা দিয়ে সাহায্য করা, নয়নবাবু যে সত্যিই উপকারী মহাজনের রূপে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু কেন, কিসের জন্য?

কিছুক্ষণের জন্য একটা সংশয়ের অশুচি স্পর্শে সোমার মনের শান্তি ক্ষুণ্ণ হয়। দাবি করবার অধিকার নেই তবু দাবি করেছেন, আবদার মন্দ নয়। ভাবতে গিয়ে বিরক্তিটা আরো দুঃসহ হয়ে ওঠে। জীবনের প্রথম অনুরাগে বন্দিত শুক্লাভিসারের পথে পা বাড়িয়ে দিতেই যেন এক অপয়া অন্ধকারের বাহু পেছন থেকে আঁচল ধরে টেনেছে।

এক ফুৎকারে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সোমা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে এসে বলে—আমি মাধাইকে সঙ্গে নিয়ে একবার বাইরে যাচ্ছি তারার মা।

তারার মা অসন্তুষ্টভাবেই জিজ্ঞেস করে—এখন আবার কোথায় যাবে?

সোমা—যাই ওদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।

আর একটু দূরে, আজকের এই নাটকান্ত অন্ধকারের স্পন্দমান অস্পষ্টতার মধ্যে বাণীপীঠের ঘরগুলিকে অবসন্ন সৈনিকের ঘুমন্ত শিবিরের মত দেখায়। সোমা এগিয়ে চলেছিল ধীরে ধীরে, শরীরী নূপুরধ্বনির মত, এই শিবিরের অভ্যন্তরে একটা ক্লান্ত স্বপ্নকে আক্রমণ করার জন্য। কাব্যতীর্থের শিষ্য, নরসিংহের ভক্ত, দেশের মাটীর তিলক কপালে লাগিয়ে একটা প্রতিজ্ঞার নেশায় শুধু জীবনটাকে কাজের মধ্যে পাগল ক'রে রেখেছে, এই ধরণের একটা মানুষ সংসারের সব সুখ থেকে পৃথক্ হয়ে একা একা পড়ে আছে ঐখানে, ঐ মাটীর কুটীরের একটা নিভৃতে, যার নিষিদ্ধ হাতের স্পর্শকে এক অবৈধ দুঃসাহসের আবেগে সোমা এরই মধ্যে বরণ ক'রে ফেলেছে। করুক্ না দেশের কাজ, কিন্তু তার জন্যে কি এমন ক'রে যোগী হয়েই থাক্‌তে হয়? সোমার মনের লজ্জাকাতর কামনাকে বিচলিত ক'রে দিয়ে নিজে অবিচল হয়ে থাক্‌বে, কোন নরসিংহ ভক্তের এতটা পাথুরেপনা সোমা সহ্য করতে পারবে না।

আলোটা হাতে নিয়ে চলতে চলতে বাণীপীঠের প্রাঙ্গনে ঢুকেই একটা ছোট আতাগাছের দিকে তাকিয়ে মাধাই বলে—আমি এখানেই দাঁড়াই গুরু মা।

সোমা বলে—আচ্ছা।

নিঃস্তব্ধ বাণীপীঠের বড় বড় ঘরগুলির একটির মধ্যে শুধু আলো জলছে। সোমা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়।

মেঝের ওপর একটা মাদুরে বইয়ের ওপর মাথা রেখে টান হয়ে শুয়েছিল প্রবীর, চোখ বন্ধ ক'রে। মাথার কাছে একটা পেতলের পিলসুজে আলো জল্‌ছিল। সোমা ভেতরে ঢুকে কাছে এসে দাঁড়ায়, পিলসুজের সল্‌তে উস্‌কিয়ে দেয়।

ঘুমিয়ে আছে ব'লে মনে হয়। সোমা একদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, ছেলেমানুষের মত একটা অসহায় স্নেহপিপাসু মুখ, অথচ ইনিই নাকি বাণীপীঠের হেডমাস্টার, ভরাকুল থানা জয় ক'রে কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছেন। শুচিদি বলেন, এই মানুষটিই নাকি মাঝে মাঝে ভয়ংকর হ'য়ে ওঠেন। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মায়া-রঙের দিকে চোখ তুলে তাকাবার অবসর এদের নেই। অদ্ভুত আদর্শ। এরা জোর ক'রে নিজেকে নির্মম ক'রে রাখে অথচ......।

—মাঃ। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ক্ষীণ স্বরে যেন একটা রুদ্ধ বেদনাকে মুক্তি দিয়ে প্রবীর পাশ ফেরবার চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে ধড়ফড় ক'রে উঠে বসে।

সোমা পিলসুজটা টেনে একেবারে প্রবীরের মুখের সামনে এনে রাখে। সন্দিগ্ধভাবে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপরেই প্রবীরের মাথায় হাত রেখে বলে—ও কি হচ্ছে? তুমি না নরসিংহের ভক্ত?

মুহূর্তের মধ্যে প্রবীরের চেহারাটা বদ্‌লে যায়। সব দুর্বলতাকে এক নিমেষে দূরে ঠেলে দিয়ে জীবনের প্রতিজ্ঞাকেই যেন দৃঢ় স্বরে সমর্থন ক'রে প্রবীর—হ্যাঁ।

সোমা—তবে?

প্রবীর বলে—ও কিছু নয়।

সোমা—কিছু নয় কেন? গায়ের জোরে সব কিছু সহ্য করবার চেষ্টা ক'রো না।

প্রবীরের নিরুত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে সোমা আবার বলে—তোমার কাছে আজ একটা অনুরোধ করতে এসেছি।

প্রবীর—বলুন।

সোমা—তুমি ধূপখালে গিয়ে তোমার বাবা আর মাকে দেখে আস্‌বে।

প্রবীর—হ্যাঁ, শিগ্গিরই যাব।

সোমা—আর যতটুকু পার, তাঁদের দু'টো টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে।

মুখটা হঠাৎ আবার বেদনার্ত হয়ে উঠলেও আর বিচলিত হয় না প্রবীর। শান্তভাবেই উত্তর দেয়—আচ্ছা।

এর পর কিছুক্ষণের মত দু'জনের পক্ষেই যেন সব বক্তব্য নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। আর কি বল্‌বার আছে? সোমাই প্রথম কথা বলে—অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে চিনতে পারছো তো?

প্রবীর অপ্রস্তুত হয়ে বলে—ও কি কথা, বসুন বসুন।

সোমা তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে, ভুরু দুটো যেন একটা রুদ্ধ ক্ষোভের স্পর্শে ঈষৎ কুটিল হয়ে ওঠে। একটু শক্ত করেই প্রত্যুত্তর দেয় সোমা—না, চিনতে পারনি।

সোমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতের মত তাকিয়ে থাকে প্রবীর। চিনতে না পারার কি আছে? কপালে চন্দনের তারা, আর ঐ ঘাসী রঙের শাড়ি, নতুন সাজ বটে। কিন্তু এসব তো তোমারই স্পর্শে সুন্দর, নইলে ওসবের আর কি দাম আছে? তুমি উজ্জ্বল বলেই ঐ চন্দনের তারা এত উজ্জ্বল, তুমি স্নিগ্ধ বলেই তো ঐ শাড়ির ঘাসী রঙ এত স্নিগ্ধ।

প্রবীর হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। সোমার হাত ধ'রে বলে—বসো সোমা।

সোমা হেসে ফেলে—ভুল ভাঙতেও এত দেরি হয়।

ঘরের এক কোণ থেকে দুটো বেতের মোড়া তুলে নিয়ে এসে প্রবীর বলে—বসো।

সোমা—না, বসবো না। মাধাই দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, তাছাড়া তারা'ও বোধ হয় কৈফিয়ৎ নেবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। দেরি করবো না।

সোমার হাসিমুখ পর মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে আসে। ভবিষ্যতের একটা শঙ্কার ছায়ার দিকে তাকিয়ে যেন সোমা বলতে থাকে—সেদিন তুমি আমার কাছ থেকে একটা কথা আদায় করেছ, মনে আছে তো?

প্রবীর—কি কথা?

সোমা—মনে নেই? আমি কাঞ্চীপুর ছেড়ে যাব না, আমি তোমাকে এই কথা দিয়েছি।

প্রবীর—হ্যাঁ।

সোমা—আজ আমি তোমার কাছ থেকে একটা কথা চাইছি।

প্রবীর—বল।

সোমা—তুমি আমাকে কাঞ্চীপুর ছেড়ে যেতে দেবে না।

প্রবীর সোমার হাতটা শক্ত ক'রে ধরে—তুমি নিজে চলে না গেলে আমি তোমাকে যেতে দেব না সোমা।

একটা নিশাচর ছায়া দেখা দিয়েছে কাঞ্চীপুরে। কাঞ্চীপুরের আশে পাশে আরও দু' একটি গ্রামেও তাকে মাঝে মাঝে দেখা গিয়েছে। ছায়াটার লোভ বিশেষ ক'রে কাঞ্চীপুরের ওপর। একবার দেখা গিয়েছিল বাণীপীঠের প্রাঙ্গনে, সন্ধ্যের একটু পরে। একবার কাব্যতীর্থের বাড়ির অপরাজিতার বেড়ার ধারে, মাঝ রাতে। আর একবার পলাশতলার কংগ্রেস শিবিরের কাছে, প্রায় ভোর রাত্রে, কর্মীরা যখন সবেমাত্র ঘুম ছেড়ে উঠে প্রভাতী ভজন গাইতে আরম্ভ করেছে। রাত ভিখারী কাণা ফটিক এই ছায়াকে অনেকবার দেখেছে, পাগলা বাউল অভিরাম একবার ধরতে তাড়া করেছিল, কিন্তু ধরতে পারেনি। দাগী সদানন্দ গাঁয়ের যত মনসাসীজের ঝোপের আড়ালে সারা রাত ওৎ পেতে বসে থাকে, এই ছায়াকে ধরবার জন্যে।

পলাশতলার কংগ্রেস শিবিরে এক সকাল বেলায় গাঁয়ের লোকেরা

ক্ষেতের ওপর থেকে কুড়িয়ে একটা লাস আর একগাদা ছাপা কাগজ নিয়ে এল। মতিগঞ্জ থেকে জেলা বোর্ডের যে সড়কটা বরাবর কাঞ্চীপুর হয়ে আবার দক্ষিণ দিকে ধূপখালের হাট পর্যন্ত চলে গেছে, সেই সড়কেরই এক পাশে চারা ধানের ক্ষেতের ওপর লাসটা পড়েছিল। আর লাসটার পাশে পড়েছিল এক গাদা ইস্তাহার, তার কতক কুচি কুচি ক'রে ছেঁড়া, কতক আস্ত।

খবর পেয়ে তখুনি প্রবীর মাস্টার ছুটে যায় পলাশতলার কংগ্রেস শিবিরে। লাসের মুখের দিকে তাকিয়ে চম্‌কে ওঠে—হ্যাঁ, এই তো আমাদের কেদার।

মতিগঞ্জের এক প্রেস থেকে ছাপানো এই ইস্তাহারগুলি নিয়ে রাতের অন্ধকারে সড়ক ধরে সোজা কাঞ্চীপুরের বাণীপীঠে আজই তার পৌঁছে যাবার কথা ছিল। বয়সে নিতান্ত ছেলেমানুষ, কিন্তু কাজের বেলায় যুদ্ধ ঘোড়ার মত উৎসাহী এই ছাত্রটীকে বড় ভাল বাসতো প্রবীর মাস্টার। ওরই ফিরে আসার অপেক্ষায় প্রবীর মাস্টার এই কটা দিন যেন ধৈর্য ধরে বসেছিল। কেদার যেন মরতে মরতেও তার কাজটি করে দিয়ে গেছে, এই ইস্তাহারে বর্ণিত করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে বাণীকে বর্ণে বর্ণে সত্য ক'রে।

কেদারের মৃতদেহের চারদিকে দাঁড়িয়ে জনতা বলাবলি করে—এ কার কাজ? কে খুন করলো? কার পক্ষে এমন নিষ্ঠুর কাজ সম্ভব?

একমাত্র সদানন্দ উত্তর দেয়—এ সব সেই ছায়ার কাজ।

কিন্তু এখন সকালবেলার সোনালী রোদে মাঠ ছেয়ে গেছে, নিশাচর ছায়া কোথায় মিলিয়ে গেছে কে জানে। কেদারকে ত্রিবর্ণ পতাকায় সাজিয়ে সকলে শোভাযাত্রা ক'রে মরা কালিন্দীর চড়ায় গিয়ে পৌঁছয়। চিতাগ্নি জ্বলে ওঠবার আগেই কেদারের মুখের দিকে তাকিয়ে নরসিংহ ভঞ্জের চোখ দুটো দুঃসহ জ্বালায় জ্বলে ওঠে।

এবং সেদিন থেকেই জ্বলে উঠলো চারদিক। জ্বলে সমগড়ের ডাকঘর,

জলে নরসিংহতলার ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, জলে শ্যামনগরের ডাক বাংলা। জেলা বোর্ডের সুদীর্ঘ সর্পিল সড়কটাকে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ছিন্ন ভিন্ন করা হয়, এক জায়গায়, দু জায়গায়, দশ জায়গায়। পোড়ে চণ্ডীখোলার খাসমহাল অফিস, পোড়ে নিশুনিয়ার আবগারী ভাঁটি, পোড়ে মরাকালিন্দীর সরকারী খেয়ার নৌকা। এদিকে সমগড় পর্যন্ত ওদিকে কাঞ্চীপুর স্টেশন পর্যন্ত, এই জ্বালার ঝড়ে টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি উৎখাত হয়ে মাঠের এদিকে ওদিকে মড়ার মত পড়ে থাকে, ছেঁড়া তারের পিণ্ডগুলি ঠাকুরপুরের বিলের জলে বিসর্জিত হয়। নিদ্রা নেই, শ্রান্তি নেই, প্রবীর মাস্টার পথ দেখায়—আর করাল ঝঞ্ঝাবায়ুর মত গ্রাম-জনতা দিকে দিকে ঘুরে ফিরে যেন পরশাসনের প্রত্যেকটি ঘাঁটি চূর্ণ করতে থাকে। গ্রাম জীবনের পুণ্যক্ষেত্র থেকে দুই শতাব্দীর ইংরাজীত্বের উর্দিপরা বীভৎসতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার অভিযান। মরতে হয় মরে, মারতে হয় মারে।

কাব্যতীর্থ এক একবার প্রবীরকে কি যেন বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেন।—প্রবীর ভাই, যদি পার তবে অযথা আঘাত না দিয়ে···একটু শান্তভাবে···।

কিন্তু আরও কটা দিন এই বহ্নিময় অভিযানের পালা চলতে থাকে, এবং নবগ্রামের সাব রেজিস্টারী অফিস ও সপ্তবাটির ঘুষখেকো মূর্তিটা ঋণশালিশী বোর্ডের দানবীয় নিঃশেষে ভস্মীভূত করার পর প্রবীর মাস্টার সত্যিই শান্ত হয়।

শান্তি শান্তি। কাঞ্চীপুরকে কেন্দ্র ক'রে চারদিকের ত্রিশটি গ্রামের আত্মা আজ বন্ধনমুক্ত। তারপর, এক শুক্লা চতুর্দশীর রাত্রে তালকুঞ্জের মাথার ওপর যখন কুয়াশালেশহীন আকাশে আবার চাঁদ ভাসতে থাকে, দেখা যায় বাণীপীঠের প্রাঙ্গনে একটি কাষ্ঠফলকে বড় বড় অক্ষরে লেখা—কাঞ্চীপুর স্বরাজ সরকার।

কাঞ্চীপুর স্বরাজ সরকার, ইংরেজ রাজের দণ্ডিত শাসনভারপীড়িত

ত্রিশটি গ্রামের অভ্যুত্থিত মৃত্তিকা। ঝঞ্ঝাবাহিনীর সতর্ক চক্ষুর প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত এর দিগ্‌বলয়। বহিঃ পৃথিবী থেকে কোন আগন্তুক বিনা ছাড়পত্রে এখানে প্রবেশ করতে পথ পায় না। ডাক যায় না, ডাক আসে না। মহার্ণবের বুকে ভূকম্পোত্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপের মত কাঞ্চীপুর স্বরাজ সরকার একেবারে স্বতন্ত্র।

কাব্যতীর্থ আবার নতুন করে এক ধর্মগোলা তৈরী করেন, চাষীদের স্বেচ্ছার দানে ধর্মগোলার শস্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ। স্বরাজ সরকারের আইন, স্বরাজ সরকারের শাস্তি, স্বরাজ সরকারের ক্ষমা। ত্রিশটি গ্রামের স্বাধীন মানুষ স্বরাজ সরকারকেই খাজনা দেয়।

কাব্যতীর্থ যেমন ব্যস্ত; তেমনি প্রবীর মাস্টার। এক এক ক'রে ত্রিশটি গ্রামের পঞ্চায়েৎ প্রায় তৈরী হয়ে এল, সব মিলিয়ে তৈরী হবে এক মহাপঞ্চায়েৎ। তারই পরিকল্পনা নিয়ে গ্রামে গ্রামে সংগঠনের কাজ ক'রে ফিরছেন যেমন কাব্যতীর্থ, তেমি প্রবীর মাস্টার। দু'বেলা কুমোর পাড়ায় গিয়ে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থেকে একটা জয়ন্তী মূর্তি তৈরী করাচ্ছেন কাব্যতীর্থ, মূর্তিটাও প্রায় শেষ হয়ে এল। মহাপঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠার দিনে ঐ জয়ন্তী মূর্তিরও প্রতিষ্ঠা হবে।

এমন দিনও যায়, যেদিন হয়তো দু'জনের একজন কাঞ্চীপুরে ফিরে আসেন, আবার এমন দিনও যায়, যেদিন দু'জনের একজনও ফিরে আসেন না। শুচি তার চিরকেলে অভ্যাসের দোষে কখনো উনুন নিভিয়ে ব'সে থাকে, কখনো উনুন জ্বালেই না। কাব্যতীর্থের ফিরে আসা পর্যন্ত শুচির ক্ষুদ্র গেরস্থালীর প্রাণ উপবাসী হ'য়েই থাকে।

শিশুভবনের উঠোনে তুলসী ঝারির পাশে একটা সুউচ্চ বাঁশের মাথায় ত্রিবর্ণ পতাকা ওড়ে চঞ্চল হয়ে। সোমার মনটাও আনন্দে চঞ্চল।

কাঞ্চীপুর স্বরাজ সরকারের কাছ থেকে প্রথম মাইনে পেয়েছে সোমা, ষাটটি টাকা। এ সৌভাগ্যের আনন্দ যে চেপে রাখা যায় না। এ তো

চাকরি করার মাইনে নয়, কৃতার্থ কাঞ্চীপুরের হৃদয়ের আশীষ, পরশ পাথরের চেয়েও মূল্যবান।

আজকের আনন্দটাকে চিন্‌তে পারে সোমা। এই তো নির্ভয় আনন্দ। স্বরাট্ কাঞ্চীপুর বাইরের পৃথিবীর মাটি থেকে আল্‌গা হয়ে নিজের মহিমায় ভাস্‌ছে, তারই মধ্যে দ্বীপেশ্বরীর মত চিরকাল বসে থাকবে সোমা। তার একান্তের ভালো-লাগা সংসারটিকে বিড়ম্বিত করার মত যেটুকু আশঙ্কার পথ খোলা ছিল, তাও রুদ্ধ হয়ে গেল। চক্রবেড়ের গলির কোণে একটা একঘরে বাসার হৃদয় মায়ামৃগ হয়ে ডেকে নিয়ে যাবার জন্যে আর কাছে ছুটি আসতে পারবে না। কেঁদে কেঁদে ডাকলেও তার প্রতিধ্বনি এখ পৌঁছবে না। আর, মতিগঞ্জ থেকে কোন বদান্য উপকারী মহাজনে বাহু তাকে উদ্ধার করার জন্যে এই দুর্ভেদ্য দুর্গের অভ্যন্তরেও পৌঁছবে না। পেটের দায়ে চাকুরীপ্রার্থিনী একটি ঘর-ছাড়া বাইশ বছরের মেয়ের স্বাধীন অনুরাগের সম্মান রক্ষার জন্তেই যেন কাঞ্চীপুর স্বাধীন হয়ে গেল। সোমার বিস্ময় নির্ভয় আনন্দে ভরে ওঠে।

প্রতিদিনের মত আজকের সকালেও ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়াতে বসেছিল সোমা। এই তিনটি মাসের মধ্যেই সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার কিছু না কিছু শিখেছে। মাধাই বেশ অঙ্ক করতে পারে, নেপাল লিখতে পারে ভাল, বানান ভুল খুব কমই হয়। সুমন্ত গান গায় বেশ। মনু, পবন, চারি, বিন্দু, অতসী, নারাণ, বিশু, হরি—এর মধ্যে সকলেরই অন্ততঃ অক্ষরজ্ঞানটুকু হয়েছে। শুধু মূর্খ রয়ে গেছে জনা। ভোলার কথা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, নেহাৎ দুধের ছেলে। কিন্তু জনার মাথায় সামান্য ক-অক্ষর জ্ঞানও আজ পর্যন্ত ভাল ক'রে ঠাঁই পেল না।

গল্প ক'রে মুখে মুখে অঙ্ক শেখাবার চেষ্টা করছিল সোমা। ছেলে-মেয়েরা মন দিয়েই শুনছিল। হঠাৎ জনা উঠে দাঁড়ায়।

সোমা বিরক্ত হয়ে বলে—উঠ্‌লে কেন জনা?

জনা আম্‌তা আম্‌তা করে বলে—ভোলা।

সোমা—এখন ভোলা আবার কি ?

জনা—ভোলা পড়ে গিয়েছে।

সোমা—কখন্ পড়লো ?

জনা—এখুনি, শব্দ হয়েছে।

সোমা একবার ঘরের বাইরে গিয়ে দাওয়ার ওপর দাঁড়ায়। দেখতে পায়, দক্ষিণ ঘরের নীচু বারান্দাটার ওপর একটা পিঁড়ি নিয়ে বোধ হয় খেলতে খেলতে পড়ে গেছে ভোলা। ভোলার কিছুই হয়নি, হয়তো পিঁড়িটাই নীচে প'ড়ে গিয়ে শব্দ করে থাক্‌বে।

সোমা আবার পড়ার ঘরে ফিরে আসে, জনা তখনও উৎকণ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনার মুখের দিকে তাকিয়ে সোমা হতাশভাবে বলে—এরই মধ্যে এত শব্দ-জ্ঞান হ'লে আর অক্ষর-জ্ঞান হবে কোত্থেকে ?

ঠিক বোধহয় জনাকে এই প্রশ্ন করছিল না সোমা। অত্যদ্ভুত রহস্যময় এক বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে সোমা হতাশভাবে তার নিজেরই জ্ঞানবুদ্ধির ক্ষুদ্রতাটুকু স্বীকার করে নিচ্ছিল। জনাকে দেখে আরও কতবার বিস্মিত হয়েছে সোমা এবং সে বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে জনারই ওপর মাঝে মাঝে রাগ করেছে।

সোমা রাগ ক'রেই জনাকে মুক্তি দেয়—যাও।

কিন্তু জনা যদি এখানে না থাকতো ? ভোলার দশা কি হতো, তাই একবার কল্পনা ক'রে দেখে সোমা। ভোলার ঘুমন্ত বুকের স্পন্দন কে-ই বা এমন ক'রে পাহারা দিত, সব দুঃশব্দের আঘাত থেকে ভোলাকে নিরাপদ ক'রে রাখবার জন্যে কে-ই বা এমন ক'রে কান পেতে থাক্‌তো, ঘুম পাড়াতো, স্নান করাতো, কোলে কাঁখে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াতো ? জনা যেন ক্ষণে ক্ষণে এক অযোগ্য গুরুমার ভয়ংকর ত্রুটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তাই জনাকে দেখতে মাঝে মাঝে ভয় করে সোমার।

একরত্তি মেয়ে জনাকে এই দুর্ভর দায়িত্ব থেকে অনায়াসে মুক্ত ক'রে দিলেই তো পারে সোমা, স্বয়ং দায় বুঝে নিয়ে। তাহ'লে আর জনাকে ভয় করবার কিছু থাকে না। ভোলাকে এমনি দেখাশুনা করবার, নিকার তৈরী করে দেবার, আধসের দুধ বাড়িয়ে দেবার দায়িত্ব সোমা গ্রহণ করেছে ঠিকই, কিন্তু কোলে নেবার দায়িত্ব নিতে পারেনি। ঠিক স্নেহাশ্রিত নয়, স্নেহবলিভুক্ জীবের মত ভোলা সোমার সান্নিধ্য থেকে একটু দূরে দূরেই সরে আছে। সোমার এত দুঃসাহসী মনুষ্যত্বের কাছে ভোলা আজও অস্পৃশ্য হয়ে রয়েছে, এটাই আশ্চর্য। এই সংস্কারের অপরাধকে একেবারে চাপা দিয়ে নিজের মনের মধ্যেই গোপন করে রাখতে চায় সোমা। কিন্তু চাপা থাকতে পারে না, এই জন্যই অহরহ ধরা পড়িয়ে দেয়। সোমাই না একদিন শুচিদির সংস্কারকে বিদ্রূপ করেছিল? আর নিজে? গুরুমা হয়ে'ও আজ ভোলার মত কিসলয় দেহের স্পর্শকে অভ্যর্থনা করতে কেন পারলো না সোমা? সোমা নিজের কাছে অস্বীকার করে না, কত বড় একটা ফাঁকিকে সে তার চেতনার গভীরে পুষে রেখেছে, বিনা কারণে, বিনা যুক্তিতে। শুধু একটা অভ্যস্ত সংস্কারের দোষে।

কাব্যতীর্থের আশ্বাসমন্ত্রে বড় খুশী হয়েছিল সোমা, যেটা নিজে সত্য বলে বুঝবে সেটাই একমাত্র পথ। বড় সহজ ও সুসাধ্য মন্ত্র ব'লে মনে হয়েছিল সোমার। আজ মনে হয়, কী কঠিন দুঃসাধ্য এই মন্ত্রের নির্দেশ। সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রেও যে সেপথে এগিয়ে যেতে বুক কাঁপে, পুরণো মিথ্যেগুলিই পুরণো মায়ার মত পেছন দিকে টানে। সোমা বুঝতে পারে, অগ্নিপরীক্ষা ছাড়া বোধ হয় এই ভীরু মনের শুদ্ধি হয় না। হয়তো তাই আছে কপালে। শুচিদির মতই বিশ্বাস করে সোমা, এই ভুল একদিন ভাঙবে। কিন্তু ভয় করে, কিভাবে ভাঙবে কে জানে।

আবার গল্প ক'রে ছেলেমেয়েদের অঙ্ক শেখাবার চেষ্টা করে সোমা,

কিন্তু না গল্প না অঙ্ক, তেমন ক'রে কিছুই জমে উঠছিল না। বাইরেও একটা সোরগোল শোনা যায়, গ্রামের লোকজন যেন ছুটাছুটি করছে।

তারার মা হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে আসে—সেই ছায়া ধরা পড়েছে গুরুমা।

সোমা বিশ্বাস করতে চায় না—কি বলছো? সত্যি?

তারার মা—হ্যাঁ গো, বাণীপীঠের উঠোনে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

সোমা আরও কৌতূহলী হয়ে ওঠবার আগেই বাণীপীঠের কয়েকটি বিদ্যার্থী ছেলে ছুটে এসে একেবারে দাওয়ার ওপর উঠে ডাকে—গুরুমা।

সোমা—কি খবর?

ছেলেরা বলে—পণ্ডিত মশাইও নেই, মাস্টারমশাইও নেই, আপনি চলুন। সেই ছায়া ধরা পড়েছে, আপনি বিচার করবেন।

—চল। সোমা ছেলেদের সঙ্গে ব্যস্তভাবে অগ্রসর হয়। অদ্ভুত এক ঘটনার নাটক, সোমাও যেন তার মধ্যে আরও নাটকীয় এক ভূমিকা গ্রহণ করার জন্যে বাণীপীঠে পৌঁছে যায়।

বাণীপীঠের আঙিনায় আতাগাছটার সঙ্গে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়ে ধুঁকছিল মাণিক চৌকীদার। আজ ভোরবেলাতেই মনসাসীজের বনে এই নিশাচর ছায়াকে ধরে ফেলেছে সদানন্দ।

মস্ত বড় একটা ভিড় জমে উঠেছিল! একটা আক্রোশের ঝড় যেন চারদিক থেকে ঘিরে মাণিক চৌকিদারের কলুষিত হৃদ্‌পিণ্ডকে উপড়ে লুট করে নিয়ে যাবার জন্য ছট্‌ফট্ করছিল। মাণিক চৌকীদারের পকেট থেকে এক গাদা নোট আর অনেকগুলি কাগজপত্রও পাওয়া গেছে, মতিগঞ্জ সদর কোতোয়ালীর নানারকম নির্দেশ, নোটিশ, সার্টিফিকেট ও চিঠি।

আহত অথচ অসহায় নেকড়ের মত মাণিক চৌকিদারের চোখ দুটো মাঝে মাঝে রুদ্ধ হিংসার জ্বালা লুকিয়ে মিট মিট করে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। দু'কান আর নাক দিয়ে তখনো রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল।

সদানন্দ আর রাতভিখারী কানা ফটিক ওকে মেরে আধমরা করেই মনসাসীজের বন থেকে এতটা পথ হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে।

মাণিক চৌকিদারের মূর্ত্তির দিকে তাকিয়েই সোমার মুখটা যন্ত্রনাক্ত হয়ে ওঠে।—ইস, একে এমন করে মেরেছে কে ?

জনতার ভেতর থেকে কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না, সোমা আবার জিজ্ঞেস করে—একে এমন করে বেঁধেছো কেন, ও কে ?

সদানন্দ উত্তর দেয়—মাণিক চৌকিদার ?

সোমা—ও কি দোষ করেছে ?

সদানন্দ একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠে—ও কি দোষ করে নাই, সেই কথাটা জিজ্ঞেস করুন গুরুমা। থানার সব লোক পালিয়ে গেল, এই প্রেতটা শুধু আমাদের সর্বনাশ করার জন্যে রয়ে গেছে। অনেক কষ্ট করে ওকে ধরেছি গুরুমা।

আর একজন বলে—ও হ'লো গবরমেণ্টের চর। মতিগঞ্জের কোতোয়ালীতে গিয়ে আমাদের সব খবর দিয়ে আসছে। দেখছেন তো কত টাকা বকসিস পেয়েছে হারামজাদা।

সোমা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। জনতাও নিঃশব্দ হয়ে যেন সোমার নির্দেশের অপেক্ষা করছিল। সোমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—ওর বাড়ি কোথায় ?

কাণা ফটিক উত্তর দেয়—ওর বাড়ি হলো উত্তর ঠাকুরপুর, আমাদের স্বরাজ সরকারের তল্লাটে নয়।

সোমা—ওর কে কে আছে ?

কাণা ফটিক—মাগ আছে।

সোমা—আর কেউ নেই ?

কাণা ফটিক—এই তো মাত্র বছরখানেক হ'লো ব্যাটা বিয়ে করেছে। আর কেউ নেই।

জনতা আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে থাকে। সদানন্দ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করে—কি আজ্ঞা হয় গুরুমা ?

সোমা বলে—ছেড়ে দাও।

সদানন্দ প্রায় চিৎকার করে উঠে—গুরুমা ?

সোমা—ছিঃ, এসব ভাল নয়। ওকে এক্ষুণি ছেড়ে দাও।

বিদ্যার্থী ছেলেরা মাণিক চৌকিদারের হাত-বাঁধা দড়ি খুলে দেয়। মাণিক্ চৌকিদার আস্তে আস্তে টান হয়ে উঠে দাঁড়ায়, এক পা দু'পা করে এগিয়ে যায়। জনতার চক্র থেকে কিছুদূর এগিয়ে মাঠের ওপর পড়তেই তীরবেগে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায় মাণিক।

সদানন্দ ক্ষুব্ধভাবে বলে—আপনি ভুল করলেন গুরুমা।

•

কোথায় কি ভুল হলো, তা নিয়ে কোন চিন্তা করেনি সোমা। আর ভুল হলেই বা কি ? সোমা জানে, তার সকল ভুল এখানে ক্ষমা ক'রে দেওয়াই আছে। রাজ্যটি বেশ, চাইলেই উপহার পাওয়া যায় আশাতিরিক্ত, আর ভুল করলে কোন জরিমানা নেই।

সন্ধ্যা বেলাটা শুচিদির বাড়ি একবার ঘুরে আসবে মনে করেছিল সোমা, একটু খোঁজ খবর জানবার জন্যে। নরসিংহের ভক্ত তো এখন শান্ত হয়েছে, কিন্তু আজ তিনদিন হলো কাঞ্চীপুর ফিরে আসে না কেন ? তার অনেক কাজ, কিন্তু তার চেয়ে বেশী কাজের মৌমাছিরাও সারাদিনের গুঞ্জনের পর একবার মধুনীড়ে ফিরে আসে। এই মানুষটির স্বভাবটি কি একেবারে অসাধারণ ? চোখের চাউনী দেখে তো সে রকম মনে হয় না।

শুচিদির বাড়ি আর যাওয়া হলো না। ঝড় উঠলো সন্ধ্যে থেকেই, দিক অন্ধকার ক'রে গুড়ো গুড়ো বৃষ্টির ঝাপ্টা ছুটিয়ে।

তারপর গাঢ়তর অন্ধকার, ঘনতর বর্ষণ, দক্ষিণের আকাশটা যেন

শতচ্ছিন্ন হয়ে মত্তবেগে তরুলতার পৃথিবীতে মুহূর্তে মুহূর্তে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে। মাটি কাঁপে, মাটির মানুষের বুক কাঁপে। বায়ুজগতের পরমাণুগুলি যেন পাগল হয়ে অবিরাম আর্তনাদের প্রবাহের মত এক মহা অস্তিমের আহ্বানে ছুটে চলে যাচ্ছে হু হু ক'রে।

তারার মা আজ আর রান্না করতে পারলো না। শিশুভবনের বড় ঘরটির ভেতরে ছেলেমেয়েরা গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রইলো। জেগে রইল সোমা, অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্নের মত অভিভূত ভাবে। জেগে রইল তারার মা, সতর্ক চোখ মেলে আশঙ্কায়।

রাত্রি বেশী হয়নি, বাণীভবনের কয়েকটি বিদ্যার্থী ছেলে এসে জানিয়ে গেল—ভয় নেই। ঝড়ও মৃদু হয়ে আসে, বর্ষণও যেন কিছুটা ক্লান্ত হয় এবং ধীরে ধীরে কাঞ্চীপুরের ঘরে ঘরে ঘুমের আবেশও নেমে আসে।

কিন্তু কোথা থেকে ঘুমন্ত নিশিথিনীর পাঁজরের ওপর দিয়ে সুতরল ছন্দে এক ক্রূর খরজলের কল্লোল ছুটে আসে। খাল ছাপিয়ে ওঠে, ক্ষেত ডুবে যায়, মাঠ প্লাবিত হয়। ঠাকুরপুরের বিলটা ছাপিয়ে জলের তোড় এসে প্রথম ধাক্কা দিল পুরনো রাসমঞ্চের ভাঙ্গা স্তূপের গায়ে। ঘুম ভাঙ্গা চোখে সারা কাঞ্চীপুরের প্রাণ হঠাৎ মাঝ রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠছে—খরা জল! খরা জল! তারার মা চিৎকার করে ওঠে—ভগবান, ভগবান। জন্না জেগে উঠেই ভোলাকে আঁকড়ে ধ'রে কোলে নেয়।

সোমা ঘরের বাইরে এসে দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে দূরের দিকে একবার তাকাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এখন আর কোন দূরও নেই, দিকও নেই। জগৎজোড়া এক নিরন্ধ্র তমিস্রার বক্ষ ভেদ করে শীতল মৃত্যুর স্রোত সব ভাসিয়ে দেবার আবেগ নিয়ে ছুটে আসছে। অচঞ্চল পাষাণ পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে থাকে সোমা, ভয় করতে ভুলে যায়।

অনেকগুলি লণ্ঠন আর জলে-ভেজা মানুষের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি

শিশুভবনের আঙিনায় এসে ঢোকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। শিশুভবনের দাওয়ার ওপর উঠেই সোমাকে দেখতে পেয়েই কাব্যতীর্থ বলেন—ভয় নেই।

প্রবীর মাস্টার, শুচিদি, বাণীপীঠের বিদ্যার্থী ছেলেরাও এসেছে।

কাব্যতীর্থ বলেন—ভয় নেই, জল বাড়্‌বে না। আর যদি বাড়্‌তে থাকে, তবুও ভয় নেই। সবাই সড়ক ধরে হেঁটে গিয়ে নরসিংহতলায় গিয়ে উঠবো। তৈরী থাক।

বিদ্যার্থী ছেলেরা শিশুভবনের এক একটি শিশুর হাত ধরে তৈরী হয়ে থাকে।

শিশুভবনের গুরুমা আখ্যাধারিণী এই কলকাতার মেয়েটিকেও কাব্যতীর্থ বোধ হয় শিশুই মনে করেন। কাব্যতীর্থ নির্দেশ দেন—প্রবীর, তুমি লণ্ঠনটা আমাকে দিয়ে সোমার হাত ধর।

সোমা একটু বিব্রতভাবে উত্তর দেয়—আমি ঠিক আছি।

শুচি সোমার দিকে এগিয়ে এসে কানের কাছে আস্তে আস্তে বলে—খুব খারাপ লাগছে, না সোমা?

সোমা বলে—না শুচিদি।

সবাই তৈরী হয়েই থাকে অনিশ্চিতের প্রতীক্ষায়, স্থির হয়ে নিঃশব্দে। এর মধ্যে শুধু কাব্যতীর্থ দাওয়ার এদিক ওদিক ধীরে ধীরে পায়চারী করে বেড়াতে থাকেন। সুষুপ্ত কাঞ্চীপুরের হঠাৎ আক্রান্ত মাটি ও মানুষের আর্তরোলের মধ্যেও মাঝে মাঝে কাব্যতীর্থের সুললিত কণ্ঠস্বরের আবৃত্তি শোনা যায়—মহাগভীর নীরপূত পাপধূতভূতলম্……।

প্রতীক্ষার সমস্ত মুহূর্তগুলিকে যেন স্বর শুনিয়ে বিদায় দিতে থাকেন কাব্যতীর্থ এবং রাত্রি ভোর হয়ে আসে।

*

ভোর তো হলো, কিন্তু চারদিকে তাকালে চোখে যেন চিরতিমির-রাত্রির বিভীষিকা নেমে আসে। যদিও কাঞ্চীপুর নিজে কোনমতে প্রাণে

বেঁচে গেছে, কিন্তু এই খলপ্লাবন কাঞ্চীপুরের গায়ে যেন শ্মশানের বীভৎসতা মাখিয়ে দিয়েছে। কত গাঁয়ের কুটীর থেকে কত মানুষের প্রাণ একটি রাত্রির বিভীষিকার স্রোতে কোথায় যে মিলিয়ে গেল কে জানে। এখনো দেখা যায় কাঞ্চীপুরের মনসাসীজের বনে নানা দিক থেকে ভেসে এসে গলিত শব আটকা পড়ে আছে, ঝোপেঝাপে ক্ষেতে-বাদাড়ে। এখানে ওখানে শকুনির সমারোহ। ঠাকুরপুরের বিলে শত শত মরা গরু বয়ার মত ভেসে বেড়ায়। গোলার ধান ভেসে গেছে, ক্ষেতের ধান লোনা জলে জ্বলে গেছে। তৃষ্ণা মেটাতে এক আঁজলা মিষ্টি জল খাবার জন্যে মানুষ ছুটে বেড়ায় দিগ্বিদিকে ছন্নছাড়া হয়ে।

কোথায় নবগ্রামের এতবড় গোচারণ ভূমি আর বেণাঘাসের সুগন্ধ। এক বিরাট পঙ্কিল দহের মত পড়ে আছে আজ। পলাশতলার পাশে ক্ষেতগুলি আর ক্ষেত নেই, জলা হয়ে গেছে। একটি রাত্রির তরল বিভীষিকাকে প্লাইকারী মৃত্যুর উপঢৌকন দিয়ে, নিঃস্ব নিরন্ন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে, এক শোকার্ত শূন্যতাকে সম্বল করে পড়ে রইল কাঞ্চীপুর স্বরাজ সরকারের রাজত্ব।

বিদ্যার্থী ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে সারাদিন ধ'রে কাঞ্চীপুরের ঝোপঝাপ ও প্লাবিত ক্ষেত থেকে মড়া কুড়িয়ে সংকারের ব্যবস্থা করে প্রবীর মাস্টার। পলাশতলার উঁচু ডাঙাটা চিতাময় হয়ে ওঠে। দহেয়ং সর্ব্বগাত্রানি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু—সারাদিন ধ'রে চোখের জল মুছতে মুছতে শোকস্তোত্রের মন্ত্র পাঠ করেন কাব্যতীর্থ। মুখ দেখে নাম গোত্র চিনতে না পারলেও, ভিন্ গাঁয়ের এই সব নর নারী ও শিশুর মূর্ত্তিগুলি যে তাঁরই আত্মার আত্মীয়, যাদের ঘরে-ঘরে ও কানে-কানে আজ বিশ বছর ধ'রে তিনিই তো বেঁচে থাকার বাণী শুনিয়ে আসছেন।

শুধু চেনা গেল একটা মুখ। কাণা ফটিকের কান্নার শব্দ শুনে কাঞ্চীপুরের লোকজন পুরণো রাসমঞ্চের স্তূপের কাছে ছুটে গিয়ে ভিড়

ক'রে। টান ক'রে খোঁপা বাঁধা, খোঁপায় বেলকুঁড়ি গোঁজা, একটী তরুণীর শব ভেসে এসে রাসমঞ্চের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে ছিল। কানা ফটিক চেঁচিয়ে কাঁদে—আমার খাঁদি।

চণ্ডীখোলায় হাজ্‌রা বাড়ীতে অষ্টমীর পূজো দেখতে গিয়েছিল কাণা ফটিকের মেয়ে খাঁদি। গিয়েছিল হেঁটে হেঁটে হাসতে হাসতে, ফিরে এসেছে নিষ্প্রাণ হয়ে ভাসতে ভাসতে। কিন্তু এখনো তার নিটোল খোঁপায় এক গ্রামতরুণীর উৎসবসজ্জার রেশটুকু যেন অটুট হয়ে আছে, প্লাবনে একেবারে গলে যেতে পারেনি। শোকক্লান্ত কাব্যতীর্থ আর একবার চিতাগ্নির পাশে দাঁড়িয়ে দিব্যলোকের বাণী উচ্চারণ করেন।

প্লাবিত কাঞ্চীপুরের শ্মশান থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে সদর মতিগঞ্জের এস্‌ ডি-ও নামক সিভিলিয়ান বিধাতাটি যেন এতদিন ধরে এই শুভ মুহূর্তটির অপেক্ষায় বসেছিলেন। ভারত গভর্নমেণ্টের গোপন সার্কুলার অনুযায়ী সব রকম স্ট্রাটেজিক ক্রূরতা দিয়ে, পাঁচশত স্পেশাল পুলিশ আর দশ নম্বর বেলুচ রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটালিয়ন দিয়ে ত্রিশটা বিদ্রোহী গ্রামের চারদিকে এইবার এক সশস্ত্র হিংসার মেখলা রচনা করেন। প্রতি ঘাটে ও পথের মুখে পুলিশ ও মিলিটারির ঘাঁটি বসে, যেন একটি চালের কণিকাও এই মহাপাতক উপদ্রুত অঞ্চলে প্রবেশ করতে না পারে। এক গজ কাপড় নয়, এক শিশি ওষুধ নয়। বিদ্রোহী কাঞ্চীপুরের হৃৎপিণ্ডকে সকল দিক দিয়ে অবরোধ ক'রে মহামারী অনশন ও উলঙ্গতার অভিশাপে সন্ত্রস্ত করে তুলতে হবে।

আরম্ভ হয়, এত মহত্ত্বে গরীয়ান ও এত দুঃসাহসে উজ্জ্বল কাঞ্চীপুরের অদৃষ্টে আর এক আত্মাহুতির অধ্যায়। প্রতি দিনে, প্রতি মুহূর্তে তিল তিল ক'রে ক্ষয় হয়ে যাবার পালা। এত শান্ত ও অবিচল কাব্যতীর্থও যেন উতলা হয়ে পড়েছেন। নরসিংহভক্ত প্রবীর মাষ্টারের মুখে হাসির লেশ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এক সপ্তাহ না যেতেই সমগড়ের লোকেরা শাপ্‌লা খেতে আরম্ভ করে। ঠাকুরপুরের প্রায় অর্ধেক লোক গ্রাম ছেড়ে চলে যায় রেল লাইন পার হয়ে। পলাশতলার কংগ্রেস শিবিরে দিবারাত্রি নরনারীর জনতা লেগেই থাকে—কিছু চাল দাও, একটা কাপড় দাও।

দেখতে দেখতে একটি মাসের মধ্যে কী হয়ে গেল গ্রামের রূপ? ভগ্ন কুটীর, গলিত ভিটা, নিস্তব্ধ ঢেঁকিঘরে শেয়াল ঘুমোয়। শুধু কাব্যতীর্থ আর কর্মীর দল চারদিকে ছুটোছুটি করে বেড়ায়—ভয় নেই, ভয় নেই।

ক্ষণিকের মত যেন নির্ভয় হয়ে ওঠে কাঞ্চীপুর। সমগড়, সপ্তবাটি, নবগ্রাম, ঠাকুরপুর ও আর সব। স্বরাট্ কাঞ্চীপুরের প্রাণ পরাভব মান্‌তে চায় না। যার ঘরে যা আছে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে প্রতি গ্রামের পঞ্চায়েৎ ধর্মগোলা তৈরী করে। অর্ধাশনে হোক বা অনশনে হোক, সব দুর্বিপাক সবার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেবার জন্যে কাব্যতীর্থ গ্রামে গ্রামে আর এক আত্মরক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরে বেড়ান।

প্রবীর মাস্টার তিনটে দিন এদিকে ছিল না। কাব্যতীর্থের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিল। আজই ফিরে এসেছে, সোমা একবার ডেকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই সে আবার কোথায় চলে গেছে।

কাঞ্চীপুরের রাত্রির জ্যোৎস্নায় আজকাল পাখি কাঁদে। আর অন্ধকারে?

কাঞ্চীপুর থেকে একটি রাত্রির অন্ধকারে তিন দিনের অনশনশয্যা থেকে উঠে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয় দাগী সদানন্দ। এক টানা হেঁটে গিয়ে নরসিংহতলার মন্দিরের দরজাটা সন্তর্পণে ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলে। কোমর থেকে বার করে একটা কাটারি। পাথুরে নরসিংহের বড় বড় দুটো রূপোর চোখ কাটারির মুখ দিয়ে দুটি আঘাত দিয়ে উপ্‌ড়ে তুলে নিয়ে গামছায় বাঁধে। এক দৌড়ে মন্দির ছেড়ে আবার অন্ধকারে মিশে যায় সদানন্দ।

আরও অনেক অন্ধকারের ঘটনা, এক এক করে খবর আসতে থাকে। ডায়মণ্ডহারবার থেকে চাল নিয়ে নৌকাটা রাত্রির অন্ধকারে প্রায় ময়রাকালিন্দীর জলে এসে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু ধরা পড়ে যায়। ঘাঁটির পুলিশ গুলি চালিয়েছে, রঞ্জনী ও সনাতন মারা গেছে, একমাত্র অনন্ত নদী সাঁতরিয়ে কোনমতে পালিয়ে আসতে পেরেছে। চাল বোঝাই নৌকাটা ময়রাকালিন্দীর জলেই ডুবিয়ে দিয়েছে পুলিশ।

কাব্যতীর্থের সারা মুখটা কেমন যেন হয়ে গেছে, চামড়াগুলো কুঁচকে গেছে ভাঁজে ভাঁজে। গুচির কণ্ঠাস্থি দেখবার মত জিনিস। তবু কাব্যতীর্থ বলেন—ভয় নেই।

এমনি আর একটি সন্ধ্যার অন্ধকারে এক বস্তা চাল নিয়ে শিশুভবনে এসে প্রবীরও বলে—ভয় নেই, এক বস্তা চাল দিয়ে গেলাম। এবার থেকে একটু সামলিয়ে কম কম করেই খরচ করবে সোমা।

এমন ভয়ংকর আশ্বাস শোনবার জন্যে বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না সোমা। প্রবীরের হাত ধরে হঠাৎ ভয়ার্ত স্বরে বলে—এ কী সর্বনাশ আরম্ভ হলো চারদিকে?

সোমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে প্রবীর। আবার আশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করে—ভয় করছে বুঝি সোমা?

মুহূর্তের মধ্যেই সোমা নিজেকে সাম্‌লে ফেলে, আর সহজভাবেই উত্তর দেয়—না।

প্রবীর—এবার আমি যাই?

সোমা—না।

সোমা দেখতে পায়, প্রবীরের চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল, সারা মুখ যেন একটা দুঃসহ প্রদাহের আঁচ লেগে কালো হয়ে গেছে।

সোমা জিজ্ঞেস করে—শুন্‌লাম এখান থেকে আরও দক্ষিণে খুব বেশী রকম বন্যা হয়ে গেছে?

প্রবীর—হ্যাঁ।

সোমা—তোমার বাড়ির খবর কিছু জানতে পারলে ?

প্রবীর—জানতে হয়নি, নিজে গিয়েই দেখে এসেছি।

সোমা—বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা হলো ?

প্রবীর—হ্যাঁ।

সোমা—কেমন আছেন ?

প্রবীর—মরে গেছেন।

সোমা বিচলিতভাবে অনুনয় ক'রে বলে—অন্ততঃ আমার সঙ্গে অমন আবোল-তাবোল ক'রে বলো না প্রবীর। কি হয়েছে বল ?

প্রবীর—দেখলাম, বাবা-মা দু'জনেই আমারই তৈরী কুমড়ো মাচানের নীচে একসঙ্গে ম'রে পড়ে আছেন, একেবারে ভেসে যাননি। বাবার একটা হাত মা'র একটা হাতের সঙ্গে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে, তাও দেখলাম।

সোমা ঢোঁক গিলে যেন একটা নিঃশ্বাস আটক করে রাখে।—আর তোমার ভাই শ্যামু ?

প্রবীর—হয়তো ভেসে গেছে, কিংবা কোথাও পালিয়ে গেছে, কোন খবর পেলাম না।

যেন একটা তদন্তের রিপোর্ট নির্বিকারচিত্তে পড়ে শোনাচ্ছে প্রবীর, লাল চোখে একটু সজলতার বাষ্পও দেখা দেয় না।—কিছুদিন থেকে বাবা খুবই অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন, মা ধ'রে না ওঠালে উঠতেও পারতেন না। কাজেই, বানের সময় বাবা যাতে কাছছাড়া না হ'য়ে পড়েন, সেই জন্যেই বোধ হয়···যাক্, আমি কথা দিয়েছিলাম একদিন দেখতে যাব, দেখে এলাম।

সোমাও মনোযোগী শ্রোতার মত কান পেতে সুস্থির ভাবে এই কাহিনীকে নিছক একটি রিপোর্ট রূপেই সহ্য করার চেষ্টা করে। অশ্রুপাত

এখানে নিরর্থক। তা ছাড়া, চোখ পুড়ে গেলে চোখে জল আসতেও পারে না।

সোমা বলে—তোমাকে সান্ত্বনা দেব, এ সামর্থ্য আমার নেই। তোমার এই দুঃখের ইতিহাসকে অভিনন্দন জানাবো, এমন উঁচুদরের নির্মমতাও আমার নেই। তোমাকে দেশের কাজে আরও উৎসাহ দিতে পারি, সেই অনন্ত দেশপ্রেমও আমার নেই। তোমাকে সব আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারি, সে শক্তিও আমার নেই। তাই আজ……।

সুগভীর নিঃশ্বাস টেনে বুকের ভেতর একটা নিরুত্তর শূন্যতার মধ্যে সব কথা এক কথায় ব'লে দেবার ভাষা খুঁজতে থাকে সোমা। চোখ বন্ধ করে খুবই আস্তে আস্তে সোমা বলে—আজ আমি শুধু এই প্রার্থনাই করছি প্রবীর, তুমি ভেঙে পড়ো না, তোমার সমস্ত জীবনের সহ্যের শক্তি নিয়ে তুমি বজ্র হয়ে যাও।

প্রবীর বলে—এবার আমি উঠি।

আজ এক নবাগন্তুক ভদ্রলোক দেখা দিয়েছেন কাঞ্চীপুরে। চারদিকের সুকঠিন মিলিটারী ব্যূহের বাইরে থেকে এই প্রথম একজন কাঞ্চীপুরে এসে পৌঁছতে পারলেন। এস-ডি-ওর সহিকরা ছাড়পত্র সঙ্গে ছিল বলেই ইনি আসতে পেরেছেন। ইনি হলেন কাব্যতীর্থের স্ত্রী শুচির দাদা।

মতিগঞ্জ সহরেই শুচির দাদার মস্তবড় কাপড়ের দোকান। শুচির মা দাদা, বৌদি সবই এখন থাকেন মতিগঞ্জে। শুচির বাবা মারা যাবার পর থেকে দেশগাঁয়ে আর কেউ থাকে না, যায়ও না।

কাঞ্চীপুরের বন্যা আর দুর্ভিক্ষের খবর শুনেই দাদা এসেছেন বোনকে দেখতে এবং মা বলে দিয়েছেন, যেমন করে হোক, শুচিকে ধরে নিয়ে

যেতে। আরও আগেই দাদা হয়তো আসতেন, কিন্তু ছাড়পত্রের জন্তে তদ্বির করতে করতে এতদিনে সফল হবার পর আসবার সুযোগ পেয়েছেন।

শুচির মতিগতির পরিচয় শুচির মা ভাল করেই জানেন। তাই একটা চিঠিও দিয়েছেন—আমার খুব কঠিন অসুখ। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। পত্র পাঠ তোমার দাদার সঙ্গে চলে আসবে।

শুচির মা তাঁর জামাইকেও ভাল করে জানেন। তাই বলে দিয়েছেন—ঐ পাগলকেও আসতে বলবি যতী, যদি আসে তো ভালই, নইলে শুধু আমার মেয়েকে নিয়েই চলে আসবি, যেমন করেই হোক।

দাদাকে দেখে শুচি খুশীই হয়, আর চিঠিটা পড়ে দুঃখিত হয়। প্রশ্ন করে—মার এত কঠিন অসুখ কবে থেকে হলো দাদা?

যতী—হয়েছে, অনেকদিন থেকেই হয়েছে। যা, একটু চা ক'রে নিয়ে আয়।

শুচি হেসে ফেলে—চা? চা কোথায় পাব?

যতী—যা, এক গেলাস গরম জল নিয়ে আয়।

শুচি চলে যায়। শুচির অসাক্ষাতে কাব্যতীর্থকে কয়েকটা কথা বলবার জন্তেই যতীদা এই সুযোগটি তৈরী করে নিলেন।

কাব্যতীর্থ চিন্তিতভাবে বলেন—তাইতো, মা'র অসুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠলো……। অসুখটা কি?

যতীদা একটু গম্ভীর হ'য়ে বলেন—আপনি নিশ্চয় জানেন বিনোদ-দা, আমার দোকানে গাঁট গাঁট কাপড় পড়ে আছে।

কাব্যতীর্থ—তা তো আছেই।

যতীদা—আর আমার বোন এখানে ছেঁড়া কাপড় প'রে রয়েছে।

কাব্যতীর্থ যেন একটু চমকে উঠে বলেন—হ্যাঁ।

যতীদা—আপনি জানেন তো, আমার বাড়িতে এখনো কত অচেনা অনাত্মীয় নিছক বসে বসে দু'বেলা ভাত খায়?

কাব্যতীর্থ—হ্যাঁ, আমি সবই শুনেছি যতী।

যতীদা—আর, আমার বোন এখানে একবেলাও খেতে পাচ্ছে কি না সন্দেহ, কণ্ঠাস্থি খট্ খট্ করছে।

কাব্যতীর্থ এবার আর কোন উত্তর দেন না।

যতীদা বলেন—এই সব কাণ্ডই হলো মা'র অসুখ, বুঝেছেন?

কাব্যতীর্থ অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভেবে নিয়ে বলেন—বুঝেছি। কি করতে চাও বল?

যতীদা—শুচিকে নিয়ে যেতে চাই, কিন্তু দোহাই আপনার, আপনি বাগ্ড়া দেবেন না।

কাব্যতীর্থ—ছি ছি, আমি বাগ্ড়া দেব কেন?

যতীদা একটু অনুনয়ের সঙ্গে বলেন—বরং আপনি ওকে যাবার জন্যে একটু উৎসাহ দিয়েই বলুন।

কাব্যতীর্থ—নিশ্চয় বল্‌বো। কবে যেতে চাও?

যতীদা—আজই।

কাব্যতীর্থ—বেশ বেশ।

যতীদা এবার কথাগুলি অনেকখানি কোমল ক'রে বলেন—আপনিও চলুন না বিনোদ-দা।

কাব্যতীর্থ—এখন পারবো না ভাই, সুযোগ পেলেই যাব।

যতীদা বেশ বুদ্ধি খাটিয়েই পরিকল্পনাটা করেছিলেন এবং শুচি গরম জল নিয়ে ফিরে আসা মাত্র কাব্যতীর্থও উৎসাহ দিয়ে বললেন—তুমি আজই যতীর সঙ্গে চলে যাও।

সেই মুহূর্ত্ত থেকেই শুচি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে এবং সন্দেহটার কোন অর্থ স্পষ্ট করে ধরতে পারছে না বলেই রাগে ও অভিমানে একটা অনর্থ বাধাবার উপক্রম করেছে।

শুচি বলে—যতীদা আমাকে নিয়ে যেতে তো আসবেনই, কিন্তু তুমি

যেতে বল কেন? কিছু একটা ব্যাপার আছে, নইলে তুমি কোন্ মুখে আমাকে……।

শুচি মুখ লুকোবার জন্যেই অন্য ঘরে চলে যায়। পরক্ষণেই আবার ফিরে আসে। যতীদা সামনে বসে আছে, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সে কথাটাও যেন ভুলে গিয়ে শুচি বলে—তুমি কোন্ প্রাণে আমাকে যেতে বল্‌ছো?

যতীদা বিব্রত বোধ ক'রে ঘরের বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান এবং সেখান থেকেও সরে গিয়ে অপরাজিতার বেড়ার পাশে পাশে ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

কাব্যতীর্থ কোনমতেই শুচিকে বোঝাতে না পেরে অগত্যা প্রবীর ও সোমাকে ডেকে আনতে লোক পাঠিয়েছেন। সাবধানী পরিকল্পনা কুশল যতীদা এই লোকের সঙ্গে সঙ্গে চলে যান। কে প্রবীর কে সোমা, তা তিনি জানেন না। যেই হোক্, সবাইকে সমস্যাটা আগে থেকে বুঝিয়ে দিয়ে সমর্থন আদায় করে রাখা ভাল। একবার কোন মতে শুচিকে এই চক্র থেকে বের করতে পারলে হয়। মা বলে দিয়েছেন—যেমন করেই হোক্…।

সোমা আর প্রবীর না আসা পর্যন্ত শুচি নিঃশব্দে ধৈর্য ধরে বসে থাকে ঘরের ভেতরে, আর কাব্যতীর্থ ঘরের বাইরে বারান্দায়। সত্যিই আজ একটি সত্তা যেন হঠাৎ দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক অতিকরুণ শুব্ধতার মধ্যে পড়ে আছে, এক টুক্‌রো এখানে, আর এক টুক্‌রো ওখানে।

তার মনের গহনে ডুব দিয়ে শুচি একটি প্রশ্নের উত্তর শুধু খুঁজে বেড়ায়—তুমি কি ক'রে আমোকে ছেড়ে দিতে পারছো? আমি খেতে না দিলে তুমি খেতে পার, আমি তোমার মাথায় হাত না দিলে তুমি ঘুমোতে পার, তোমার যে এত গুণ আছে তা তো জান্‌তাম না।

কাব্যতীর্থ দূর আকাশপটের দিকে তাকিয়ে মনে মনে যেন একটা

কামনাকে সম্ভাষণ জানাতে থাকেন—তুমি আকাশগঙ্গা হও, তোমার জীবনের প্রবাহ তুমি নিজের শক্তিতেই ধারণ করে রাখ। তোমার শিব তো আর সত্যিই শিব নয়, তোমাকে ধরে রাখবার শক্তি তার নেই।

প্রবীর ও সোমা একটু ব্যস্তভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মতই এসে ঘরে ঢোকে। দেখ্‌লেই বুঝতে পারা যায়, দু'জনেই যেন জোর ক'রে বেদনাকীর্ণ মুখের ওপর একটা হাসি টেনে রেখেছে কোনমতে।

শুচি একটু আশান্বিত ভাবেই বলে—তোমরাই একবার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস কর তো ভাই, আমাকে হঠাৎ মতিগঞ্জ পাঠাবার জন্যে এত উৎসাহ কেন?

সোমা বলে—মা'র অসুখ হয়েছে, একবার দেখে আসুন।

প্রবীর আস্তে আস্তে আশ্বাসের সুরে বলে—আপনি মতিগঞ্জ ঘুরে আসুন বৌদি, বিনোদ-দার জন্যে ভাববেন না। আমাদের যতদূর সাধ্যি আমরা ওঁকে দেখবো।

একেবারে নিরুত্তর হয়ে মাথায় হাত দিয়ে অবসন্নের মত ব[illegible] থাকে শুচি। যেতেই হবে, সবারই তাই ইচ্ছে, না পাঠিয়ে ছাড়বে না।

যতীদা বুদ্ধিমান মানুষ, তিনি আর সময় দিলেন না। তাঁর ব্যাগটা এক হাতে তুলে নিয়েই উদ্ব্যস্ত হয়ে বলেন—এবার রওনা হওয়া যাক্, এখান থেকে নরসিংহতলা কম দূর তো নয়, সময় মত পৌঁছে সরকারী মোটরবাসে জায়গা নিতে হবে।

শুচিও আর সময় নিল না। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে বারান্দায় পৌঁছে কাব্যতীর্থকে প্রণাম করে। সোমা আর প্রবীরের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবেই বলে—আসি ভাই। যতীদা ততক্ষণে অপরাজিতার বেড়া পার হয়ে পথে দাঁড়িয়েই হাঁক দেন—আয় শুচি।

কাব্যতীর্থ তো এমনিতেই লজ্জা করার নিয়মগুলি মাঝে মাঝে ভুলে

যান। আজও তাই করলেন। শুচির কাঁধে হাত দিয়ে যতীদার পেছু পেছু চলতে আরম্ভ করেন, কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য।

সোমা শুধু দেখছিল, শুচিদির শাড়ির আঁচলটা আর কাব্যতীর্থ মশাইয়ের মুখটা। আঁচলটা সেই প্রথম দিনের দেখার মতই ছেঁড়া ছেঁড়া। আর কাব্যতীর্থ মশাইয়ের মুখটা সেই প্রথম দিনের দেখা ছবির একেবারে উল্টো। কাব্যতীর্থের মত ধৈর্যকঠিন মানুষের মুখও যে এত করুণ হতে পারে, না দেখ্‌লে কল্পনা করতে পারতো না সোমা। কাব্যতীর্থ যেন সত্যিই আধখানা হয়ে গেছেন। তাঁর কাব্য আর নেই, শুধু তীর্থটুকু পড়ে আছে।

ইংরাজ রাজের খর-নখরের ব্যূহ ক্রমেই এগিয়ে আসে কাঞ্চীপুর স্বরাজ সরকারের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে, শাস্তির দাবানল ছড়িয়ে, কংগ্রেস শিবিরগুলি উৎখাত করে, স্কুলবাড়িগুলিকে ভস্মসাৎ করে, গরুবাছুর নীলাম করে, ঘটিবাটী বাজেয়াপ্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত সমগড়ের দশটি নারীর ধর্ম্ম লুঠ করে। তবু ক্ষান্তি নেই, বিষবাষ্পের বৃত্তের মত চারদিক ঘিরে তারা এগিয়ে আসতে থাকে। এস-ডি-ও'র প্রতিভা, দেশী পুলিশের দাম্ভ আর বেলুচি সেপাইয়ের পশুত্ব। তার ওপর, দেখতে দেখতে পায়রাপরীর বনের পাশে খোলা মাঠে একটা গোরা পল্টনের ছাউনিও দেখা দিল।

ঠিক সময় আর সুযোগ বুঝে মিনার্ভা বিল্ডার্সের পরিত্যক্ত ক্যাম্প আবার কলের করাতের শব্দে মুখর হয়ে ওঠে। পায়রা পরীর আদরে লালিত শাল অর্জ্জুন আর ডুমুরগুলিকে যেন কিলখানার জীবের মত দলে দলে হত্যা করা হতে থাকে। চির সবুজ পায়রা পরীর বন দিন দিন ছায়াহীন আর বর্ণহীন হয়ে নেড়া মাঠের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। গ্রামের পুনর্ণবা শুকিয়ে ধূলোয় লুটিয়ে ধূলো হ'য়ে যায়।

সপ্তবাটি একবার মরিয়া হয়ে বাধা দেয়। জেলাবোর্ডের সড়ক আবার কাটা পড়ে, সেতু পোড়ে, মিলিটারী রসদের দুটো নৌকা এক মধ্যাহ্নের দিবালোকেই জনতার আক্রমণে জলে ডোবে।

খর নখরের অভিযান আরও এগিয়ে আসে। এস-ডি-ও স্বয়ং নিজের হাতে নিশুনিয়ার পঞ্চায়েতের ধর্মগোলায় আগুন লাগান, ত্রিবর্ণ পতাকা ছিঁড়ে বুট দিয়ে চেপে চেপে নাচেন। তিনটি টিউবওয়েল চূর্ণ ক'রে দিয়ে, ত্রিশজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলে যান।

গুলি চলে চণ্ডীখোলায়, দীঘির ধারে কচুবনের ওপর মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ে থাকে, হাজরা বাড়ীর তিনটি ছেলে আর কর্মকার বাড়ীর দুটি। বেলুচ সেপাই মৃতদেহের কোমর হাত্‌ড়ে পয়সা খোঁজে। আঙুল কেটে আংটি খুলে নেয়।

নবগ্রাম ক্ষেপে ওঠে এক মাঝরাতে, দুঃস্বপ্নের আগুনের মত। পুলিশ ক্যাম্প জলে ওঠে দাউ দাউ করে, গ্রামজনতার চীৎকার যেন অন্ধকারে প্রেত শিকার করবার জন্য দিকে দিকে তাড়া করে বেড়ায়। পুলিশের দল গা-ঢাকা দিয়ে জলে জলেই হেঁটে পালিয়ে যায়।

মরাকালিন্দীর ভাঁটায় এক হুইস্কির বোট এসে লাগে পায়রাপরীর বনের গায়ে। গোরা ফৌজের নৈশ টহলদারী মত্ত হয়ে উঠে। গাঁয়ের মেয়ে কুটীর ছেড়ে দিয়ে বাঁশবনে রাত কাটায় এবং দেখতে দেখতে একদিন ভরাকুল থানার অভ্যন্তরে আবার দশটি রাইফেল ও দুটি রিভলভারের অগ্নিময় হিংসা উর্দি ভূষিত হয়ে হাসতে হাসতে দপ্তর খুলে বসে। মাণিক চৌকিদার থানার বারান্দায় বসে বিজয় গর্বে তাড়ি খায়।

আর, কাঞ্চীপুরের শিশুভবনে সোমার ঘরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে অনেক্ষণ চুপ করে বসে থাকে মহাপঞ্চায়েতের সকল সংগ্রামের পরিচালক প্রবীর মাস্টার, হাতের কব্জিতে ব্যাণ্ডেজ, কপালে একটা কাটা দাগ।

প্রবীরের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সোমা বলে—অনেক তো হলো, এবার ক'টা দিন একটু ক্ষান্তি দাও। অন্ততঃ গুলির ঘা'টা সেরে নিক্, তারপর।

প্রবীর হাসে—ক্ষান্তি কেমন করে হবে সোমা? এ থামতে পারে না, যতদিন না···।

সোমা—থামলে কেন? কি বলছিলে বল?

প্রবীর—যতদিন না একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যায়।

সোমা তীক্ষ্ণভাবে প্রশ্ন করে,—হেস্তনেস্তটা কি শুনি।

প্রবীর চুপ করে থাকে। সোমার গলার স্বর আরও তীক্ষ্ণ হয়। —তাতে ইতিহাসে তোমার নাম থাকবে। কিন্তু আমার কি?

প্রবীর হেসে ফেলে—তাতে আমারই বা কি? তোমার বদলে ইতিহাসের নামে আমার কোন লোভ নাই।

মৃদু দীপালোকের পেলব স্পর্শে এই মুহূর্তগুলি যেমন মধুর, তেমনি মধুর সোমার পেলবতর স্পর্শ। কাঠুরিয়ার মাণিক কুড়িয়ে পাওয়ার মত প্রবীরের জীবনে আকস্মিক এক উপহার। সোমাকে বুকের কাছে নিবিড় করে টেনে নিয়ে প্রবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—শুধু এরই জন্যে আমি বাঁচতে চাই সোমা, জীবনের হেস্তনেস্ত করতে চাই না।

দুটি ব্যগ্র বাহু দিয়ে ঘেরা এই ক্ষণিক স্বপ্নের আক্রমণের কাছে নিঃশব্দে আত্মসমর্পন করে সোমা। মনে মনেই বলে—এর জন্যেই যে আমিও এই হাহাকারের মধ্যে মরেও বেঁচে আছি।

প্রবীর কথা বলে, কথাগুলি শান্ত হাহাকারের মতই শোনায়—আজ আমি তোমায় চলে যেতে দিতে চাই সোমা, কিন্তু···।

সোমার মনটাও নিঃশব্দে হেসে ওঠে বোধ হয়। এ তো বেশ ভাল কথা। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চলে যেতে বলা!

প্রবীর বলে—কিন্তু তুমি যেও না।

ব্যগ্র বাহু দিয়ে ঘেরা স্বপ্ন হঠাৎ মাত্রা ছাড়িয়ে আকুল হয়ে ওঠে।

তারই মধ্যে, সোমা তার সকল অনুভব দিয়ে নিঃশব্দে বরণ ক'রে নেয় কপালের ওপর একটি নতুন টিপ। বড় উষ্ণ, চন্দনতারার মত স্নিগ্ধশীতল নয়।

প্রবীরের হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হবার জন্যে একটু মৃদু চেষ্টা ক'রে সোমা বলে—এমন ক'রে সব কেড়ে নিলে মানুষ যায়ই বা কি করে?

এ সবের মধ্যে বিন্দুমাত্র অভিমান আজ ছিল না, যদিও প্রবীরের দাবিটা বড় অদ্ভুত। কিন্তু সে তো আর কাব্যতীর্থ মশাইয়ের মত নয়। কাব্যতীর্থ শুচিদিকে যেতে দিতে চান না, তবু যেতে বলেছেন। প্রবীর সোমাকে যেতে দিতে চায়, কিন্তু থাকতে বলে। কাব্যতীর্থ দাবি ছেড়ে দিয়েছেন, প্রবীর দাবি ছাড়তে চায় না। অনেক তফাৎ দুজনের মধ্যে।

শুচি হলো কাব্যতীর্থের স্ত্রী, আর সোমা হলো প্রবীরের কেউ-নয়। তবু একটি বিষয়ে দু'জনের মধ্যে অদ্ভুত মিল দেখা যাচ্ছে, কাঞ্চীপুরের আক্রান্ত জীবনের বেদনাকে যেন প্রতিধ্বনিত ক'রে দুজনেই স্বীকার করেছে—ধরে রাখার সামর্থ্য আর নেই।

কাঞ্চীপুর স্বরাজ সরকারের প্রাণকে ছিন্নভিন্ন করার জন্যে চারদিক থেকে খর নখরের ব্যূহ এগিয়ে আসছে। সোমার মনে হয়, এই স্বপ্নকে দ্বিখণ্ডিত করে বিচ্ছিন্ন করার জন্যই যেন শত্রুর অভিযান এগিয়ে আসছে, স্বাধীন কাঞ্চীপুর আবার পরাধীন হতে চলেছে।

তবু অভয় দিতে থাকেন কাব্যতীর্থ। পালিয়ে না গিয়া আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত থাকার জন্য আবার আহ্বান। বাণীপীঠের প্রাঙ্গণে ত্রিবর্ণ পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিলেন কাব্যতীর্থ, কয়েক হাজার জনতা নিঃশব্দে বসে শুনছিল :

"অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়, আমাদের দ্যুলোক ভূলোক অভয় হউক্…উত্তরাধরাদ্ অভয়ং নো অস্তু, আমাদের উর্দ্ধ ও অধঃ অভয় হউক্…

অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ, আমাদের রজনী অভয় হউক্, দিবস অভয় হউক্…।

একটা উর্দিভূষিত মানুষের দল হঠাৎ দূর সড়কের ওপর দেখা দেয়। মাঠের ওপর দিয়ে কাদা ছিট্‌কে বন্য বেগে ছুটে আসে এস-ডি-ও, দেশী পুলিশ আর বেলুচে সেপাই।

এস-ডি-ও একটা লাফ দিয়ে পতাকাদণ্ডের ওপর লাথি মারেন। কয়েকটি বিদ্যার্থী ছেলে ছুটে এসে পতাকা দণ্ডে বুক লাগিয়ে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে। এস-ডি-ও যেন আহত গোক্ষুরার মত একটা মোচড় দিয়ে লাফিয়ে আবার পিছিয়ে যান।

মাথার টুপিটা এক হাতে ঢালের মত ধ'রে, আর একটা চক্‌চকে রিভলবার তুলে এস-ডি-ও গলা-ছেঁড়া গর্জনের মত হাঁক ছাড়েন—ফায়ার!

এক রাউণ্ড, দু' রাউণ্ড, তিন রাউণ্ড—বুলেট বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বারুদের ধোঁয়া আর গন্ধের মধ্যে কেউ মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আর মরে যায়, কেউ দাঁড়িয়ে মরে আর পড়ে যায়, আর কেউ জখম হয়ে দূরে ছিট্‌কে পড়ে। আক্রান্ত জনতা হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে কিছু দূর পিছিয়ে যায়, তারই মধ্যে এক নরসিংহ ভক্তের চোখ এস-ডি-ওর বন্য চোখের চেয়েও হিংস্র হয়ে জ্বলে ওঠে।

জনতার হঠাৎ বিমূঢ়তায় আবার আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রবীর মাস্টার সাম্‌নে এগিয়ে এসে হাঁক দেয়—স্বরাজ সরকার কি জয়! এক জনারণ্যের দাবানল ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এক পা দু'পা করে এগিয়ে যেতে থাকে।

বেলুচ হাবিলদার গলা কাঁপিয়ে হাঁক দেয়—ড্রা সোর্ড এণ্ড হাল্লা…।

বীভৎস চীৎকার তুলে এক ঝলক সূচীমুখ বেয়নেট জনতার বুকের ওপর লাফিয়ে প'ড়ে চার্জ করে। প্রবীর মাস্টার পড়ে যায়, আবার টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। জনতাও হঠাৎ অটল পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

এস-ডি-ও এক থাবা দিয়ে পতাকাটা ছিঁড়ে নিয়ে হুইসিল বাজাতে থাকেন। প্রবীর মাস্টার যেন জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভাল ক'রে চোখ মেলে দেখতে পায়, মাঠের ওপর দিয়ে কাদা ছিট্‌কে এস-ডি-ও'র দল দৌড়ে চলে যাচ্ছে। আর···।

আর ছোট আতা গাছটার ছায়ার নিচে রক্তমাখা চাদর গায়ে জড়িয়ে টান হয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে শুয়ে আছেন কাব্যতীর্থ'।

নরসিংহ ভক্তের চোখের হিংস্র জ্বালা কোথায় মিলিয়ে যায় এক মুহূর্তে, অনাথের কান্না যেন চোখ ছাপিয়ে দেবার জন্য ফুঁড়ে উঠতে চাইছে।

ছুটে এসে কাব্যতীর্থের পায়ে হাত দিয়ে প্রবীর ডাকে—বিনোদ দা!

কাব্যতীর্থ বলেন—একটু জল দাও তো ভাই।

কয়েকটি বিদ্যার্থী ছেলে এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে জল নিয়ে ফিরে আসে।

কাব্যতীর্থ বলেন—তুমি খাইয়ে দাও প্রবীর।

বোধ হয় এই পরমস্পর্শিত জলটুকু পান করার জন্য তিনি জন্মাবধি তৃষ্ণার্ত হয়ে ছিলেন। সে তৃষ্ণা মিটেছে এবং তারই অগাধ তৃপ্তিতে চিরকালের মত শান্ত হয়ে গেলেন কাব্যতীর্থ।

তারপরের ঘটনাগুলিও শান্ত। অস্তোন্মুখ সূর্যের শান্ত রোদের আলোয় মরাকালিন্দীর চড়ায় চিতার ধোঁয়া আকাশে ওঠে। পাশাপাশি সাতটি চিতা। কাব্যতীর্থের, আর সুদাম, জগদীশ, পাঁচু, শ্রীধর, বীরু ও শ্যামানাথের।

সন্ধ্যাবেলা, নিস্তব্ধ বাণীপীঠের প্রাঙ্গণে মাটির ওপর সাতটি প্রদীপও শান্তভাবে জ্বলে। সোমা এসে আহত প্রবীর মাস্টারের ব্যাণ্ডেজবাঁধা মূর্তিটাকে ধ'রে ধ'রে শিশুভবনে নিয়ে যায়। জীর্ণ রাসমঞ্চের স্তূপের কাছে পৌঁছে প্রবীর একবার থামে। মুখ ফিরিয়ে বাণীভবনের প্রাঙ্গণের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

সোমা জিজ্ঞেস করে—কি দেখ্‌ছো?

প্রবীর—সাতটি প্রদীপ, এখান থেকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে সোমা!

সোমা বলে—হঁ্যা।

সেই কাহিনীটাও মনে পড়ে সোমার; সপ্তর্ষির দল একদিন আকাশ থেকে নেমে এলেন ভূতলে...।

আজকের সকালবেলাটা খুবই শীতার্ত, সূর্য উঠলেও যেন কুয়াসাগুলি সরতে চায় না, খড়ের চালা থেকে টপ্ টপ্ করে শিশির জল ঝরে পড়ে। পাখিগুলির ঘুম ভাঙেও দেরি করে। সারা কাঞ্চীপুরের শোণিত যেন উত্তাপহীন হয়ে গেছে।

শিশুভবনের বারান্দায় একটা মাতুরের ওপর কম্বল জড়িয়ে তখনো ঘুমিয়ে ছিল প্রবীর। সোমা এসে একবার দেখে গেছে, কিন্তু ঘুম ভাঙায়নি। তারার মা সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে, রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে দরজায় হেলান দিয়ে বসে বসেই ঝিমোয়। বেলা হয়, কিন্তু কাজের তাড়া নেই। এ রান্নাঘরে উনুন জ্বালবার সাধও বোধহয় মিটে আসছে একে একে।

কিন্তু প্রবীরের ঘুম না ভাঙলেও ভাঙিয়ে দিতে হলো। কয়েকটি বিদ্যার্থী ছেলে একটা খবর জানাতে এসেছে।

পুলিশ আসছে, প্রায় এসে পড়েছে, সমস্ত কাঞ্চীপুরকে তল্লাসী করতে।

একটি বিদ্যার্থী ছেলে বলে—আর আপনাকে গ্রেপ্তার করতে মাস্টার মশাই।

প্রবীর প্রশ্ন করে—শুধু আমাকেই গ্রেপ্তার করবে?

বিদ্যার্থী ছেলেটি বলে—আমি খবর পেয়েছি, শুধু আপনার নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

প্রবীর উঠে দাঁড়ায়, বারান্দার ওপর ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পায়চারি করে, তারপর বলে—শোন, তোমরাও সবাই এখান থেকে সরে পড়।

যে আজ্ঞে। বিদ্যার্থী ছেলেরা চলে যায়।

সোমা এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল। প্রবীর বারান্দা থেকে নেমে আঙিনার ওপর দাঁড়াতেই সোমা এসে হাত ধরে—কোথায় যাবে?

প্রবীর হেসে ফেলে—তোমার ঘরে, একটু জল খাব।

মিথ্যা বলেনি প্রবীর, সোমার ঘরেই এসে এক গেলাস জল খেয়ে একেবারে সুস্থ মানুষের মত দাঁড়ায়। সোমার হাত ধরার জন্যে হাতটা এগিয়ে দিয়ে প্রবীর বলে—এবার যাই সোমা।

সোমা হাত সরিয়ে নেয়—এ রকম কথা তো ছিল না।

প্রবীর—কি কথা?

সোমা—কথা ছিল, তুমি আমাকে যেতে দেবে না, আর আমিও যাব না। কিন্তু আজ তুমি কোন্ মুখে পালিয়ে যাচ্ছ?

প্রবীর—আমি পালিয়ে থাক্‌ছি সোমা। বরং পুলিশের কাছে ধরা দিলেই পালিয়ে যাওয়া হবে, এটুকু তুমি বুঝতে পারছো না?

প্রবীর সোমার দুটি হাত চেপে ধরে।—আমি পালিয়ে যাব কোথায় সোমা? আমার আত্মা যে পড়ে রইল এখানে।

সোমা—কোথায় থাকবে?

প্রবীর—তোমার চারদিকে।

সোমা—তোমার খবর পাব কি করে?

প্রবীর—আমি খবর দেব, আমি এসে খবর দিয়ে যাব।

সোমা—এভাবে কতদিন চলবে?

প্রবীর—এর বেশি আর কিছু জানি না সোমা। শুধু জানি, আজ থেকে আমার জীবনে এই এক নতুন কাজের পালা সুরু হলো।

সোমা—এ কাজের পালা কি ফুরোবে না?

প্রবীর চুপ করে থাকে। সোমার হাত দুটি আর একটু শক্ত করে

ধরে, যেন নিজেরই হৃদয়কে আরও কঠিন ক'রে নিয়ে প্রবীর বলে—ফুরোবে, যেদিন এখানে এসে আর তোমাকে দেখতে পাবনা।

সোমার চোখের পাতাগুলি ভারি হয়ে আসে। দুঃসহ হলেও সোমা তার জীবনের এই নতুন পরীক্ষাকে শান্ত চিত্তে গ্রহণ করবার চেষ্টা করে। মন্দ কি? চিরকাল এমনি করে তুমি আসতেই থাক। এ আসা যেন ফুরোয় না। আর আমি শুধু প্রতীক্ষা হয়ে থাকি। তুমি এস, আমি আছি, আমি থাকবো, আমি যাব না।

সোমা বলে—তা কখনো হতে পারে না প্রবীর, হতে দেব না। আমি যাব না।

প্রবীর—আমি এবার আসি?

সোমা—এস।

প্রবীর চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে শিশু ভবনের ঘুম যেন ভাঙতে চায় না। তারার মা চৌকাঠের কাছে তেমনি আলস্যে ঝিমোতে থাকে, সোমা বসে থাকে তার অবসন্ন চিন্তার নিভৃতে, এক গভীর নির্জনতার মধ্যে। প্রবীর নিজে চলে গিয়ে সোমাকে যেন একেবারে নিশ্চল করে রেখে গেছে।

কাঞ্চীপুরের এই পরিব্যাপ্ত চাঞ্চল্যহীনতাকে যেন প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে চূর্ণ করার জন্য একটা উল্লাস গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে। ভরাকুল থানার ইন-চার্জ, দশজন কনস্টেবল, মাণিক চৌকিদার, আর···আর সব চেয়ে আশ্চর্য, জন পঞ্চাশ মিঞাবাজারের লোক।

ইনচার্জ মহাশয়ের উৎসাহের অর্থ বোঝা যায়, তিনি প্রতিশোধের আনন্দে চঞ্চল। কনস্টেবলদের উৎসাহ বোঝা যায়, তারা হাতে হাতে কিছু পেয়ে যাবার ভরসায় চঞ্চল, আর মাণিক চৌকিদারের উৎসাহ তো জানাই কথা। সে আজ প্রতিহিংসার উৎসাহে চঞ্চল।

শুধু বোঝা যায় না মিঞাবাজারের লোকগুলির এ প্রবল উৎসাহের

অর্থ। ওরাই তো কতবার গ্রাম সেবামণ্ডলের কেন্দ্রে এসে বিনামূল্যে চরকা নিয়ে গেছে, এক বছরে শোধ দেবার মেয়াদে বস্তা বস্তা তুলো নিয়ে গেছে। গত বছরের ম্যালেরিয়ায় এই গ্রামসেবামণ্ডলই তো মিঞা-বাজারকে চারটি মাস বিনামূল্যে সালসা আর পাচন খাইয়েছে। আজ ওরাই এসেছে কাঞ্চীপুরের দেনা শোধ করতে, স্পেশ্যাল পুলিশ হয়ে, কেরোসিনের টিন হাতে নিয়ে।

নির্জন বাণীপীঠের প্রতি ঘর তল্লাসী ক'রে শুধু দু' বস্তা বই গ্রেপ্তার করলেন ভরাকুল থানার উৎসাহী ইন-চার্জ। মেঝে খুঁড়ে কিছুই পেলেন না। সবচেয়ে বেশী ঠকে গেলেন কাব্যতীর্থের বাড়ি তল্লাসী করতে এসে। —এঃ, সব সরিয়ে ফেলেছে! বঞ্চিত ইনচার্জ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। একটা থালা, একটা গেলাস আর একটা বাটি ছাড়া নেবার মত আর কিছুই পেলেন না।

এইবার ইন-চার্জ সত্যিই ক্ষেপে উঠে প্রতি কুটীরে হানা দিয়ে ফিরতে লাগলেন। পুলিশ আর স্পেশ্যাল পুলিশ ঘরে ঘরে শূন্য ধানের মরাই ভাঙে। বাক্স পেঁটরা ভেঙে হাতড়ে যা পায়, হাতে হাতে লুট করে। থালা বাসন, ঘটি বাটি টেনে নিয়ে গাছতলায় জড়ো করে। মেয়েরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। পুরুষ যাকে পাওয়া যায়, থুড়থুড়ো থেকে আরম্ভ ক'রে ষোল বছরের ছেলে পর্যন্ত সবাইকে গুঁতিয়ে অশথতলায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে, নিলামের গরুর পালের মত।

এ পাড়া থেকে ওপাড়া, তল্লাসীর উল্লাস সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত লুঠেরা দস্যুর হল্লার মত ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ঠিক সন্ধ্যের আগে ইন-চার্জ মহাশয় প্রবীর মাস্টারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে সদল বলে ঢুকলেন শিশুভবনে তল্লাসী করতে। শিশুভবন তন্ন তন্ন ক'রে তল্লাসীর পর এক বস্তা চালের খুদ গ্রেপ্তার করলেন ইন-চার্জ। বাকি রইল সোমার ঘর।

সোমাকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন ইন-চার্জ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা সওয়াল জেরা করে প্রায় তিন পাতা রিপোর্ট লেখার পর জিজ্ঞেস করেন—স্বদেশি ক'রবার এত জায়গা থাকতে আপনি কলকাতা ছেড়ে এখানে এলেন কেন ?

সোমা—চাকরি করতে।

ইন-চার্জ হাসেন—উঁহু, একথা বললে ভবী ভোলে না ম্যাডাম, বেছে বেছে ডিস্টার্বড্ এরিয়াতে চাকরি করতে আসা ? আপনার এ চাকরিতে প্রসপেক্ট কি আছে বলুন দেখি ?

সোমা—জানি না।

ইন-চার্জ মহাশয় কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবতে থাকেন। তারপর বলেন—আপনার ভালর জন্যই বলছি শুনুন……।

পকেট থেকে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের একটা ইস্তাহার বের ক'রে সোমার চোখের সামনে মেলে ধরেন—পড়ুন।

সোমা ইস্তাহারের ওপর চোখ বুলিয়ে মনে মনে প'ড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ইনচার্জ উৎসাহিতভাবে জিজ্ঞেস করেন—পুরো দুটি হাজার টাকার প্রসপেক্ট ! আপনি শুধু আমাকে খোঁজ দিন, প্রবীর মাস্টার কোথায় লুকিয়ে আছে, তাহলেই এই সরকারি পুরস্কারটা আপনাকেই পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেব। আমি কথা দিচ্ছি। বলুন ?

সোমা—জানি না।

ইনচার্জ—খোঁজ পেলে বলবেন তো ?

সোমা—না।

ইনচার্জ ভুরু কুঁচকে হাসেন—এত চালাক হয়েও আপনি কিন্তু একটা বে-আইনী কথা বলে ফেললেন। আপনার এই কথার দায়েই আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারি, জানেন ?

সোমা—জানি না।

ইনচার্জ যেন একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অত্যন্ত ধীর হয়ে বলেন—চাল নেবেন? সরকারি রিলিফের চাল আছে আমার কাছে।

সোমা এতক্ষণ ধরে যেন তার মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে সংযত ক'রে ইন-চার্জের সব বাচালতা সহ্য করছিল। হঠাৎ রূঢ় হয়ে উঠে সোমা বলে—ঠাট্টা করছেন নাকি? চাল কেড়ে নিয়ে আবার চাল দেবার কথা কোন্ মুখে বলেন?

ইনচার্জ শান্তভাবে হাসেন—আমাদের ওপর এইরকমই ইনষ্ট্রাক্শন্ আছে ম্যাডাম।

সোমা আর কোন উত্তর দেয় না। উর্দিধারী হয়ে থাক্লেও ইনচার্জ মহাশয়ের চেহারাটা হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য মানুষের মত হয়ে ওঠে, স্বাভাবিক সৌজন্যের সঙ্গে বলেন—চিন্তা করবেন না, আমি গিয়ে কিছু চাল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সোমা—পাঠাবেন না, আমি নেব না।

ইনচার্জ—তাহ'লে বাড়ি চলে যান। এখানে থাকবেন না, নইলে মস্ত অসুবিধায় পড়বেন।

সোমা—এবিষয়ে আপনি কোন উপদেশ দেবেন না।

ইন্-চার্জের চেহারাটা সেই মুহূর্তে আবার কেতাদুরস্ত উর্দিধারী অমানুষের মত হয়ে ওঠে। গম্ভীরভাবে বলেন—আপনার ঘর তল্লাসী করবো।

অনেকক্ষণ ধরে সোমার ঘরের জিনিসপত্র তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করেন ইন্চার্জ। বাক্স ঘেঁটে, বইগুলি তছনছ করে শেষ পর্যন্ত একটা রহস্যময় জিনিস হাতে নিয়ে একটু সুস্থির হয়ে বসলেন ইন্চার্জ। সোমার ডায়েরী! সিগারেট ধরিয়ে এক পাতা দু'পাতা ক'রে ডায়েরীটা পড়তে পড়তে ইন্চার্জের ঠোঁট ভুরু চোখ সবই এক দিব্য হাসির পুলকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে থাকে।

"২৭শে জুন—শেষরাত্রির জ্যোৎস্নায় নরসিংহতলার বটকুঞ্জে লুটোপুটি আলোছায়াতে তোমার মুখটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো।"

"২৯শে জুন—পথে আসতে দেখেছিলাম তোমাকে, তুমি গ্রামের একলব্য। শুচিদির বাড়ির বারান্দায় দেখলাম, তুমি অস্পৃশ্য। আজ দেখছি, তুমিই নাকি বাণীপীঠের হেড মাস্টার। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে একটুও লজ্জা হয় না আমার, আশ্চর্য।"

"৩০শে জুন—আমার জীবনের প্রথম নিমন্ত্রণলিপি গেল তোমার কাছে।"

"৫ই জুলাই—মন্দির মর্মরিকার মত এ সন্ধ্যার দ্বারপ্রান্তে আমি দাঁড়িয়েছিলাম কার জন্য? তুমি এলে, পেলাম তোমার স্পর্শ। কিন্তু নরসিংহের ভক্ত হয়েও তোমার চোখে জল কেন? তোমার মনের এই গোপন বেদনাটি কি আমি জানতে পারি না?

পড়তে পড়তে ডায়েরীর শেষ পাতার কাছে এসে থামেন, পুলকবিকম্পিত ইন্‌চার্জ।

"৩রা ডিসেম্বর—তোমার দুই বাহু দিয়ে ঘেরা স্বপ্নের মধ্যে আমি বন্দী। আজ আমার কপালে একটি নতুন টিপ তুমি এঁকে দিলে।"

—ভাল প্রসপেক্ট! ডায়েরী বন্ধ করেন ইন্‌চার্জ। আর কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ শুধু হাসতে থাকেন। থেমে নিয়ে আবার হাসেন।

ইন্‌চার্জ ডায়েরীটা হাতে নিয়ে একটা হাঁপ ছেড়ে বলেন—যাক্‌গে, এর মধ্যে ন্যাশনালিজমের ছিঁটেফোঁটাও দেখছি না, এসব ব্যাপার আমার পীনাল কোডের আওতায় পড়ে না বলেই তো মনে হচ্ছে। তাই শুধু এর ওপর নির্ভর করে আপনাকে এক্ষুনি গ্রেপ্তার করতে পারলাম না। এটি আমি সদর কোতোয়ালিতে রিপোর্টের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে দেখি, তাঁরা কি অর্ডার দেন? আপাততঃ...

ইন্‌চার্জ হেসে ফেলেন।—আচ্ছা, আপাততঃ আসি।

পুলিশ দল চলে যাবার পরও সন্ধ্যার শিশুভবন নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। আজ আঙিনার ওপর ছেলেমেয়েদের ছুটোপুটি খেলার সোরগোল নেই। সাঁওতাল বউ আজ আর সুরভিকে নিয়ে দুধ দুইতে আসেনি।

রান্নাঘরের উনুনটাও নিস্তব্ধ। ওবেলা ছেলেমেয়েদের জন্য আধপেটা বরাদ্দের চাল নিয়ে রান্নাবান্না এবং খাওয়া দাওয়া হয়েছিল। এবেলা তাও নয়।

তারার মা এসে সোমাকে ডাকে—গুরুমা।

সোমা—কি বল ?

তারার মা—ঢ্যাঙাগুলো সব চলে গেছে গুরুমা।

সোমা—কে চলে গেছে ?

তারার মা—মাধাই নেই, সুমন্ত নেই, বিশু পবন মনুও নেই।

সোমা—কোথায় গেল ?

তারার মা বিরক্ত হয়ে ওঠে—সামান্য কথা সোজা করে কিছুতেই বুঝতে চাও না গুরুমা। কদিন ধরে ছেলেগুলো পেটপুরে খেতে না পেয়ে শুঁটকি হচ্ছিল, আর কতদিন থাকবে বল ?

সোমার মুখটা সহসা একটা যন্ত্রণার আঘাতে বিবর্ণ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকার পর বলে—গেছে ভালই করেছে, কিন্তু যাবার সময় আমার সঙ্গে একটিবার দেখাও ক'রে গেল না ?

সোমার চোখ দুটো দুঃসহ পরাজয়ের অভিমানে ঝাপ্‌সা হয়ে উঠতে চায়। এক ভুয়ো গুরুমাকে এতদিনে চিনতে পেরে ওরা যেন সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

নেপাল হঠাৎ সোমার ঘরে এসে সোমাকে প্রণাম করতেই সোমা চম্‌কে তাকায়।

শিশুভবনে প্রথম যেদিন এসেছিল সোমা, এই নেপালই এমনি করে না-ডাকতেই এসে প্রণাম করে ছিল সোমাকে, দাগী সদানন্দের ছেলে নেপাল।

সোমা জিজ্ঞাসা করে—কি নেপাল?

নেপাল—আমি চলে যাচ্ছি গুরুমা।

সোমা—কোথায় যাবে?

নেপাল—চাল আন্‌তে যাব।

সোমা—সে কি কথা? তুমি চাল আন্‌বে কি করে?

নেপাল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, কি যেন বলতে চায়, তবু বলতে পারে না। কিছুক্ষণ উসখুস ক'রে তারপর নেপাল যেন একটা রহস্যময় স্বরে বলে—আমি চাল আন্‌তে জানি গুরুমা।

সোমা নেপালকে হাত ধ'রে কাছে টেনে আনে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে—ছিঃ নেপাল। তোমাকে চাল আন্‌তে হবে না।

নেপাল আবার কি ভাবে। বোধ হয় ওর ভবিষ্যতের সুদূরে এক যাবজ্জীবন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নেপাল বলে—যাই গুরুমা। আমি আর আসবো না।

সোমা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—যাও।

নেপাল চলে যায়। সব কাছে-ধরে-রাখা আবেদন ছিন্ন ক'রে একে একে চলে যাওয়ার পালা আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে।

পুলিশও কাঞ্চীপুর ছেড়ে চলে গেছে, এতক্ষণে অনেক দূরে। যাবার আগে বাণীপীঠে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, কাঞ্চীপুরকে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে পুলিশ। জ্বলন্ত বাণীপীঠের ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত শিখার লাল আলোকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, নরসিংহতলার কাছ দিয়ে সড়ক ধরে পুলিশ দল চলে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় কাঞ্চীপুরের পঞ্চাশজন বন্দী ছেলে বুড়ো যুবক, গরুর গাড়ির ওপর বোঝাই হয়ে কাঞ্চীপুরের সব পেতল কাঁসা চলে যায়। চলে যায় সাঁওতাল বউয়ের সুরভি দড়িবাঁধা বন্দিনীর মত পুলিশ দলের সঙ্গে সঙ্গে। গরুর গাড়ীর ওপরে স্তূপীকৃত লুণ্ঠিত সামগ্রীর মধ্যে একটা প্রতিমা মূর্তিও দেখা যায়, যার দোমেটে শরীর মাত্র রঙীন হয়ে

উঠেছিল, কুমোর পাড়া তল্লাস করে পুলিশ আস্তই মূর্তিটাকে গ্রেপ্তার করেছে। গরুর গাড়ির ঝাঁকুনিতে কাঁপতে কাঁপতে চলে যায় কাব্যতীর্থের কল্পনার সুন্দরী শুভান্বিতা কুম্ভধারিণী জয়ন্তী।

পাথরের নরসিংহকে সদানন্দ একেবারে অন্ধ ক'রে দিয়েছে কদিন আগেই। নক্ষত্রমালা যার চারুহার, সূর্য চন্দ্র যার কুন্তল, পাঞ্চভৌত যার পায়ে লুণ্ঠত শির, সেই বিশ্বসাক্ষী নৃহরির চোখের সম্মুখ দিয়েই সব চলে যায়, কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু আড়াল থেকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে এক পলাতক নরসিংহভক্তের চক্ষু এই অন্ধকারেই জ্বলে ওঠে।

হেসে ওঠে এই রাত্রের অন্ধকারেই শ্যামনগরের বাজারের মধ্যে প্রেতবিবরের মত একটি ঘর। মাণিক চৌকিদার হাসে।

কেরোসিন ল্যাম্পের আলোটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে মাণিক চৌকিদার বলে—মুখটা একবার কাছে নিয়ে আয় দেখি সিন্ধু, এক পাত্র চড়িয়ে নে।

মাণিক ঝুলি থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করতেই সিন্ধুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—অ্যাঁ বিলাতী জল? মানকে আমার বড় মানুষ হয়ে উঠলো দেখছি?

মাণিক চৌকিদার ঝুলি থেকে এক তাড়া নোট বের ক'রে দেখায়—এই ছাখ্, ভেবেছিস্ কি? সেদিন আর নাই সিন্ধু, সেদিন আর নাই।

এক নিঃশ্বাসে ঢক্ ঢক্ করে এক গেলাস বিলাতী জল খেয়ে নিয়ে মাণিক একটা ঢেঁকুর তোলে। সিন্ধু সাগ্রহে প্রশ্ন করে—সত্যি বল্ না মানকে, আমাকে বলতে তোর এত লাজ কেন?

মাণিক—কি?

সিন্ধু—এত টাকা, বিলাতী জল, এত সব পাচ্ছিস্ কোথা থেকে?

মাণিক—তোকেও পাইয়ে দিতে পারি, যাবি?

সিন্ধু—চল্ না!

মাণিক আর একটা ঢেঁকুর তোলে—নাঃ তোকে নিয়ে গিয়ে সুবিধে হবে না।

শ্যামনগর বাজারের বেশ্যা সিন্ধু, এই রাত্রের প্রতিটি পাপের পদধ্বনিকে নিজের ঘরে আনবার জন্য পান খেয়ে, চোখে কাজল দিয়ে পরিপাটি ক'রে বসে আছে। কাণে দুটো বড় বড় সোনার টাপ, মাথায় এক ঝাপটা ও গলায় জালফাঁস, নকল সোনার তৈরী। পায়ে এক জোড়া রূপোর বাঁকমল। নেশাখোর মাণিক চৌকিদারের কথার মধ্যে কি একটা নতুন পাপের আভাস পেয়ে সিন্ধু যেন সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকে।

মাণিক বলে—গোরা পল্টন এসেছে, শুনিস্ নাই সিন্ধু?

সিন্ধু—হ্যাঁ শুনেছি।

মাণিক—ওদেরই জন্যে মেয়েমানুষ চাই সিন্ধু, কিন্তু তোকে দিয়ে হবে না।

সিন্ধু যেন ধৈর্য ধরে কান দুটো সজাগ করে শুনতে থাকে, মাণিক চৌকিদারের কথাগুলি নেশার ঝোঁকে গড়িয়ে গড়িয়ে শেষ পর্যন্ত কোন রসাতলে গিয়ে পৌঁছায়।

মাণিক ফিক্ করে হেসে বলে—কাঞ্চীপুরে এক মাষ্টারণী আছে, জিনিষটা ভাল।

সিন্ধুর দু'কানের সোনার টাপ দুটো হঠাৎ যেন শিউরে উঠে কাঁপতে থাকে। মাণিক চৌকিদার ঝুলি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, নেশার আবেগে একটা সুগোপন চক্রান্ত যেন তরল হয়ে তার পাপকঠিন মনের ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ হয়ে পড়ে—যাই, দেখি বরাতে কি বলে! আজ রাতের মধ্যেই কাজ সারতে হবে।

মাণিক চৌকিদার চালে যাবার জন্যে পা এগিয়ে দিতেই সিন্ধু পেছন থেকে ডাকে—শোন মানুকে।

মানিক অনুযোগ ক'রে বলে—পেছু ডাকিস্ না সিন্ধু। দেরি করলে সব ফসকে যাবে, নগদ নগদ একশোটি টাকা বক্‌শিস্ দেবে বলেছে। আজ রাতের মধ্যে না হ'লে আর হলো না। কালকেই ছাউনি তুলে নিয়ে ওরা চলে যাবে।

সিন্ধু—কে ?

মানিক—ঐ গোরাগুলো, আবার কে ?

সিন্ধু—কিসের বক্‌সিস্ ?

মানিক—তোর মাথায় একেবারে ঘিলু নাই রে সিন্ধু, কিছু বুঝিস্ না।

সিন্ধু—তুই ভাল ক'রে বলবি তবে তো বুঝবো।

মানিক চৌকিদার ঘর ছেড়ে একেবারে বাইরে এসে দাঁড়ায়, সিন্ধুও পেছু পেছু এসে দাঁড়ায়। মানিকের ঝুলি এক হাত দিয়ে টেনে রেখে জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাচ্ছিস্, আমাকে না বললে ঝুলি ছাড়বো না।

মানিক—এঃ, তুই যে একেবারে মাগের মত কথা বল্‌ছিস সিন্ধু।

মানিক চৌকিদার গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলে—গোরাগুলোকে রাতারাতি একবার ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে চলে আস্‌বো বাস্, নগদ একশোটি টাকা বকশিস্।

সিন্ধু—কার ঘর ?

মানিক—শুনেই ছাড়বি সিন্ধু ?……তবে শোন্।

সিন্ধুর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে মাণিক ফিস্ ফিস্ ক'রে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলে। সিন্ধু যেন আগুনে-পোড়া সাপের মত ছট্ ফট্ ক'রে দু'পা পিছিয়ে যায়। পরক্ষণেই এগিয়ে এসে মানিকের ঝুলিটা শক্ত ক'রে চেপে ধরে—তুই যেতে পারবি না মানুকে, আমার মাথা খাস্।

একটা ধাক্কা দিয়ে সিন্ধুকে সরিয়ে দিয়ে মাণিক মুখ খিঁচিয়ে ধমক দিয়ে ওঠে—সর মাগি।

ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েও সিন্ধু আবার উঠে মানিককে ধরতে যায়। মানিক চৌকিদার লাঠি তুলে হিংস্র একটা গর্জ্জন করে—আমার গায়ে হাত দিয়েছিস্ কি, মাথা গুঁড়া ক'রে দেব।

হন্ হন্ করে অন্ধকারের মধ্যে মানিক চৌকিদার নিশাচর শ্বাপদের মত অদৃশ্য হয়ে যায়। সিন্ধু চীৎকার ক'রে ডাকতে থাকে—যাস্নি মানুকে, যাস্নি……।

সিন্ধু দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে, নরকের রূপ দেখে আজ যেন এতদিন পরে সে ভয় পেয়ে নির্ব্বাক্ হয়ে গেছে। এক মিনিট, দু' তারপরেই মানিকের চেয়েও হিংস্রতর শ্বাপদের মত উগ্ররকমের চঞ্চল হয়ে ওঠে সিন্ধু। পা থেকে বাঁকমল দুটো খুলে ঘরের ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দরজার শিকল টেনে তালা লাগায়। তারপরেই যেন মানিকের সঙ্গে এক নারকীয় প্রতিযোগিতার আবেগে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আজ রাত্রে ভোলা এত কাঁদছে যে, জনাও সামলাতে পারে না। কিছুক্ষণ ঘুমোয়, তার পরেই কেঁদে ওঠে। জনাও সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে। আর সান্ত্বনা দিতে দিতে জনা নিজেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, ভোলা আবার কাঁদে।

জনার সান্ত্বনায় যখন কাজ হয় না, তারার মা এক একবার বকের ডাক ডেকে ভোলাকে ভয় দেখিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে। ভোলা ভয় পায়, ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু আবার জেগে উঠে কাঁদতে থাকে।

সুরভি তো আর নেই, তাই ভোলার দুধও আজ জোটেনি। এক বেলা শুধু ভাত খেয়েছে ভোলা, এ বেলা তাও নয়। হয় ক্ষিদে পেয়েছে, নয় পেট কামড়াচ্ছে। যাই হোক্ না কেন, সান্ত্বনা না মান্‌লে নিয়ম শুধু

ভবনের এই গভীর রাত্রে ওকে বাঘের ডাক ডেকে ভয় দেখানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

নিজের ঘরে শুয়ে সোমাও ঘুমোতে পারে না। ভোলার কান্নার মধ্যে যেন একটা অলক্ষুণে ভয় মিশে রয়েছে, রাত্রটাই মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে মনে হয়।

একবার শুধু শোনা গেল, সদানন্দ বিড় বিড় করে বক্‌তে বক্‌তে চলে যাচ্ছে, কদিন থেকে ওর মাথা খারাপ হয়েছে। সদানন্দ যেন ভয় পেয়ে রাতের নাগাল থেকে বাইরে পালিয়ে গেল। আবার ভোলা কেঁদে ওঠে।

সোমা বিছানা ছেড়ে ওঠে। ভয় পেয়ে নয়, ভোলার ওপর একটা অলক্ষুণে মমতার টানে আজ নিজের ঘরে থাকতে পারছিল না সোমা। ধীরে ধীরে শিশুভবনের বড় ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়। হাত বাড়িয়ে জনার কোল থেকে ভোলাকে তুলে নিয়ে কোলে করে বসে সোমা। আদর ক'রে সান্ত্বনার সুরে গান ক'রে, ভোলাকে যেন তার নিজের অজ্ঞাতসারে অলক্ষুণে মমতা দিয়ে থাপ্‌ড়ে থাপ্‌ড়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে সোমা। ভোলা ঘুমিয়ে পড়ে।

জনা নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে থাকে, একবার সোমার দিকে, একবার ভোলার দিকে। দেখতে দেখতে ওর চোখের আশা যেন ধীরে ধীরে ফুটে আসে। এতদিন পরে যেন ঠিক জায়গাটিতে জনা তার জীবনের ভোলাকে সঁপে দিতে পেরেছে। এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে জনা।

শিশুভবনের প্রদীপ খুবই ক্ষীণ হয়ে জ্বলে। সবাই ঘুমোয়, শুধু ভোলাকে কোলে করে একা জেগে বসে থাকে সোমা। এতদিন পরে এই নিস্তব্ধ ভয়ার্ত রাত্রির শিশুভবনে সোমাকে সত্যিই গুরুমার মত দেখায়।

বড় নিস্তব্ধ রাত, রাতভিখারী কানা ফটিকের কণ্ঠস্বরও কাকীপুরের অন্ধকার সইতে না পেরে কোথায় সরে গেছে কে জানে।

কিসের শব্দ? আঙিনার ওপর একসঙ্গে অনেকগুলি ভারি আর্মি জুতোর শব্দ, অনেকগুলি টর্চের আলো দৌড়োদৌড়ি করছে, তার সঙ্গে রকমারী সুরের শিষ।

সোমা একটা ঠেলা দিতেই তারার মা উঠে বসে। বন্ধ জানলার ওপর কান পেতে শোনে, সাবধানে একটু ফাঁক ক'রে দেখে, তারপর এক লাফে সরে এসে ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে—তোমার ঘরে কতগুলো গোরা ঢুকেছে গুরুমা।

তারার মা সোমাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এক মহানরকের আক্রমণ থেকে সোমাকে বাঁচাবার জন্যে যেন তারার মার দুঃখজীর্ণ চাক্‌রানির শরীরটা অন্ততঃ আজকের মত পাথরের বর্ম হয়ে উঠতে চায়।

সোমা আস্তে একটা আর্ত্তনাদ করে—মাঃ।

মনে হয় আর্ত্তনাদ নয়, শিশুভবনের বিনা মাইনের এই দাসীটিকে আজ সত্যি নামে ডাকতে পেরেছে সোমা।

তারার মা সোমার হাত ধরে বলে—এস, এখন ঘরে থাকলে বিপদ হবে, পুকুরের পাশ দিয়ে ওপারে নলখাগড়ার জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি চল।

সোমাকে একরকম হাত ধরেই টেনে নিয়ে যায় তারার মা। ঘুম ভোলা সোমার কোলেই ঘুমোতে থাকে। নারকীয় রাত্রির প্রতি মুহূর্ত ধ'রে নলখাগ্‌ড়ার ঝোপে দাঁড়িয়ে সোমা শুধু যেন নিঃশ্বাসের স্পন্দন শুনতে থাকে। গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তলোলুপ জোঁক একসঙ্গে সোমার পায়ের পাতা কামড়ে ধরে। তারার মা সারারাত সোমার পায়ের পাতা থেকে টেনে টেনে জোঁক ছাড়ায়। সোমাকে সব রকম রক্তলোলুপ থাবা থেকে রক্ষা করার জন্য তারার মা যেন প্রতিজ্ঞা করেছে।

সোমার কোলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই রাত ভোর করে দেয় ভোলা। তারার মা বাইরে বেরিয়ে আসে, চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে তারপর ডাকে—চলে এস গুরুমা।

পুকুর ঘাটের কাছে আসতেই তারার মা ও সোমা একসঙ্গে চমকে ওঠে—ঘাটের সিঁড়িতে জলের মধ্যে বসে আছে, ও কে?

অবশ্য দেখে বোঝা যায়, কোন ভয়দেখানো মূর্ত্তি নয়। একটি কিন্তু কেমন অদ্ভুত ধরণের তার রকমসকম। ঘাটের সিঁড়িতে জলের মধ্যে কোমর ডুবিয়ে অবসন্নের মত বসে আছে। মাথায় ঝাপ্‌টা, কানে টাপ আর গলাতে একটা বিচিত্র রকমের অলংকার।

সোমা ও তারার মা'কে ঘাটের কাছে দেখে কোন মেয়ের পক্ষে এমন কিছু লজ্জিত হবার কথা নয়, কিন্তু মেয়েটা তার ভেজা শাড়িটা টেনেটুনে ভাল ক'রে গা ঢাকৃতে থাকে।

তারার মা বলে—তুমি কে বাছা? এত শীতে জলের মধ্যে বসে আছ?

মেয়েটা বলে—বড় জ্বালা গো বুড়ো মা।

তারার মা—তোমার মুখে এসব কি হয়েছে?

মেয়েটা জলের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়— সাপে কামড়েছে।

তারার মা একটু কঠোর ভাবেই প্রশ্ন করে—এত ঠাঁই থাকৃতে তুমি এখানে বসে বসে করছো কি?

মেয়েটা মুখ তুলে একবার সোমার মুখের দিকে, আর একবার ভোলার মুখের দিকে তাকায়। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বিরক্তভাবে উত্তর দেয়—আমি উঠবো, তোমরা এবার একটু দূরে সর দেখি, আমার লজ্জা করছে।

তারার মা আর সোমা দূরে সরে যেতেই মেয়েটা জল থেকে ওঠে, কাপড়টা গুছিয়ে প'রে নেয়, তারপর পুকুরের কিনারা ধরে এগিয়ে গিয়ে তালের ভিড় ভেদ করে চলে যায়। তারার মা বলে—মাথা খারাপ।

ভোর হতেই যেন আবার চম্‌কে ওঠার পালা সুরু হয়েছে। নিজের ঘরে ঢুকতে এখন আর ইচ্ছে করছিল না, বড় ঘরের বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে বসেছিল সোমা। ভোলা আশে পাশে ঘুর ঘুর করছিল। সোমাকে চম্‌কে দিয়েই শিশুভবনের আঙিনায় দেখা দেয় প্রবীর ও দুটি বিদ্যার্থী ছেলে, এক বস্তা চাল সঙ্গে নিয়ে।

চম্‌কে উঠলেও, এ চমকে মেঘ কেটে যায়। সোমার সারা মুখটা যেন মেঘমুক্ত প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সোমা হেসে জিজ্ঞেস করে—চাল কোথা থেকে নিয়ে এলে ?

প্রবীরও হেসে জবাব দেয়—সরকারি রিলিফের চাল।

সোমার মুখটা মুহূর্তের মধ্যে আবার বিষণ্ণ হয়ে ওঠে—সরকারী রিলিফের চাল আমি নেব না।

প্রবীর বলে—এ চাল আমি নিজের হাতে লুট করে নিয়ে আসছি সোমা।

সোমা আর একবার চম্‌কে ওঠে—কি বললে ?

প্রবীরের মুখটা অস্বাভাবিক রকমের উগ্র হয়ে ওঠে—আমি আমার দল নিয়ে সরকারি নৌকা আটক ক'রে, তিনটি সরকারি মাথা ফাটিয়ে এই চাল নিয়ে এসেছি সোমা। আমার শিশুভবন উপোস ক'রে আছে, আমি কি এখনো চাল ভিক্ষে পাবার আশায় বসে থাক্‌বো ?

সোমা একটু ভেবে নিয়ে শান্ত ভাবে বলে—আচ্ছা, তাই দাও।

বিদ্যার্থী ছেলেরা চালের বস্তাটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। তারার মা খুশী হয়ে বিদ্যার্থী ছেলেদের বলে—আমি এক্ষুনি রান্না চড়িয়ে দিচ্ছি, তোরাও দুটি খেয়ে নিয়ে যাস্‌ বাবা।

প্রবীরকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে আর তেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল না সোমার। ভোলাও পেছু পেছু আসছিল, সোমা ভোলাকে কোলে তুলে নেয়।

ঘরের ভেতর ঢুকেই সোমা কিছুক্ষণ আতঙ্কিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরটা যেন বন্যপশুর ধস্তাধস্তিতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে আছে। প্রবীরের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে সোমা একটু বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন করে—দেখেছ, কি কাণ্ড হয়েছে।

প্রবীর নির্বিকার ভাবেই বলে—জানি।

সোমা আরও আশ্চর্য হয়—তুমি জান?

প্রবীর—হ্যাঁ।

কথাটা ব'লেই প্রবীরের মুখটা ভয়ংকর রকমের কঠিন হয়ে ওঠে।

সোমা বলে একটি অদ্ভুত ধরণের মেয়ে কোথা থেকে এসে আজ পুকুরঘাটে সিঁড়িতে বসেছিল।

প্রবীর বলে—জানি।

সোমা—এ'ও তুমি জান?

প্রবীর—হ্যাঁ, আজই পথে আসতে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

সোমা—মেয়েটি কে?

প্রবীর—সিন্ধু, ভোলার মা। কাল রাত্রে সে এই ঘরেই ছিল।

সোমার বুকটা একবার ধড়াস ক'রে ওঠে, তারপর ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে যেন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে—ভোলার মা এখানে কেন এসেছিল?

প্রবীর—তুমি সত্যিই বুঝতে পারছো না সোমা, সে কেন এসেছিল?

সোমা আরও ভয়ার্ত ভাবে প্রবীরের হাত ধ'রে বলে—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না প্রবীর।

প্রবীর—ভোলার মা এসেছিল ভোলার গুরুমাকে রক্ষে করার জন্যে।

সোমা মাথা হেঁট ক'রে মাটির দিকে তাকিয়ে তার ভাবনার সমস্ত শক্তি দিয়ে এ রহস্য বুঝবার চেষ্টা করে। রহস্যটা যেন একটি মূর্চ্ছিত রাত্রির জগৎ, যেখানে রাত-ভিখারী কানা ফটিকও বোবা হয়ে গেছে। সেই অসহায় তমিস্রার সুযোগে সমস্ত ভূতলবাসিনী নারীর মনুষ্যত্বকে

দংশন করার জন্যে রসাতল থেকে কতগুলি বিষধর যেন শিষ দিতে দিতে সোমার ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু এই পৃথিবীরই এক নারকীয়া যেন প্রহরিণীর মত দাঁড়িয়ে ছিল সোমার ঘরে। সব দংশন নিজের দেহে বরণ ক'রে কাঞ্চীপুরের অসহায় অন্ধকার থেকে সকল কলুষ হরণ ক'রে সে চলে যায়। তার মাথায় ঝাপ্‌টা, কাণে সোনার টাপ……।

সোমা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ভোলাকে বুকের ওপর তুলে জড়িয়ে ধ'রে থাকে। সোমা যেন নিঃশব্দে কারও কাছে মাথা পেতে মার্জনা ভিক্ষা চাইছে। ভোলা যেন একটা চন্দন কাঠের পুতুল। ভোলাকে চুমো খেয়ে, ভোলার গালে মুখ ঘসে ঘসে সোমা যেন বারবার এক শিশু পৃথিবীর শোণিতসৌরভ আহরণ করতে থাকে।

সোমা বলে—আমার ভুল ভেঙেছে প্রবীর, আর আমার ভুল হবে না।

প্রবীরকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেও কথাগুলি যেন সুদূরের এক শুদ্ধা জন্মদাত্রীর মহিমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মত ধ্বনিত হয়। প্রবীর বলে—শান্ত হও সোমা, ভোলাকে বেশী অবাক্ করে দিও না।

তারার মা দরজার কাছে এসেও ঢুকতে ইতস্ততঃ করছিল। সোমা জিজ্ঞেস করে—কি তারার মা?

তারার মা—ভাত হয়ে গেছে, ছোঁড়াটাকে দাও, দুটো খাইয়ে দি। সেই কাল দুপুর থেকে……।

তারার মা ভোলাকে নিয়ে চলে যায়। সোমা প্রবীরকে বলে—তুমিও না খেয়ে কোথাও যেও না কিন্তু।

প্রবীর একটু বিষণ্ণভাবে হাসে—খাওয়াতে আবার বেশী দেরি ক'রে দিও না। তাহ'লে খাওয়াও হবে না, আর থাকাও হবে না।

সোমা—তার মানে?

প্রবীর—ওয়ারেণ্ট আর হুলিয়া নোটিশ চারদিকে ওৎ পেতে আছে, জান না?

আঙিনায় মচ্ মচ্ জুতোর শব্দ শোনা যায়। শব্দটা সোমার ঘরের দিকেই আস্‌ছে। সোমা প্রবীরের হাত চেপে ধ'রে চম্‌কে ওঠে। আজ শুধু চম্‌কে ওঠার পালা।

—কই, কোথায় আছেন আপনারা ?

যতীদা উদ্‌ভ্রান্তভাবে সোমার ঘরের কাছে এগিয়ে এসে ডাকতে থাকেন। প্রবীর ও সোমা দু'জনেই চম্‌কে উঠে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়।

যতীদা চেঁচিয়ে বল্‌তে থাকেন—শুচিকে ফেরত নিয়ে এলাম। এ কটা দিন বাড়িসুদ্ধ লোককে কি জ্বালান্ জ্বালিয়েছে মশাই, সে আর কহতব্য নয়। খেতে বসলে ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে মা'র সঙ্গে ঝগড়া করেছে, শুতে গেলে ওর বৌদির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মেঝেতে শুয়েছে। হেন তেন উপদ্রবের একশেষ। মা বললেন—যাঃ ওটাকে দিয়েই আয়। এখানে এসে ইচ্ছে ক'রে না খেয়ে সুঁটকোচ্ছে, ওখানে গিয়েও এমনিতেই না খেয়ে সুঁটকোবে, অগত্যা……।

প্রবীর জিজ্ঞেস করেন—কখন্ এলেন আপনারা ?

যতীদা—এই তো এসে পৌঁছলাম।

সোমা—শুচিদি কোথায় ?

যতীদা—ঘরে ব'সে আছে।

প্রবীর—গাঁয়ের কারও সঙ্গে দেখা হয়নি আপনার ?

যতীদা—না, এই তো এলাম। বিনোদ দা কই ?

সোমা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। প্রবীর চুপ করে থাকে, যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে নিজেকে কঠিন ক'রে রাখতে চাইছে।

যতীদা একটু সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞেস করেন—কি ব্যাপার মশাই বলুন তো।

প্রবীর বলে—চলুন।

সোমার বোধ হয় যাবার ইচ্ছে ছিল না, চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। প্রবীর একটু থেমে গিয়ে সোমার দিকে তাকিয়ে যেন ইঙ্গিতে আহ্বান করে। আর দ্বিধা না ক'রে সোমাও অগ্রসর হয়।

কাব্যতীর্থের বাড়ীর কাছে এসে যতীদা আর ঘরের ভেতর ঢোকেন নি। অপরাজিতার বেড়ার পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, আর মাঝে মাঝে থেমে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে সুস্থির হবার চেষ্টা করছিলেন। ভয়ংকর উপকথার মত অবিশ্বাস্য, তবু ঘটনাটা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য। অভিশাপের ফাঁদের মত এই অদ্ভুত গাঁয়ের মাটি ছেড়ে পালিয়ে যাবার আগে যতীদা যেন কটা মুহূর্তকে কোন মতে সহ্য করছিলেন।

সোমা আর প্রবীরই ঘরের ভেতর শুচির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে, কাহিনী শোনাবার জন্যে। অনেকক্ষণ হলো গেছে। যতীদা মাঝে মাঝে ছটফট করছিলেন, আর বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্য তাঁর নেই।

কিন্তু আরও অনেকক্ষণ সময় পার হয়ে গেল। ঘরের ভেতর থেকে কান্নার শব্দও এ পর্যন্ত শোনা গেল না। যতীদা অগত্যা এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর ঢুকলেন।

একেবারে শান্ত হয়ে বসেছিল শুচি। যতীদা বুঝতে পারেন না, কাহিনীটা শোনানো হয়ে গেছে কিনা।

শুচি বলে—দেখ্‌লে তো সোমা, কি রকম অদ্ভুত লোক ছিল, আমাকে ছেড়ে একটি দিনও রইল না।

সোমা উত্তর দেয় না, আঁচলটা মুঠো করে ধ'রে মুখ চেপে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রবীর বলে—বিনোদ দা'র একটা কথা আপনাকে এখনো বলা হয়নি বৌদি। জানি না আপনি কি মনে করবেন।

শুচি—সব বল প্রবীর ঠাকুরপো, পুণ্য কথার সবটুকু শুনে নিয়ে আমি চলে যাই।

প্রবীর—শেষ সময়ে আমিই তাঁর মুখে জল দিয়েছি, তিনি চেয়েছিলেন।

শুচির মুখটা অদ্ভুত রকমের একটা হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—তুমি দেবে না তো আর কে দেবে প্রবীর ঠাকুরপো? তুমি তো ওরই ভাই।

শুচিদি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলেন—আমার ভুল ভেঙেছে প্রবীর ঠাকুরপো। আমি জানতাম একদিন ভাঙ্গবে, ওর কথা তো মিথ্যে হবার নয়।

যতীদা গম্ভীর ভাবে ডাক দেয়—চল্ শুচি।

শুচি ওঠে—যাই দাদা।

যাবার আগে ঘরের ভেতরে চারদিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে থাকে শুচি। নিয়ে যাবার মত কি এমন মূল্যবান বস্তু আছে এখানে, যেখানে ভরাকুল থানার লোভী পুলিশও তল্লাসী করে নেবার মত কিছু পায় নি? দেয়ালের একটা খোপে আয়নাটা এখনো তেমনি পড়ে আছে। আয়নার বুকে সিঁদুরের সামান্য একটু গুঁড়ো এখনো লেগে রয়েছে, সেদিন চলে যাবার আগে শুচি যেমনটি রেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি।

শুচি আস্তে আস্তে এগিয়ে ঘরের কোণ থেকে এক জোড়া খড়ম তুলে নিয়ে আঁচলে বাঁধে। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়, শান্তভাবে একটি কথায় যেন সমস্ত কাঞ্চীপুর থেকে তার চিরবিদায় ধ্বনিত ক'রে শুচি বলে—চল দাদা।

চলতে চলতে শিশুভবনের কাছাকাছি এসে শুচি কি ভেবে নিয়ে একবার থামে। সোমার মুখের দিকে সস্নেহভাবে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ডাকে—সোমা।

সোমা—বলুন শুচিদি।

শুচি—তুমি এখানেই থাকবে? যাবে না?

সোমা—না শুচিদি।

শুচির মনের ভেতর বোধ হয় সোমার জন্যে ক্ষণিকের মত একটা গভীর মমতার আলোড়ন চলছিল। শেষ পর্যন্ত সংকোচ কাটিয়ে ব'লে ফেলে—এখানে তুমি আর কোন্ আশায় পড়ে থাকবে সোমা?

সোমা সহাস্যভাবে বলে—আপনি কোন্ আশায় এতদিন পড়েছিলেন শুচিদি?

শুচি আঁচলে বাঁধা খড়মজোড়া দেখিয়ে দিয়ে বলে—এরই আশায়।

সোমার মনের ভেতরটা হঠাৎ শিউরে ওঠে। একটু সংযত হয়ে নিয়ে বলে—এত বড় আশা আমি করি না শুচিদি। এত বড় পুণ্য বইবার শক্তি আমার নেই। আমার আশা খুবই ছোট শুচিদি, তবু তারই জন্যে পড়ে থাকবো।

একবার সোমার মুখের দিকে, আর একবার প্রবীরের মুখের দিকে তেমনি সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে নিয়ে শুচি আবার শান্তভাবে হাসে—তোমার আশা পূর্ণ হোক্ ভাই।

—যাই। শুচি কাঞ্চীপুরের দিক থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে সামনের সড়কের দিকে তাকায়। যতীদার পেছু পেছু হেঁটে গেলেও, শুচিকে দেখে মনে হয়, একেবারে একা একা সে চলে যাচ্ছে।

শিশুভবনে ফিরে এসে সোমা আর প্রবীর দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য যেন একটা শূন্যতার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে। সোমা ঘরের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে থাকে, কিন্তু গভীর স্বপ্নের বস্তুহীন কাজের মত কোন শব্দ হয় না। বিদ্যার্থী ছেলেরা খেয়েদেয়ে প্রবীরের অপেক্ষায় চুপ করেই বসেছিল। প্রবীরও নিঃশব্দে খেয়ে এসে আবার আঙিনার

চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। এ শূন্যতার মধ্যে শিশুভবনের প্রাণটাই শুধু যেন একটা অভ্যাসের জোরে নড়েচড়ে বেড়ায়, কিন্তু শব্দ করে না।

এর মধ্যে একমাত্র ভোলা আবোল তাবোল ভাষায় একটু সাড়া জাগিয়ে টল্‌তে টল্‌তে হেঁটে সোমার ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়, হামা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে চেষ্টা করে। সোমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভোলাকে তুলে নিয়ে খাটের ওপর বসিয়ে রাখে।

তারপরেই, শিশুভবনের এই নিঝুম মনটাকে যেন খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোল্‌বার জন্যেই তারার মা এসে সোমার ঘরে ঢুকে একটা সংবাদ দেয়।
—জনা চলে গেছে।

সোমা চীৎকার করে—জনা চলে গেছে?

তারার মা—হ্যাঁ!

সোমা—কেন?

প্রবীরও আশ্চর্য হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে—জনা চ'লে গেল কেন?

আশ্চর্য হবারই কথা। আজ তো জনাকে চলে যেতে বাধ্য করার মত কোন ঘটনা হয়নি, বরং এক বস্তা চাল এসেছে, জনা নিজেই ঘুম থেকে উঠে স্বচক্ষে দেখেছে যে, তারার মা রান্না আরম্ভ করে দিয়েছে। তবু জনা চলে যায় কেন?

সোমার গলার স্বরে তার গভীর অভিমান যেন আক্রোশের মত বেজে ওঠে—এই একরত্তি মেয়েটা আমাকে এতদিন ধ'রে জালিয়ে আজ পালিয়ে যায় কেন? ওকে ধরে নিয়ে এস, যেখানেই থাকুক।

প্রবীর একটু আশ্চর্য হয়েই হাসে—তুমি কার ওপর এত রাগ করছো?

সোমা—এতদিন ধ'রে রইল, জেদ ক'রে একটা ক' অক্ষর পর্যন্ত শিখলো না। একরত্তি মেয়ে সবাইকে এমন তুচ্ছ করে চলে যাবে……।

সোমার উচ্ছ্বসিত ক্ষোভ হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে যায়, আর কিছু বলতে পারে না।

তারার মা ধীরে ধীরে কতগুলি কথা বলে এই মুখর গবেষণার চাঞ্চল্য ধীরে ধীরে শান্ত ক'রে আনে—ও ছুঁড়ি তো আর ভাত খাবার জন্যে এখানে পড়ে ছিল না। ক' অক্ষর শেখবার জন্যেও নয়।

সোমা—তবে কিসের জন্যে?

তারার মা—ভোলার জন্যে। ভোলাকে তুমি কোলে নিয়েছ গুরু-মা, ছুঁড়িও নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে।

তারার মা আবার সবাইকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে চলে যায়। অনেকক্ষণ পরে এ স্তব্ধতা ভাঙ্গে।

প্রবীর বলে—এবার আমি যাই সোমা আর দেরি করা চলে না।

সোমার অন্তরাত্মা যেন অবসন্ন হয়ে আছে, তাই প্রবীরের কথায় আর চম্‌কে উঠতে পারে না। শান্তভাবেই একটু অনুরোধ করে—এখনই যাবে?

প্রবীর—হাঁ সোমা।

সোমা—আর কতদিন এভাবে চল্‌বে বলতে পার?

প্রবীর—কি?

সোমা—এই চলে যাবার পালা।

প্রবীর—আমি তো চ'লে যাই না সোমা, গিয়ে আবার আসি।

সোমা—তোমার কথা নয়, এই কাঞ্চীপুরের, এই শিশুভবনের কথা বলছি। এমন করে এত শীগগির ভাঙ্গন ধরবে, এ আমি বুঝতে পারিনি প্রবীর।

প্রবীর কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবে, যেন নিজের মনের ভেতর সব অন্ধকারের ধাঁধা থেকে খুঁজে খুঁজে একটা উত্তর উদ্ধার ক'রে নিয়ে বলে—ভেঙ্গে যাওয়াও বোধ হয় একটা নিয়ম সোমা, এর দরকার আছে।

সোমা—কিন্তু কী ভয়ংকর নিয়ম!

প্রবীর সোমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে

থাকে, পর মুহূর্তেই সে দৃষ্টি উচ্ছল মমতায় ভরে ওঠে,—এত ভয়ংকরকে সহ্য করতে বড় কষ্ট হচ্ছে সোমা ?

সোমা—হঁ্যা।

প্রবীর—তুমি তো এখন এখান থেকে চলে যেতে পার সোমা।

সোমা—তুমি যেতে বল্‌ছো ?

প্রবীর—আমি বলছি না।

সোমা—আমি যাব না।

প্রবীর হাস্‌তে থাকে—আচ্ছা, আপাততঃ আমি তো যাই।

সোমা—একটু দাঁড়াও, একটা কথা বলবার আছে।

প্রবীর—বল।

সোমা তার যুক্তিবুদ্ধির সমস্ত শক্তিগুলিকে গুছিয়ে নিয়ে প্রবীরকে একটা দুঃসাধ্য অনুরোধ করার জন্য প্রস্তুত হয়।

সোমা জিজ্ঞাসা করে—তুমি বলেছিলে, তুমি নরসিংহের ভক্ত।

প্রবীর—হঁ্যা।

সোমা—তুমি বলেছিলে, তুমি কাব্যতীর্থের শিষ্য।

প্রবীর—হঁ্যা।

সোমা—এই দুই একসঙ্গে কি ক'রে সম্ভব হয়? কাব্যতীর্থের শিষ্য হয়ে মানুষকে এত ভালবাস, আবার নরসিংহের ভক্ত হয়ে মানুষকে মারতে তোমার বাধে না। এ আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না প্রবীর।

প্রবীর শান্তভাবেই গভীর আগ্রহে সোমার কথাগুলি শুনছিল। সোমা আবার বলে—আমি বিদ্যের জোরে তোমাকে কিছু বোঝাতে চাই না প্রবীর, সে সাধ্য আমার নেই। কিন্তু মনে হয়, তুমি তো সেই পুরাণের ক্ষমাময় নরসিংহভক্তের মত নও, বরং তার উল্‌টো। তুমি নিজে নরসিংহ হয়ে প্রতিশোধ নিতে আর প্রতিহিংসা মেটাতে ছুটে বেড়াচ্ছো। এটা কি ঠিক হচ্ছে ?

প্রবীর—তুমি আমাকে কি বোঝাতে চাইছো সোমা?

সোমা—আমার অনুরোধ, তুমি নিজে ভয়ংকর হয়ে মানুষের মাথা ফাটিয়ে বেড়িয়ো না।

প্রবীর হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—মতিগঞ্জের এস-ডি-ও, ভরাকুল থানার পুলিশ, গোরার দল আর মাণিক চৌকীদার, এরা মানুষ? এদের ক্ষমা যারা করে তারাই মানুষ নয় সোমা।

প্রবীরের মুখটা বড় কঠোর, ও বড় হিংস্র হয়ে ওঠে—প্রতিশোধ ছাড়া কোন কাজের কথা আমি এখন ভাবতে পারি না সোমা। যেমন করে পারি, যেখানে পাই, যতটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে মারবো, আমাকে যারা প্রতিদিন মারছে, আমার সব ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে। এখন কি আমি বসে বসে ধ্যান ক'রে আমার ভুল খুঁজবো সোমা?

সোমার শান্ত ও অবিচল মূর্তিটা তেমনি নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে শুধু প্রবীরের এই জ্বালাভরা বিলাপ সহ্য করতে থাকে।

প্রবীর একটু শান্ত হয়, চোখদুটো তবু নিষ্কম্প শিখার মত জ্বলে।—যদি ভুল হয়েও থাকে, নিজে থেকেই সে ভুল ভাঙবে। কিন্তু আমি ভেবে ভেবে এ ভুল ভাঙতে চাই না, বরং চাই আমার ভুলও ভয়ংকর হয়েই ভাঙুক।

প্রবীর চলে যায়।

মাত্র কদিন হলো অমাবস্যাটা পার হয়েছে, দূর শংকরপুরের বিলের পশ্চিম কিনারায় জলের রেখার সঙ্গে টুকরো চাঁদের শীর্ণ আলোর রেখা মিশে রয়েছে। এখানে একটা বাঁশবনের বুকে অন্ধকার এখনো বাঁধা পড়ে আছে। শ্যামনগরের বাজার থেকে রাস্তাটা এতদূর এসে, এই বাঁশবনের ওপিঠে একটু বেঁকে গিয়ে বরাবর ভরাকুল থানা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। অল্প বাতাসে বাঁশের শরীরগুলি মট্ মট্ করে মোচড় দেয়।

আর মাণিক চৌকিদার প্রবীর মাস্টারের পা দুটো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, মৃত্যুভীত সজারুর মত আর্তনাদ করে।

স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ছিল মাণিক চৌকিদার, সমস্ত শরীরটা কাদায় মাখা। পা দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা। তিনজন গাঁয়ের লোক দাঁড়িয়েছিল মাণিক চৌকিদারের চারদিক ঘিরে, মৃত্যুর ফাঁদের মতই। দুজন চাষী ছেলে আর সদানন্দ। সদানন্দের হাতে একটা কাটারি।

অমাবস্যার রাত্রিটা থেকে আরম্ভ করে এই কটা দিন প্রতি রাত্রে গাছের মাথায় চড়ে বিনিদ্র শিকারীর মত পাহারা দিয়ে মাত্র গতকাল এই নিশাচর অভিশাপের ছায়াকে কায়াসুদ্ধ ধরতে পারা গেছে। কাল রাত থেকে আজ সারাদিন ও সন্ধ্যে পর্যন্ত এই বাঁশবনের ভেতরেই মাণিক চৌকিদারকে হাত পা ও মুখ বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল। চাষী ছেলেরা আজ সারাদিন ধরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রবীর মাস্টারকে খুঁজে বেড়িয়েছে। মাত্র এই সন্ধ্যারই কিছু পরে পাগলা বাউল অভিরামের ঘর থেকে প্রবীর মাস্টারকে ডেকে নিয়ে কিছুক্ষণ আগে তারা পৌঁছেছে। বিচার চাই। গ্রাম জীবনের শান্তির শত্রু, কলুষের ছায়া, গোরা লম্পটের দালাল, কোতোয়ালীর গোপন দূত মাণিক চৌকিদারের বিচার।

সদানন্দ বলে—এর আর বিচার কি মাস্টার মশাই? বিচার হয়েই আছে, আপনি শুধু দেখে নিয়ে সরে যান।

সদানন্দ মাণিকের একটা হাত ধরে নির্মমভাবে হ্যাঁচ্‌কা টান দেয়। মাণিক মাটিতে মুখ ঘসে আরও শক্ত ক'রে প্রবীরের পা জড়িয়ে ধরে।

সদানন্দ অস্থির হয়ে ওঠে—আপনি ওকে একটা লাথি মেরে পা ছাড়িয়ে সরে যান মাস্টার মশাই।

মাণিক চৌকিদার এইবার কাদা মাখামাখাটা দিয়ে প্রবীরের পা চেপে ধরে। প্রবীর মাস্টার কঠিন পাষাণের অনড় স্তম্ভের মত অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সদানন্দ ছট্‌ফট্‌ ক'রে কাটারি হাতে একটু পিছিয়ে যায়, চাঁদের আলো কাটারির পালিশে পড়ে একবার ঝক্‌ ঝক্‌ করে ওঠে। দূর বিলের কিনারায় জলে ডোবা কাশবনের ভেতর অকারণে ডাহুক ডাকে।

সদানন্দ এক লাফ দিয়ে আবার এগিয়ে এসে বলে—আপনি ঠিক অমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন মাস্টার মশাই, একটি কথাও বলবেন না। ওর বিচার হয়েই আছে, এবার ওকে নিয়ে গিয়ে ছুটি করে দিয়ে আসি।

কী এক ভয়ংকর পুলকে অধীর সদানন্দ, তবু কয়েক মুহূর্তের মত নিজেকে একবার সংযত করে। প্রবীর মাস্টারের দিকে হাত জোড় করে যেন কাতর প্রার্থনার মত স্বরে বলে—আমি দেবতার গায়ে হাত দিয়েছি, তাও আপনি মাপ করে দিয়েছেন। আর এই পশুর পশুটাকে ছুটি করে দেব, তার জন্ত দুটো কথা বলতে আপনি এত ভাববেন মাস্টার মশাই ?

প্রবীর মাস্টার তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। আবছা আলোকিত এই বনান্ধকারে বাতাসের সঙ্গে কতগুলি উৎপীড়িত ছায়া যেন ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় আশেপাশে। সাপের কামড়ে একটা ক্ষতবিক্ষত মুখের বেদনার্ত প্রতিচ্ছায়া এক মহাবিচারালয়ের কাছে তার নিগ্রহের প্রতিশোধ দাবি করে ফিরছে।

সদানন্দ বলে—আপনি আর 'না' করবেন না মাস্টার মশাই। জীবনে আমাকে একটা ভাল কাজ করতে দিন······এবার নিয়ে যাই।

মাণিক চৌকিদারের গলায় একটা গামছা জড়িয়ে টেনে তোলে সদানন্দ। চাষী ছেলে দু'জন পা দুটো শক্ত থাবা দিয়ে আঁকড়ে তুলে ধরে। নিশাচর ছায়ার কায়াকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলে যায় ঠাকুরপুরের বিলের কিনারায় কাশবনের দিকে।

প্রবীর মাস্টার নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

সদর মতিগঞ্জের বিকার নেই। সুধাময় ঠাকুরের পাটে বিস্মৃত বৈষ্ণব রাজার শ্রীস্তম্ভ তেমনি বিদেশী সৈনিকের তাঁবুর সঙ্গে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতি দুপুরে ব্যাঙ্কের দরজা নিয়মিত খোলে, প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত বন্ধ হয়। সিনেমা ভবনের সামনে জনতার মেলা নিয়ম মতই চলে। জ্বালামুখীর আঁচও লাগে না, এমনি কঠিন খোলস দিয়ে ঢাকা সদর মতিগঞ্জের শরীর। বিপ্লবে প্লাবিত হয়েও যায়নি, এমনই পোক্ত ভিৎ। এত রুধিরাক্ত পলিটিক্সে দীক্ষিত মতিগঞ্জর রাজপথে এক ফোঁটা রুধিরের চিহ্নও দেখা দিল না, আশ্চর্য। ত্যাগের আহ্বানে মতিগঞ্জের একটি নস্যির কৌটাও নিলামে বিকিয়ে গেল না, এটাও আর এক বিস্ময়। অথচ এই মতিগঞ্জই তো জেলার দেশপ্রেমের সদর, জাতীয়তার হেড অফিস এবং ত্যাগী ও বিপ্লবী, দুই নেতাও কারাগার ছেড়ে অনেকদিন হলো সুস্থভাবে ফিরে এসে ঘরে ঢুকেছেন।

অবশ্য জেলে যখন ছিলেন, তখন মতিগঞ্জের বিখ্যাত নেতা দু'জন চুপ করে ছিলেন না। সাধ্যমত জেলের ভেতর থেকেই সংগ্রাম করেছেন। সরকারি ভাতা বাড়াবার জন্যে প্রতিদিন দরখাস্ত করে ভৈরববাবু এক অবিরাম সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন, আর নয়ন সুরু করেছিল এক সবিরাম সংগ্রাম, জেল কর্তৃপক্ষকে ঘন ঘন অনশনের নোটিশ দিয়ে। কিন্তু সংগ্রাম ঘোরতর হয়ে ওঠবার আগেই পর পর সাত দিনের মধ্যে দু'জনেই নিজের নিজের অট্টালিকার কোলে ফিরে এলেন। তার পরেও তো ক'মাস হয়ে গেল, মতিগঞ্জের লোক দুটো পরামর্শের জন্য উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠলেও দু'জন নেতার একজনের নাগাল পায় না। কারণ, নয়ন ভয়ানক রকমের অসুস্থ এবং ভৈরববাবু নাকি যোগশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যাপৃত।

কোথায় কাঞ্চীপুর আর কোথায় মতিগঞ্জ! তবু জেলা গেজেটিয়ারে বলে, কাঞ্চীপুর নাকি মতিগঞ্জের অধীন একটি গ্রাম। কিন্তু কি করে

বিশ্বাস করা যায়? দুঃখের সমুদ্র হলো সুখের গোষ্পদের অধীন? আত্মোৎসর্গের হিমগিরি হলো স্বার্থের উইটিপির অধীন? কাঞ্চীপুরের অগ্নিপরীক্ষার জ্বালা হলো মতিগঞ্জের মিটমিটে জাতীয়তার জোনাকী আলোর অধীন?

মতিগঞ্জ আর কাঞ্চীপুর—সদর আর গ্রাম। কিন্তু যেন দুই ভিন্ন পৃথিবীর মাটি দিয়ে তৈরী দুটি অনাত্মীয় জনপদ। একটি অক্ষত, একটি বিধ্বস্ত। কাঞ্চীপুরের বেদনার কোন প্রতিধ্বনি মতিগঞ্জে পৌঁছায় না, গত ক'মাসের ঘটনায় এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে।

শুধু সখের রূপকথার মত মতিগঞ্জের জনসাধারণের কানে কানে কাঞ্চীপুরের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। শুনতে বেশ লাগে—কাবাতীর্থের কথা, প্রবীর মাস্টার ও তার ঝঞ্ঝাবাহিনীর কথা এবং আর এক রহস্যময়ী সংগ্রামিকা সোমা রায়ের কথা। মতিগঞ্জের কাছে কাঞ্চীপুর মাত্র একটা কৌতুহল, একটা সুখশ্রাব্য কিম্বদন্তী।

এইজন্যেই ভৈরববাবু মাঝে মাঝে খুবই চিন্তিত হয়ে উঠছিলেন। আগামী নির্বাচনে জেলা বোর্ডে ঠাঁই পাওয়া দূরের কথা, মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনেও নয়নের কাছে তাঁর পরাজয় অবধারিত। কাঞ্চীপুরের এইসব কিম্বদন্তীর জ্যান্ত নায়ক নায়িকাগুলি একবার যদি মতিগঞ্জের লোকের চোখের ওপর এসে নয়নকে সমর্থন ক'রে একটা পোস্টার আর দুটো ইস্তাহার ছাড়ে, তাহলে কি আর রক্ষে আছে? নয়নের সঙ্গে ভোটের লড়াইয়ে কোথায় যে তলিয়ে যেতে হবে, সেই আশঙ্কায় মাঝে মাঝে খুবই পীড়িত হতে থাকেন ভৈরববাবু।

নয়ন চৌধুরীও বিমর্ষ হয়ে ছিল। গ্রাম সেবা মণ্ডলের সঙ্গে সব সম্পর্ক কবেই তো চুকিয়ে দিয়েছে। তার জনপ্রিয়তার প্রধান বেদী থেকেই সে স্খলিত হয়ে আছে। অথচ দিন এগিয়ে আসছে, ইংরাজের রাগ ক্রমেই পড়ে আসছে, জেলা বোর্ডের নির্বাচনও আসন্ন হয়ে আসছে।

তার ওপর ভৈরববাবুও জেলের বাইরে সশরীরে ও সকৌশলে বোধ হয় এই আসন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে তৈরী হচ্ছেন।

এত নিরাশার অন্ধকারেও নয়নের মনে একটি আশার প্রদীপ জ্বলতে থাকে—সোমা রায়। একটি দিনের দেখা সেই প্রথম পরিচিতার স্মৃতি তার এই নিভৃত বন্দিত্ব ও কর্মহীন অবসরের মধ্যে আরও প্রখর হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে আজ এমন এক দূর দুর্গের অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে যেখানে গিয়ে তাকে উদ্ধার ক'রে আনবার সামর্থ্য নয়নের নেই। কিন্তু আজ না হোক্, একদিন সে আসবে। তার আমন্ত্রণের ব্যাকুলতার মর্ম টুকু উপলব্ধি করতে পারবে না, এত অল্পবুদ্ধির মেয়ে তো সে নয়। এত কোমল চিবুক দিয়ে গড়া যার মুখ, তার মনে অকৃতজ্ঞতা থাকতে পারে না।

একটা দিনের অল্পক্ষণের পরিচিতা হ'লেও সেই তো সোমা, যাকে সে চাকরি দিয়ে কাঞ্চীপুরে পাঠিয়েছিল, যার মা-বোনের জন্য প্রতিমাসে নিয়মিত টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছে। সেই মেয়েই আজ মতিগঞ্জের ঘরে ঘরে লোকের মুখে রূপকথার নায়িকা হয়ে উঠেছে। সোমার মায়ের কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর ভরা চিঠিগুলি তার টেবিলের দেরাজে ভরে রয়েছে। সোমার নামে লেখা সোমার বাড়ির চিঠিগুলিও তারই ঠিকানার অধীনে এসে জমে রয়েছে। এই ঠিকানাকে চিরজীবনের মত স্বীকার ক'রে নিতে সোমা কি আপত্তি করবে?

একটি চিঠি দেওয়া যায় না, একটি চিঠিও আসতে পারে না, এই অবরুদ্ধ কাঞ্চীপুরের দুঃখের প্রশ্রয় ছেড়ে কবে যে রূপকথার নায়িকা এসে এই চৌধুরী ভবনের প্রদীপ হয়ে উঠবে, কে জানে! সোমার মা শেষ যে চিঠিটা নয়নকে লিখেছেন, তার মধ্যে একটা আশ্বাসের আভাস আছে—'সোমার শুভাশুভের জন্য আপনি দায়ী……যে কোন ভাবেই হোক্ ওকে ঐ জঘন্য জায়গা থেকে উদ্ধার করবেন, এই আমার অনুরোধ

…এ দুর্দিনে আপনি যে উপকার করলেন সেঋণ কখনো শোধ করা যায় না।

সোমার মায়ের লেখা অনুরোধগুলি প'ড়তে প'ড়তে নয়নের মনটা নিজর কাছেই বড় ছোট হয়ে যায়। নিজের দুঃখভীরু মনের ক্ষুদ্রতাকে অন্ততঃ এই নিভৃতের চিন্তায় চাপা দিতে পারে না নয়ন। যাকে এখুনি উদ্ধার ক'রে আনা উচিত, তার অপেক্ষায় সে শুধু চুপ ক'রে ব'সে আছে। যে তার জীবনের কামনার এত সন্নিকটের মূর্তি, অথচ তার কাছে এগিয়ে যাওয়া সাধ্যের অতীত।

পিসীমাও মনের অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে মাসের পর মাস ছট্‌ফট্‌ করছিলেন। নয়নের উপযুক্ত পাত্রীও যখন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং নয়নেরও যখন এ পাত্রীকে মনে ধরেছে এবং পাত্রীর মা'ও যখন সম্মতি দিয়েই রেখেছেন—তখনও তাঁকে সব উৎসাহ স্তব্ধ ক'রে দিয়ে এমনভাবে ব'সে থাকতে হবে, এটা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। এটা নিতান্তই দুর্ভাগ্য। আর মেয়েটারই বা কি দুর্ভাগ্য? আহা, একবার চলে আসতে পারলে হয়। অল্প বয়সে চাকরি করতে এসে কোথায় এক খুনোখুনি রক্তারক্তির জগতে গিয়ে আটক হয়ে রইল!

নয়নের জীবনের সব জয় নেতৃত্ব প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ, সোমা রায় নামে সেই একটি দিনের পরিচিতার অভ্যাগমনের শুভ মুহূর্তটির সঙ্গে যেন মিশে রয়েছে। দূরপরাহতার পথ চেয়ে বসে আছে নয়ন, সর্বস্ব দিয়ে অভ্যর্থনা করার জন্য। কিন্তু গৃহপ্রান্তের এই নিরালাতেই দাঁড়িয়ে, এগিয়ে গিয়ে নয়। এগিয়ে যেতে পারে না, পুলিশের নিষেধ আছে।

হঠাৎ এই মতিগঞ্জ সহরেরই একটি সরকারি কক্ষে এক সন্ধ্যায় একটি বিস্ময় প্রতিধ্বনিত হয়—অ্যাঁ, এ যে দেখ্‌ছি তারকদার মেয়ে!

কোতোয়ালীর দপ্তরে বসে ফাইল ঘেঁটে রিপোর্ট পড়ছিলেন

ডি-এস পি। ডি-এস-পি হ'লেন একজন শ্রীযুক্ত দত্ত, তিনি শুধুই যে একটি সরকারি প্রাণী, তা-নয়। কোতোয়ালী ছাড়াও তাঁর জীবনের আদর্শ আছে। তিনি কায়স্থ আন্দোলনের একজন প্রগাঢ় সমর্থক।

ভরাকুল থানার প্রেরিত বিবরণ পড়তে পড়তে সম্মুখের আলোটার দিকেই বার বার ভ্রূকুটি করছিলেন ডি-এস-পি দত্ত। সোমা রায়ের ডায়েরীটা তাঁর চোখের সম্মুখে এক ভয়ংকর জাতহারানো অধঃপতনের নির্লজ্জ স্বীকৃতির মত পড়ে রয়েছে। কিন্তু এই সোমা তো আর পাটনীর মেয়ে নয়, তাঁরই জ্ঞাতি তারকদার মেয়ে, বংশোত্তম কায়স্থের মেয়ে। সেই মেয়েকে বন্দী ক'রে রেখেছে কুৎসিত এক জলচলহীন অস্পৃশ্য ষড়যন্ত্র। ডি-এস-পি'র মূর্তিটা বার বার উত্তেজিত হ'য়ে ক্রমেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল।

তারকদা'কে বিশ বছর আগে একবার দেখেছিলেন ডি এস-পি শ্রীযুক্ত দত্ত। গত বিশ বছরে তারকদা'র নামটা দু'বারও মনে পড়েছে কি না, তা'ও তিনি বলতে পারবেন না। তারকদা' যে আর ইহজগতে নেই, সেটা তিনি আজই জানতে পারলেন, ভরাকুল থানার প্রেরিত রিপোর্টের মধ্যে। সোমাকে তো জীবনে কোনদিনই দেখেননি, সোমা নামে একটা অস্তিত্বের খবরও তিনি জানতেন না। জানার দরকার ছিল না। কিন্তু এতদিন ধ'রে সম্পর্কটা নিঃশব্দ হয়ে থাকলেও, আজ সেটা বড় জোরে বেজে উঠছে, আকস্মিক এই আঘাতে। তাঁর জাতের মর্যাদা কলঙ্কিত হ'তে চলেছে, কি করেই বা ধৈর্য ধরে থাকবেন?

কিন্তু উপায়ই বা কি আছে? যে-ইংরাজের ওপর কোনদিন তাঁর রাগ হয়নি, আজ প্রথম সে-ইংরাজের ওপর রাগ হয়। ভারতরক্ষা আইনটাকে নিতান্ত সংকীর্ণ ও অক্ষম ব'লে মনে হয়। এর মধ্যে সব রকম রক্ষাকর অভিন্যান্সের সুযোগ রেখেও তাঁর জাত নিরাপদ করার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট একটা সুযোগ রাখেননি।

সবচেয়ে বেশী রাগ হয়, স্বদেশীওয়ালা নেতাগুলোর ওপর। কাপুরুষগুলো স্বদেশী করবার আর কাজ পায় না? আড়কাঠির মত কোথা থেকে একটা ভদ্রঘরের মেয়েকে ধ'রে এনে পাঠিয়ে দিয়েছে কাঞ্চীপুরের মত অজ পাড়াগাঁয়ে, এক অনাথ আশ্রমের শিশু পালন করতে? মেয়েটার জাত গেল কি রইল, তার জন্যে এই নেতাগুলোর কি এক ফোঁটাও দরদ আছে?

তারকদার মেয়ে! প্রতিধ্বনিটা যেন কোতোয়ালী ছেড়ে সেই সন্ধ্যোতেই ছুটে চলে গেল ভৈরববাবুর বাড়িতে। ডি এস পি শ্রীযুক্ত দত্ত এসে নানা কথার পর চ্যালেঞ্জ করলেন ভৈরববাবুকে—মানুষের জাত নষ্ট ক'রে আপনারা স্বদেশী করতে পারবেন না। মেয়েটাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করুন।

ভৈরববাবু—কার মেয়ে?

ডি-এস-পি—আমারই জ্ঞাতি তারকদা'র মেয়ে হ'লো সোমা। প্রবীর পাটনী নামে কাঞ্চীপুরের একটা পলিটিক্যাল অফেণ্ডার যে প্রেম ক'রে মেয়েটার মাথা খাচ্ছে, সে খবর রাখেন?

ভৈরববাবু উৎসাহের সঙ্গে ন'ড়ে চ'ড়ে বসেন—সোমা কি আমাদের সেই তারকদা'র মেয়ে, যাঁর সঙ্গে আলিপুর বারে চার বছর একসঙ্গে প্র্যাক্‌টিস্ করেছি? ন'দে জেলার হরগঙ্গাপুরে যাঁর দেশ? রায় বাড়ির তারকদা?

ডি-এস-পি—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভৈরববাবু প্রচণ্ডভাবে বিস্মিত হয়ে ওঠেন—বলেন কি? আমার তারকদার মেয়ে হ'লো সোমা?

ডি-এস-পি—ব'সে ব'সে আশ্চর্য হ'লে তো চল্‌বে না। মেয়েটাকে উদ্ধার করার একটা ব্যবস্থা করুন।

ভৈরববাবু একটু বিষণ্ণ হ'য়ে যেন আপসোস করেন—আমি সবই,

করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ বিষয়ে নয়নবাবু সাহায্য না ক'রলে একা আমার পক্ষে……মেয়েটি নয়নবাবুরই পার্টিতে আছে কি না!

ডি-এস-পি—চলুন নয়নবাবুর কাছে, তিনি কেমন সাহায্য না করেন আমি দেখ্‌ছি।

তারকদার মেয়ে! ভৈরববাবুর বাড়ি থেকে প্রতিধ্বনিটা মোটর গাড়ি চড়ে সোজা ছুটে আসে নয়ন চৌধুরীর বাড়িতে, সেই সন্ধ্যেতেই।

ডি-এস-পি'র ভুরু দুটো আক্রোশের স্পর্শে কুঞ্চিত হ'য়েই ছিল। নয়নের দিকে তাকিয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন—সোমাকে আপনিই কাঞ্চীপুরে পাঠিয়েছেন?

নয়ন বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে পলিটিক্স ক'রতে নয়, শিশু ভবনের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে।

ডি-এস পি—কিন্তু সে যে সেখানে পলিটিক্স করছে না, মাস্টারনিগিরিও করছে না, এখবর রাখেন?

নয়ন—আজ্ঞে না।

ডি-এস-পি বলেন—হুঁ।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থাকার পর ডি-এস-পি তাঁর চাপা আক্রোশকে একটু স্পষ্ট ক'রে দিয়ে প্রশ্ন করেন—মেয়েটা যে ডুবতে বসেছে, সে-খবর রাখেন?

নয়ন—ডুবতে বসেছে? তার মানে?

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে নয়নের মুখের ওপর একটা আতঙ্কের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। ডি-এস-পি'র রুক্ষ মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে নয়নের দৃষ্টিটা যেন করুণ কৌতূহলে ছলছল্ করে।

ভৈরববাবু সতর্ক মনস্তাত্ত্বিকের মত নয়নের আচরণগুলি যেন লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর চোখদুটো শুধু দূরদর্শিতার জন্যেই বিখ্যাত নয়, অন্তর্দর্শিতাও যথেষ্ট আছে। নয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে ক'টা মুহূর্তের

মধ্যে কি-একটা রহস্য আন্দাজ ক'রে নিলেন ভৈরববাবু এবং চকিত দৃষ্টির ইঙ্গিতে ডি-এস-পি'কে চুপ করিয়ে দিয়ে তিনিই উৎসাহিত ভাবে উত্তর দিলেন—তার মানে, কাঞ্চীপুরে এখন দুর্ভিক্ষ চলছে, মেয়েটা খেতে পাচ্ছে কি না সন্দেহ।

সব অভিযোগ আর চ্যালেঞ্জ ধীরভাবে শুনে নিয়ে নয়ন ধীরে ধীরেই অনুযোগের স্বরে বলেন—আমি তাকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে আনবার জন্যেই তৈরী হয়ে রয়েছি, কিন্তু পুলিশের বাধানিষেধের জন্যে কিছু করে উঠতে পারছি না।

ডি-এস-পি—সোমার আপন অভিভাবক কেউ আছেন?

নয়ন—আছেন। সোমার কাকা, হাজিপুরে থাকেন।

ডি-এস-পি—তাঁকে পত্রপাঠ চ'লে আসতে লিখে দিন।

ভৈরববাবু বলেন—তাহ'লে কথা রইল, উনি আসার পর আমরা একসঙ্গে গিয়ে সোমাকে নিয়ে আসবো।

নয়ন একটু চমকে উঠে ভৈরববাবুর দিকে তাকায়—আপনি যাবেন?

ভৈরববাবু—কি বলছেন নয়নবাবু? সোমা যে আমাদের তারকদার মেয়ে, না গিয়ে উপায় আছে? আগে জানলে আমি কবেই……।

নয়ন ভৈরববাবুর দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। বোধ হয় এই প্রথম।

পিসিমা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিলেন। প্রথমে উৎকণ্ঠভাবে স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন, পরে উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ব্যস্তভাবে বঙ্কুকে ডেকে বলেন—বঙ্কু, বেচুর বাবাকে একবার ভেতরে ডেকে নিয়ে আয় তো।

ভৈরববাবু অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এসে পিসিমাকে নমস্কার জানিয়ে প্রশ্ন করেন—বলুন পিসিমা।

পিসিমা—সোমাকে আপনারা আনতে যাচ্ছেন?

ভৈরববাবু—হ্যাঁ, ও যে আমাদেরই তারকদার মেয়ে।

পিসিমা সাগ্রহে অনুরোধ করেন—যত শীগ্‌গির পারেন, একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলুন, মেয়েটা বড় কষ্টে আছে।

ভৈরববাবু—কষ্টের চেয়ে আরও খারাপ বিপদের মধ্যে রয়েছে পিসিমা।

পিসিমা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন—আপনারা সবাই থাকতেও যদি মেয়েটার বিপদ হয়, তবে···।

ভৈরববাবু—কোন চিন্তা করবেন না পিসিমা, আমি যতক্ষণ আছি, কোন বিপদ হতে দেব না।

পিসিমা একটু ইতস্ততঃ করেন, কি যেন বল্‌তে চান্‌, তারপর বলেই ফেলেন—আপনি বোধ হয় একটা কথা জানেন না, বেচুর মা'র সঙ্গে দেখা হ'লেও জানাতে পারিনি ··যে দিনকাল যাচ্ছে, কাকে যে কি বল্‌বো ভেবেই পাই না।

ভৈরববাবুর দৃষ্টিতে একটা গভীর কৌতূহলের আভাস ফুটে ওঠে। পিসিমা বলতে থাকেন—সোমার বিপদ হ'লে এ সংসারের একটা ক্ষতি হয়ে যাবে, নয়নকেও আর সংসারী করতে পারবো না। সোমার মাও এ খবর জানেন, সোমাকে নিয়ে আসবার জন্যে তিনি বার বার চিঠি দিয়েছেন।

রহস্যটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়। ভৈরববাবু উৎসাহের সঙ্গে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন—আর বলতে হবে না পিসিমা। আপনি কিছু ভাববেন না।

ভৈরববাবু যেমন নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়ে যান, ডি-এস-পি শ্রীযুক্ত দত্ত'ও তেমনি আশ্বাস দিয়ে গেলেন—মেয়েটাকে নিয়ে আসবার একটা ব্যবস্থা করে ফেলুন, আমার যথাসাধ্য সাহায্য আমি করবো। করতে বাধ্য, এতো আর সরকারি চাকুরির প্রশ্ন নয়, আমার জাতের মানসম্মানের প্রশ্ন।

সুদূরপরাহত সোমা সন্নিকট হয়ে আসছে, এই আকস্মিক সৌভাগ্যের সূত্রপাতে মতিগঞ্জের চৌধুরী ভবন এতদিন পরে নিশ্চিন্ত হয়।

আরও নিশ্চিন্ত করে দিয়ে কয়েকদিন পরেই নয়নের টেলিগ্রামের উত্তরে সশরীরে চ'লে এলেন হাজিপুরের কণ্ট্রাক্টর সেজকাকা।

সোমাদের কোন খবর বহুদিন পর্যন্ত না রাখলেও আজ তিনি আর থাকতে পারেননি। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত সোমার প্রাণসঙ্কটের কথাও তিনি জানেন না, সোমার জাতসঙ্কটের কাহিনীও তিনি জানেন না, নয়নের মত বড়লোকের আহ্বান পেয়ে মুগ্ধ হয়েই এক কৌতূহলের আবেগে তিনি ছুটে চলে এসেছেন।

চক্রবেড়ের গলির কোণে একটা অসহায় একঘরে বাসার দেয়ালে জীর্ণ ফ্রেমে বন্দী তারকদা যেন পৃথিবীতে নতুন ক'রে আবিষ্কৃত হলেন, এক জাতগর্বের হঠাৎ অভ্যুত্থানের মধ্যে। সোমার জীবনকে অস্পৃশ্য বিপদের আক্রমণ থেকে উদ্ধার করার জন্যে আর কটি দিনের মধ্যেই প্রতিধ্বনিটা আরও সরব হয়ে ছুটে চলে গেল কাঞ্চীপুরের দিকে।

রওনা হয়ে গেলেন, সোমা রায়ের তিন কাকা। হাজিপুরের সেজকাকা, ডি-এস-পি দত্ত কাকা এবং ভৈরব কাকা।

শিশুভবনের বারান্দায় ছেলেমেয়েরা বসেছিল, এ ওর গা ঘেঁষে, শীতটা আজ খুব বেশী। সোমাও ভোলাকে কোলে করেই আজ পড়াতে বসেছে, ছেলেমেয়েদের মাঝখানে এক স্পর্শনিবিড় শিশুজনতার সঙ্গে যেন অঙ্গীভূত হয়ে।

কিন্তু শুধু শীতের জন্যে নয়। সোমা সকলকে একসঙ্গে জড়ো করে নিয়েছে, যেন দু'হাতে ওদের জড়িয়ে রাখা যায়, যেন ওরা পালিয়ে না যায়, যেন আর এই লুণ্ঠক দুরদৃষ্টের চঞ্চু কোন ফাঁকে এসে কাউকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যেতে না পারে।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই একটা ভয় করছিল সোমার এবং তার জন্যেই এই সতর্কতা। চালের বস্তাটা প্রায় খালি হয়ে এসেছে, আর সামান্য কিছু আছে। যতক্ষণ না এই শিশুভবনের পলাতক অদৃষ্ট পিতা হঠাৎ অন্নের ঝুলি নিয়ে পৌঁছয়, ততক্ষণ সহ্য করে থাকতেই হবে, এই শীতের হিমেল বাতাস আর মিষ্টি রোদের আলো পান ক'রে। ততক্ষণ যেন এই অবুঝ ক্ষুধার মূর্তিগুলো শিশুভবনের মায়াকে চরম সন্দেহ ক'রে পালিয়ে না যায়।

সোমা এক এক ক'রে নাম ধরে বলে—অতসী হরি বিন্দু, শোন। চারি নারাণ হারু, ভাল করে শোন আমি কি বল্‌ছি।

খুব আগ্রহের সঙ্গে সবাই শুনতে থাকে। অন্তরের সব মমতা ঢেলে দিয়ে সোমা আদরের সুরে বলতে থাকে—লক্ষ্মী মাণিক সব, আমাকে না বলে কেউ চলে যেও না। বেশ ?

সবাই এক সঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়, সোমার উপদেশ ওরা মনে প্রাণে মেনে নিচ্ছে, আর না বলে কেউ পালিয়ে যাবে না।

শিশুভবনের শিশিরার্দ্র আঙিনা হঠাৎ নানারকম জুতোর শব্দে মচ্‌ মচ্‌ করে ওঠে। দুজন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক, সঙ্গে আর একজন খাকি পোষাকের প্রৌঢ় চেহারা, আর একজন কনষ্টেবল।

কনষ্টেবল আঙিনাতেই দাঁড়িয়ে রইল। প্রৌঢ় তিনজন হন্‌ হন্‌ করে সোজা হেঁটে একেবারে বারান্দার ওপরে উঠে সোমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন।

এক ভদ্রলোক বলেন—কি রে সুমি ? চিন্‌তে পারছিস্‌ তো ?

সোমা চোখভরা বিস্ময় নিয়ে চিন্‌তে চেষ্টা করে। ভদ্রলোক নিজেই বলে ফেলেন—আমি সেজকা।

আর এক ভদ্রলোক বলেন—তুমি আমাকে চিন্‌তে পারবে না। আমি তোমার বাবার বন্ধু। তারকদা আর আমি এককালে একসঙ্গে আলিপুর বারে প্র্যাক্‌টিস্‌ করেছি।

খাকি পোষাকের ভদ্রলোক বলেন—আমি তোমার জ্ঞাতিকাকা, নাম বললে তোমার মা হয়তো আমাকে চিন্‌তে পারবেন, তুমি পারবে না।

অকস্মাৎ তিনটি পূজনীয়ের আবির্ভাব। তিনটি গুরুজন ও আপনজন। তবু সোমা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রণাম করা দূরে থাকুক, একটা মাদুর পেতে যথাসম্ভ্রমে আপ্যায়ন করতে ভুলে গেছে সোমা। কাঞ্চীপুরে এসে গ্রাম্য রূঢ়তার মধ্যে সোমার আচরণ থেকে যেন ভদ্রজনোচিত সাধারণ লৌকিকতাগুলিও মুছে গেছে।

সোমার নিঃশব্দ মূর্তি। যেন একটা প্রতিজ্ঞা নিঃশব্দে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সোমার চোখে আর বিস্ময়ের ছায়া নেই। কৌতূহলও আর চম্‌কে ওঠে না। মনটাও অপ্রস্তুত হয়ে নেই। পা দুটোও যেন অদ্ভুত এক অহংকারের ভারে অনড়। ঝড়ের মুখে উদ্ধত মন্দির চূড়ার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সোমা।

সেজকাকা আর কালক্ষেপ না ক'রে হুকুমের ভঙ্গীতে বল্‌লেন—আর এক মূহূর্ত দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে না, একটি কথাও বল্‌তে পারবে না, চুপচাপ লক্ষ্মীটির মত আমাদের সঙ্গে চলে এস। চল।

সোমা—কেন?

সেজকাকা ধমক দিয়ে ওঠেন—কেন আবার কি? ভদ্রলোকের মেয়ে ভদ্রসমাজে থাক্‌বে। এখানে থাকা চল্‌বে না।

সোমা—থাকলে দোষ কি?

সেজকাকা ভ্রূকুটি করেন—তোমার জাত চলে যাবে এই দোষ!

সোমার ভ্রূকুটি আরও বেশী তীব্র হয়ে ওঠে—তাই বলুন, এতক্ষণে বুঝলাম। আপনি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আসেননি, জাত বাঁচাবার জন্যে এসেছেন!

ক্রুদ্ধ সেজকাকার চোয়াল দুটো চড়্ চড়্ করে ওঠে—জাত গেলে যে প্রাণও চলে গেল ইডিয়ট মেয়ে।

সোমা—আপনার পাঞ্জাবীর সঙ্গে বিয়ের কথা শুনে কবেই ভয়ে আমার প্রাণ চলে গেছে। নতুন করে প্রাণ হারাবার আর ভয় নেই।

সেজকাকা চম্‌কে উঠেই স্তব্ধ হয়ে থাকেন। সোমার কথার আঘাতে হাজিপুরের কণ্ট্রাক্টারের একটা মস্ত বড় বোগাস্ দাবীর বিল যেন সকলের সামনে হাতে হাতে ধরা প'ড়ে গেছে। ভৈরব বাবুর মুহূর্তের মধ্যে সোমার কথার তাৎপর্য ও ইতিহাস বুঝে ফেলেন। ডি-এস-পি শ্রীযুক্ত দত্ত সেজকাকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিয়ে, তারপর বুঝতে পারেন।

—যাক্ গে ওসব কথা। ভৈরব বাবুই এইবার ঘটনাটাকে সাম্‌লাবার জন্য তৈরী হন।

ভৈরব বাবু স্নেহার্দ্র স্বরে বলেন—আমাদের কথা ছেড়ে দাও সোমা। ধর, আমরা তোমার কাকা নই, কেউ নই। কিন্তু তোমার ওপর যাদের দাবি আছে, তাঁরাই তোমাকে আর এক মুহূর্ত রাখতে রাজি নয় সোমা। তাদের কথা নিয়েই আমরা এখানে তোমাকে নিতে এসেছি।

সোমা—কার কথা নিয়ে এসেছেন?

ভৈরব বাবু—তোমার মা'র কথা মতই আমরা এসেছি। তা ছাড়া, যিনি তোমাকে এখানে পঠিয়েছিলেন, সেই নয়নবাবুর কথা মতই তোমাকে নিতে এসেছি।

সোমা বলে—কিন্তু আমি তো নয়নবাবুর কথায় এখানে আসিনি, মা'র কথাতেও আসিনি। যাঁর কথায় আমি এসেছিলাম, অন্ততঃ তিনি এসে না বললে আমি এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবতে পারি না।

ভৈরব বাবু—তিনি কে?

সোমা—হিতেন কাকাবাবু।

খাকি পোষাকের কাকা কৌতূহলী হয়ে হাজিপুরের সেজ কাকাকে জিজ্ঞেস করেন—হিতেন আবার কে? আপনার কোন্ ভাই?

হাজিপুরের সেজকাকা ভুরু কুঁচকে আর ঠোঁট কাম্‌ড়ে চিন্তা ক'রে উত্তর দেবার চেষ্টা করতে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারেন না। কে জানে, আপন ভাই না হোক্‌, এইরকম একটা জ্ঞাতি ভাই টাই হয়তো থেকে থাকবে। সেজকাকা ভেবে নিয়ে উত্তর দেন—আমারই এক খুব নিকট সম্পর্কের জ্ঞাতি ভাই।

সোমা বলে—হিতেন কাকাবাবু আমাদের জ্ঞাতিই নয়। আমার বন্ধু ভদ্রার বাবা।

—যাক্‌ গে ওসব কথা। ভৈরব বাবু যেন সেজকাকার বোগাস্‌ সত্তাটাকে আর একটা আঘাত থেকে আড়াল করে ফেলবার চেষ্টা করেন। সোমাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেন—বেশ তো, চল তোমাকে হিতেন বাবুর কাছেই পৌঁছে দিয়ে আসি।

সোমা—না, আসবার হলে তিনি নিজেই আসবেন। আমাকে যেতে হবে না।

ভৈরব বাবু আম্‌তা আম্‌তা করে বলেন—দেখ সোমা, তোমাকে কি ক'রেই বা বলি, বল্‌তে সঙ্কোচ হয়......।

সঙ্কোচে সত্যিই প্রথমে একটু বিব্রত বোধ করেন ভৈরব বাবু, তারপর নিঃসঙ্কোচ হয়ে যান। —এরই মধ্যে অনেকখানি জানাজানি হয়ে গেছে, তবু আমরা ব্যাপারটাকে এখানেই চাপা দিতে চাই। তোমার একটা বংশমর্যাদা আছে, তোমার মত মেয়ের পক্ষে প্রবীর মাস্টারের সঙ্গে ওসব সাজে না। এখান থেকে একবার বের হতে পারলেই তুমি তোমার ভুল বুঝতে পারবে। অবশ্য আমরা জানি, তোমার দোষ নেই, এখানে অসহায়ভাবে প'ড়ে আছ ব'লেই তোমার মন ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর সেই সুযোগে যত ছোট জাতের চক্রান্ত তোমাকে...।

সোমা—আমি এখান থেকে যাব না।

জ্ঞাতিকাকা শ্রীযুক্ত দত্ত সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটি গর্জন করেন—যেতে হবে, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।

সোমা হঠাৎ চম্‌কে গিয়ে খাকি পোষাকের দিকে তাকায়।

শ্রীযুক্ত দত্ত তাঁর খাকি পোষাকের একটা চক্‌চকে পেতলের বোতাম ধ'রে বলেন—আমি কোতোয়ালীর লোক, ডিউটি করতে এসেছি, তোমার কাছে কাকাগিরি করতে আসিনি। চল, কুইক্।

ডি-এস-পি শ্রীযুক্ত দত্ত, ভৈরব বাবু ও সেজকাকা বারান্দা থেকে আঙিনার ওপর নেমে আসেন। কনেস্টবলটা গা-ঝাড়া দিয়ে কেতা দুরস্ত ভাবে দাঁড়ায়।

ডি-এস-পি যত তাড়াতাড়ি করতে বললেন, সোমার পক্ষে ততটা করা সম্ভব হলো না। এত তাড়াতাড়ি করার সাধ্যও নেই, তার প্রাণ যে এই শিশুভবনের প্রাণের সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। আজ হঠাৎ তাড়াতাড়ি করলেই, এত তাড়াতাড়ি সে বাঁধন খুলবে কেন? জোর করতে গেলে এ বাঁধন শুধু ছিঁড়ে যেতে পারে কিন্তু তাতে বেদনাটাই আরও রক্তময় হয়ে উঠবে, তাকে বাঁধন খোলা বলে না। কিন্তু সোমা চায়, তার মনের সব সহ্যের শক্তি দিয়ে ধীরে ধীরে শান্তভাবে এ বাঁধন খুলে চলে যেতে। যেন ভোলা শান্তভাবেই কোল থেকে নেমে যায়, যেন অতসী বিন্দু হারু নারাণ শান্তভাবেই তাকে সন্দেহ না ক'রে বিদায় দেয়।

ভোলাকে একবার কোলে তুলে নিয়ে আবার নামিয়ে দেয় সোমা। অতসী বিন্দু হারু নারাণ, সবাই জটলা ক'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। সোমা ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য একবার মুসড়ে পড়ে, চোখ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। এই তো মাত্র কিছুক্ষণ আগে সবাইকে পালাতে নিষেধ ক'রে ভুয়ো গুরুমা স্বয়ং নিজে পালিয়ে যাচ্ছে, অতসীর দৃষ্টিটা কি নীরবে এই কথাই বল্‌ছে না?

তারার মা এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়। সর্ব আপদে ধীরবুদ্ধি, কষ্টের দাসী,

শক্ত বুড়ী তারার মা সোমার হাত ধ'রে অসহায় ভাবে আজ শিশুভবনের একটি শিশুর মতই তাকিয়ে থাকে। যা কখনো হয়নি, তারার মা'র চোখ দুটো জলে ভ'রে ওঠে। শক্ত ও রুক্ষ হাত দুটো দিয়ে সোমার হাতটা যেন আঁকড়ে ধরে তারার মা বলে—লক্ষ্মী চলে গেছে, সরস্বতী চললো, আমি আর এ পোড়া প্রাণ নিয়ে কতদিন এখানে প'ড়ে থাকবো গুরুমা? আমার যাবার ডাক আসবে কবে?

সোমা অস্ফুট স্বরে, যেন তার উত্তপ্ত নিশ্বাসের বাতাস দিয়ে কথা বলে —আসি তারার মা।

তারার মা—এস, এস, অন্ততঃ আমার যাবার আগে একটিবার এস।

মতিগঞ্জের কোতোয়ালীর ফটকের সামনে বিরাট ভিড় উদ্গ্রীব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু একটু দেখবার জন্য। কাঞ্চীপুর বিদ্রোহের সেই রহস্যময়ী সংগ্রামিকা গ্রেপ্তার হয়ে এখনি সদর কোতোয়ালীতে এসেছে।

ভিড়ের ভেতর একটা মোটর গাড়িও এসে ঢুকলো। পুলিশ জনতাকে ঠেলেঠুলে সরিয়ে দিয়ে মোটর গাড়ির পথ ক'রে দেয়। গাড়ি থেকে নামে কাঞ্চীপুরের সর্বজন পরিচিত যুবক নেতা নয়ন চৌধুরী, এবং নেমেই সোজা কোতোয়ালীর ভেতরে প্রবেশ করে।

একটু পরেই জনতা আর একবার প্রবলভাবে চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেই ভয়ংকর রূপকথার নায়িকাকে জামিনে মুক্ত ক'রে এবং সঙ্গে নিয়ে নয়ন আবার গাড়িতে এসে ওঠে। ভৈরব বাবুও কোতোয়ালী থেকে বের হয়ে এসে একই গাড়িতে ওঠেন। ভৈরব বাবু বসেন মাঝখানে, এক পাশে সোমা, আর এক পাশে নয়ন। ভৈরব বাবুকেই সবচেয়ে কৃতার্থ ব'লে মনে হচ্ছিল, পলিটিক্সকুশল ভৈরব বাবুর পরিকল্পনাটা বোধ হয় সার্থক হতে চলেছে। তিনি জয়ীর মত বসেছিলেন এবং জনতার জয়-ধ্বনির অভিনন্দনকে তিনিই বার বার দু'হাতের নমস্কারে প্রত্যুত্তর দিয়ে

একেবারে নিজের ক'রে নিচ্ছিলেন। আসন্ন নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে দূরদর্শী ভৈরব বাবু এখন থেকেই যেন ভোটগুলিকে আপন ক'রে রাখছিলেন।

হর্নের বিলাপে ভিড় ঠেলে গাড়ি অগ্রসর হয় এবং তারপরেই ধুলো উড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। হাজিপুরের কনট্রাক্টার সেজকাকা বোধ হয় আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তাঁকে কোথাও দেখা যায় না।

গাড়ি এসে থামে চৌধুরী ভবনের ফটকে। পিসিমা এগিয়ে এসে সোমাকে সাগ্রহে হাত ধ'রে বাড়ির ভেতর নিয়ে যান। যেতে যেতেই স্নেহাক্ত ভৎর্সনার স্বরে বলেন—তুমি আমাদের ভাবিয়ে ভাবিয়ে একেবারে মেরে ফেলেছ সোমা।

তারপরেই দোতলার একটি সুসজ্জিত ঘর, পাতালের বরুণালয় ছেড়ে একেবারে ইন্দ্রপুরী, তারই মধ্যে একটি সোফার ওপর বসে সোমার ক্লান্ত মন কিছুক্ষণের জন্য তার সমগ্র অস্তিত্বকে ভুলে যাবার চেষ্টা করে।

এ ঘরটাকেও যেন আজকালের মধ্যে নতুন ক'রে সাজানো হয়েছে এবং কার জন্য সাজানো হয়েছে তা'ও বুঝতে কষ্ট হয় না। উপকরণ-বহুল এই গৃহসজ্জার মধ্যে একটা আগ্রহের স্পর্শও রয়েছে মনে হয়, কে যেন খুব ভেবেচিন্তে সবকিছু যত্ন করে গুছিয়ে রেখে গেছে, একটি মেয়ের প্রাত্যহিক সাজসজ্জার জীবনে যা কিছু প্রয়োজন হ'তে পারে, সবই। প্রসাধন সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ঐ একটা আলমারী, চিরুণীটা হাতীর দাঁতের। বড় আয়নাতে প্রতিবিম্বিত আপাদমস্তক মূর্তিটা আসল মূর্তির চেয়ে বেশী ঝক্ ঝক্ করে। আর একটা আলমারী, থাক দিয়ে জামা-কাপড় সাজানো। একটা হ্যাঙ্গারে তোয়ালেই ঝুলছে ছ'টা। পালঙ্কের ওপর বিছানাটা একটা মির্জাপুরী রেশমের রেজাই দিয়ে ঢাকা। লেখবার জন্য একটা ছোট টেবিলও আছে ঘরের একপাশে, কাগজপত্র দোয়াত কলম সবই রাখা আছে। মীনার নক্সি করা দুটো সাদা পাথরের ফুলদানিও

রয়েছে, ফুলগুলিও একেবারে তাজা, সদ্য চয়িত বলে মনে হয়, এখনো জলের ছিটা গায়ে লেগে রয়েছে। আসবাবগুলি সবই সুন্দর। সোমা দৃষ্টি ঘুরিয়ে সবই দেখতে থাকে, কোনটাই কাঁচা কাঁঠাল কাঠের তৈরী নয়।

দিন কাটছিল কাঞ্চীপুরে, দিন কাটে মতিগঞ্জে। প্রথম দিনটা কেটে গেল, পুরণো চিঠিগুলি পড়তে পড়তে। চক্রবেড়ের একটা একঘরে বাসার পুঞ্জ পুঞ্জ আশীর্বাদ মিনতি, আবেদন এবং তার সঙ্গে মাঝে মাঝে অনুযোগ ও ভৎর্সনা।

"......এক মূহূর্ত দেরী না করে অজ পাড়াগাঁ ছেড়ে মতিগঞ্জে চলে এস।......নয়নবাবু যা বলবেন, নয়নবাবুর পিসিমা যা বলবেন, মন দিয়ে শুনবে, অবাধ্য হয়ো না। চুনি ও পান্না তোমার ওপর রাগ করে আছে। ......তোমার মাইনের টাকা, নয়নবাবু প্রতিমাসে নিয়মিত পাঠিয়ে দিয়েছেন, আজ একশো টাকা পেলাম।.....তোমাকে ছাইপাঁশ স্বদেশীগিরিও করতে হবে না, চাকরিও করতে হবে না। তোমার মত সব ভদ্রলোকের মেয়ে এই বয়সে সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামীর ঘর করে, তোমাকেও তাই করতে হবে......নয়নের পিসিমাকে আজ আমি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলাম যে, আমার আপত্তি দূরে থাক্, যদি হয় তো সৌভাগ্য বলে মেনে নেবে।

দ্বিতীয় দিনটা কেটে যায় ভদ্রার চিঠিগুলি পড়তে পড়তে। "...... পাশ করেছি সোমা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভয় করছে, এবার বোধ হয় ছাড়াছাড়ি নেই, মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ..... কিছুই ভাল লাগছে না সোমা. বোধ হয় খবর শুনেছ যে বাবা জেলে গিয়েছেন, কবে ছাড়া পাবেন ঠিক নেই। তোমার কোন উত্তর পাই না কেন? মা খুবই অসুখে পড়ে আছেন, আমরা সবাই এক রকম আছি। ......এবার আমার জন্মদিনটা বিনা উৎসবেই কেটে গেল সোমা। তুমি নেই, গান গাইবে কে?.....তোমার জন্য বড় চিন্তা হচ্ছে সোমা, উত্তর দিও।......।

শুনলাম, তুমি কাঞ্চীপুর ছেড়ে এবার থেকে মতিগঞ্জেই থাকবে, সুসংবাদ, নমস্কার সোমা।"

ভদ্রার শেষ চিঠিটার মধ্যে কেমন একটা অভিমান আছে। হঠাৎ নমস্কার ক'রে বিদায় নিয়ে ভদ্রা যেন অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। পর পর তারিখের এক একটা চিঠি, গত ক'মাসের ইতিহাস ঘটনার গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে কি ভাবে কোন্ পরিণামের দিকে কতদূর এগিয়ে গেছে, তারই পরিচয় পঞ্জিকা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে সোমার, তার সঙ্গে সম্পর্কহীন এই ভদ্রলোকের পৃথিবীর ঘটনাবিবর্তন ও ইতিহাসের মধ্যেও সে-ই প্রধান নায়িকা। এক তাড়িয়ে-দেওয়া তুচ্ছা মেয়ের জন্যে হঠাৎ এই পৃথিবীর এত চিন্তা? এ রহস্যের অর্থ কি? কারণ কি?

চিন্তার ভারে পীড়িত মনের বোঝা বইতে বইতে সোমার দোতলা জীবনের আরও কটা দিন কেটে যায়। এ রহস্যের কোন অর্থ বোঝা যায় না, নিতান্ত যেন ঘটনার ব্যভিচার আর খামখেয়াল।

কিন্তু সোমা বিষণ্ণ হয়ে থাকলে কিছু আসে যায় না। সোমার বিষণ্ণতার অর্থ বুঝতে পারবে, এ পৃথিবীতে তেমন কোন হৃদয়ও নেই। বরং সোমার সব দুশ্চিন্তাকে অনর্থক করে দিয়ে চৌধুরী ভবন দিন দিন যেন উৎসবচঞ্চল হয়ে উঠছে।

এরই মধ্যে পিসিমা এসে হেসে হেসে একটা ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্ট করেই শুনিয়ে যান—এ বাড়িতে তুমি এত লজ্জা করছো সোমা; কিন্তু আর ক'দিন পরে এই লজ্জার কথা মনে পড়লে তুমি আরও বেশী করে লজ্জা পাবে।

এক ফোঁটাও সংশয় নেই, কী বিশ্বাসে বিহ্বল হয়ে আছে চৌধুরী ভবন। সোমার মত মেয়ে, ষাট টাকার জন্যে যে কাঞ্চীপুরের দুঃখের মধ্যে জীবন বিকিয়ে দিতে যায়, তার আবার মতামতের প্রয়োজন কি? চৌধুরী ভবনের আহ্বান তো তার কাছে অভাবিত কল্পলোকের আহ্বান।

এ বিষয়ে সোমার মা'র মনেও যেমন কোন সংশয় নেই, নয়নের পিসিমারও নেই এবং নয়নেরও নেই! এ অভ্যর্থনা উপেক্ষা করবে, সোমাকে সেরকম বুদ্ধিহীনা বলে মনে করবার কোন কারণও নেই। অন্ততঃ নয়ন সেটা মনে করে না। জীবনে সব মেয়েই কোথাও না কোথাও বাঁধা পড়ে, যতই বিদ্রোহিনী হোক্ না কেন। এবং সোনার জাল পেলে স্মৃতির জালে কেউ বাঁধা পড়তে চাইবে, এমন অদ্ভুত খেয়ালিনী কি কেউ থাকতে পারে?

আজকের দিনটা মতিগঞ্জের পলিটিক্সের ইতিহাসের একটা লাল-অক্ষরের দিন। চরকা ও রুধিরে সমন্বয়ের দিন। চিরকালের কলিশন ছেড়ে দিয়ে নয়নের বৈঠকখানাতেই ভৈরববাবু ও নয়নের দলের কোয়ালিশন্ হয়ে গেল। প্রচার কার্যের জন্য একটা কমিটিও গঠিত হয়, তার সেক্রেটারীর নামটাও অবিসম্বাদিত অভিমত অনুসারে সুস্থির হয়ে যায়—সোমা রায়।

মঙ্গলদাস মুলুকচাঁদ বলেন—বাস্ বাস্, আজ আমার বিশোয়াস পুরা হোয়ে গেল। যখন নয়নবাবু আর ভৈরববাবু একট্‌ঠা হোয়েছেন, তখন স্বরাজ হোবেই হোবে।

নয়নের বৈঠকখানাতেই স্বরাজের ভিত্তি রচনার একটা প্রাথমিক পরিকল্পনাও হয়েযায়। মিউনিসিপালিটির সীটগুলির শতকরা ষাটটী সীটে ভৈরববাবুর লোক মনোনয়ন পাবে, বাকিগুলিতে নয়নবাবুর লোক। আর জেলা বোর্ডের সীটগুলিতে শতকরা ষাটটীতে নয়নবাবুর লোক, বাকি সীটে ভৈরববাবুর লোক। মিউনিসিপালিটির ওয়াটার ওয়ার্কসের জন্য যে স্কীমটা তৈরী হয়েও যুদ্ধের জন্য স্থগিত আছে, সেটার কণ্ট্রাক্ট মুলুকচাঁদই অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন।

নয়ন বলে—আপনি শুধু ইলেক্‌শনের সময় এইটুকু দেখবেন ভৈরববাবু,

কোয়ালিশনের নমিনী ছাড়া একটাও ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট যেন কোথাও পাত্তা না পায়।

ভৈরববাবু আশ্বাস দেন—সে বিষয়ে নিশ্চিন্তি থাকবে নয়ন। তুমি শুধু এখন থেকেই প্রপেগ্যাণ্ডার দিকটা জোর দিয়ে যাও, কখন্ কোন্ শহীদের কাকা-মামা এসে টপ্‌কে পড়ে ঘায়েল করে দেয়, কোন ঠিক নেই।

কোয়ালিশন দলের প্রথম বৈঠক শেষ হয়ে বৈঠকখানা ঘর আবার শূন্য হয়, কিন্তু নয়নের মন পূর্ণ হয়ে ওঠে—সফল সাধনার আনন্দে, সবদিক দিয়ে জয়ী হওয়ার আনন্দে। সব সুদূরপরাহত কামনা আজ সন্নিকটের ভরসা হয়ে গেছে।

কোয়ালিশন দলের মিলনচুক্তির ও প্রচার কমিটির খসড়াটি হাতে করে নয়ন বৈঠকখানা থেকে বের হয়, দোতলায় গিয়ে ওঠে এবং সোজা সোমার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে থামে।

—বড় ব্যস্ত ছিলাম এ ক'দিন, তাই কোন খোঁজ নিতে পারিনি। বলতে বলতে সোমার ঘরের ভেতর নয়ন উপস্থিত হয়।

হাতের ওপর খোলা বইটা বন্ধ করে সোমা বিড়ম্বিতভাবে তাকিয়ে থাকে। নয়ন তার রাজনৈতিক কীর্তিকলাপের নথিপত্রগুলি সোমার হাতের বইয়ের ওপরেই ছড়িয়ে দিয়ে বলে—আপনার ওপরেও একটা মস্ত দায়িত্ব পড়লো।

সোমা—আমার ওপর কিসের দায়িত্ব?

নয়ন—পড়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

সোমা—এসব পড়েও আমি কিছু বুঝতে পারবো না। বলুন।

নয়ন—ভৈরববাবুদের সঙ্গে আমাদের কোয়ালিশন হয়ে গেল।

সোমা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে—কিছুই বুঝলাম না।

নয়ন—আমাদের দু'জনের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে একটা

মস্ত বড় পার্থক্য আছে, কিন্তু তবু আমরা একসঙ্গে কাজ করবার জন্যে তৈরী হয়েছি।

সোমা—আপনাদের কাজটা কি?

নয়ন—কংগ্রেসের কাজ।

সোমা—কাঞ্চীপুরের কাব্যতীর্থ মশাই যেসব কংগ্রেসের কাজ করতেন, সেই সব কাজ?

নয়নের কথার উচ্ছ্বাস হঠাৎ একটু মন্দাক্রান্ত হয়।—না, ওসব নয়, ওটা হলো আর এক ধরণের কাজ। আমরা চাই, যাতে ইংরেজভক্ত রায়বাহাদুরের দল জেলা বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকতে না পারে। ওর মধ্যে যেটুকু ক্ষমতা আছে, সব আমরা দখল করে নিতে চাই।

সোমা—আপনারা কেন দখল করবেন? ইংরেজ-ভক্তদের সরিয়ে ইংরেজের শত্রুরাই এসব দখল করুক।

নয়নের কৌতূহল একটু তীব্র হয়ে ওঠে—আমরা না হলে, আপনি আর কাকে ইংরাজের শত্রু মনে করছেন?

সোমা—কাব্যতীর্থ মশাইয়ের দল।

নয়ন হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। সোমার কাছে একটা উল্লাস নিবেদন করতে এসে, এই রকম একটা তর্কের জেরায় পড়তে হবে, তা সে হয়তো কল্পনা করতে পারেনি। কেমন করেই বা পারবে? যখন নিজে ধন্য হয়ে থাকে, তখন সারা পৃথিবী ধন্য হয়ে আছে, এই বিশ্বাস নিয়েই চিরকাল পৃথিবীতে সে চল্‌ছে। তার কাছে পৃথিবীটা বোধ হয় একটা বিরাট চৌধুরীভবন ছাড়া আর কিছু নয়। সব কিছুতেই তার অধিকার আছে। ইচ্ছে হয়েছে, ইংরেজের শত্রু হবে। সখ হয়েছে, জেলা বোর্ড দখল করবে। সাধ হয়েছে, জননেতা হবে। এর বিরুদ্ধে যোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে কেন? আবার তার চেয়েও বেশী যোগ্য লোকের কথা ওঠে কেন?

নয়ন একটু অনুযোগের সুরে বলে—অন্ততঃ আপনার কাছে এই ধরণের কথা আশা করি না।

সোমা প্রশ্ন করে—কেন বলুন তো ?

নয়ন আবার বিব্রত হয়, এই কথাগুলিও তো তার ইচ্ছা ও বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা। সোমার ওপর নয়নের একটা বিশেষ দাবি আছে, এটাই একমাত্র যুক্তি। কোন্ অধিকারে দাবি করে, আবার এসব প্রশ্ন কেন ?

নয়ন—আপনাকেই আমাদের প্রচার কমিটির সেক্রেটারী করা হয়েছে।

সোমা—আমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে কেন করলেন ?

নয়ন—আপনাকে সম্বর্ধনা করার জন্যে আজ সন্ধ্যেবেলা এই বাগানে একটা সভার ব্যবস্থা করেছি। বিশেষ বিশেষ ভদ্রলোকেরা আসবেন।

সোমা—কেন এসব করলেন ? আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার খোঁজ না নিয়েই এতদূর এগিয়ে গেলেন কেন ?

নয়নের মুখটা হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যায়, মনের গভীরে চিরকেলে বিশ্বাসের উৎসটা যেন রুদ্ধ হয়ে যেতে থাকে। ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায় না, পেতে হলে যোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে। সোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার খোঁজ নেবার প্রয়োজনও তো সে বোধ করেনি, এবং সেইজন্যে সত্যিই যে অনেক দূর সে এগিয়ে গেছে।

সোমা হঠাৎ অন্য একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। —আমার মামলার তারিখটা কবে পড়লো ? খোঁজ করেছেন ?

বিষণ্ণ নয়নের মূর্তিটা সস্মিত হয়ে ওঠে—তার জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না।

সোমা—দুশ্চিন্তা নয়, চিন্তা করছি।

নয়ন কৃতার্থভাবে হাসে—ওসব কিছু নয়।

সোমা একটু বিস্মিত ভাবে তাকায়—তার মানে ?

নয়ন—কোন মামলাই হবে না।

সোমা—কেন ?

নয়ন—আপনার বিরুদ্ধে কোন চার্জসীটই পুলিশ দাখিল করেনি।

সোমা—এ অনুগ্রহ কেন ?

নয়ন—ডি-এস-পি মিঃ দত্ত যে আপনারই কাকা। তিনিই ওসব কিছু হতে দেননি।

সোমা গম্ভীর হয়ে বলে—এ খবরটাও তো আমাকে জানাতে হয়। আপনি এতদিন চুপ করে রইলেন কেন ?

নয়ন আবার বিব্রত বোধ করে এবং কুণ্ঠিত ভাবে বলে—খবরটা আপনাকে জানাবার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে, একথা আমার মনে হয়নি।

বলতে বলতে নয়ন ঘর ছেড়ে চলে যায়। আদৌ রাগ করে নয়, সোমার প্রশ্নগুলির ভ্রান্তি দেখে একটু বিস্মিত হয়েই। সোমার সম্পর্কে সব খবর নয়ন জানলেই তো সব জানা হয়ে গেল, কারণ সোমার ভালমন্দের ভবিষ্যৎ ও দায়িত্ব যে তারই ওপর। সোমা কি সে কথা জানে না ?

সবই জানে সোমা এবং জেনে শুনে তার অন্তরাত্মা হতভম্ব হয়ে গেছে। একদিন কাঞ্চীপুরের শিশুভবনে একলা রাতের অন্ধকারে তার ভয়ার্ত প্রাণ ফুঁপিয়ে উঠেছিল—মা তুমি এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাও। সোমার সেই আবেদন এখন বর্ণে বর্ণে সার্থক হয়েছে, তাকে উদ্ধার করেই আনা হয়েছে। তবু এ বিষণ্ণতা কেন ?

এই তো সুন্দর আগ্রহ দিয়ে ঘেরা আর একটা রঙীন জগৎ, এর মধ্যে সে নগণ্য নয়, বরং তারই প্রসন্নতায় সব প্রসন্ন হয়ে রয়েছে। এখানেও চোখের সামনে যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, না-চাইতে হাতের কাছে যা চলে আসছে, এসবই তো আশার অতিরিক্ত। তবু সব বুঝেও বুঝে

উঠতে পারে না সোমা, চিন্তার শক্তি ফুরিয়ে আসে। শুধু মনে হয়, এই সুন্দর প্রহেলিকার মধ্যে সে আজ নিতান্ত অসহায়ভাবে বন্দিনী।

চক্রবেড়ের গলির কোণে একটা রিক্তমূর্তি বাসার মধ্যে এক স্বামিহীনা প্রৌঢ়ার বেদনাক্লিষ্ট মুখের ছবিটা সোমার চোখে ভেসে ওঠে। সে তো তারই মা. সেই মুখ এতদিনে সচ্ছল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ মায়ের সব উপদেশ মমতা ও আবেদন সন্দেহ ক'রে, আবার ঐ মুখ বিষণ্ণ করে দিতে হলে যে নির্মম শক্তির প্রয়োজন, এই প্রহেলিকার নীড়ে বসে সোমা নিজের মধ্যে আজ সে শক্তি খুঁজে পায় না। শুধু মনে হয় তার জীবনটা যেন এক অন্ধকারে পথ ভুলে হঠাৎ জলে ডুবে গিয়েছিল। সেই ক্ষণিকের সংজ্ঞাহীন জীবনের স্মৃতি হলো কাঞ্চীপুর। বড় আবছা, বহুদিনের অতীত, বহু দূরে বিদূরিত জীবন। আজ যেন ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সব একে একে বুঝতে পারছে সোমা।

শুধু নিজের মা কেন, এ বাড়ির পিসিমার যখন তখন মমতাভরা ডাক, আগ্রহভরা যত্ন আর উঠতে বসতে সমাদর—এসবও কি সন্দেহ করার জিনিস? নিতান্ত মিথ্যা আর তুচ্ছ? সোফার ওপর সোমার অবসন্ন মূর্তিটার দিকে তাকালে মনে হয়, তার অল্পদিনের পরিচিতা পিসিমা নামে এই মাতৃতুল্যার ভরসাকে অপমান করার মত শক্তি তার হারিয়ে গেছে। কাঞ্চীপুরের বিদ্রোহিনীর সত্তা এক নতুন ওষধির মাদকতায় ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছে, আর জেগে উঠতে পারবে কি না সন্দেহ।

সোমা হঠাৎ যেন জোর করে মনটাকে চিন্তার গ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য ঘর ছেড়ে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। একটা বুকভরা নিশ্বাসের জন্যে বারান্দার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে যেন বাইরের বাতাস খুঁজতে থাকে সোমা।

বারান্দার শেষ দিকে একটা টবের ক্রিসেন্থেমাম, তারই পাশে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালে বাগানটা দেখা যায়। সোমা স্থিরদৃষ্টি মেলে

দেখতে থাকে, তারই সম্বর্দ্ধনার জন্য একটা মণ্ডপ তৈরী হয়েছে, ওপরে রঙীন ঝালর আর তার নীচে ফুলের টব দিয়ে মালঞ্চের মত একটা মঞ্চ। নয়ন নিজেই ঘুরে ফিরে লোকজনকে কাজের নির্দেশ দিচ্ছে। বোধ হয় যতদূর সম্ভব সুন্দর করে সাজাবার চেষ্টা করছে নয়ন এবং মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ছে।

দেখতে দেখতে সোমার মুখটা বিবর্ণ হয়ে আসে। এ প্রহেলিকা তো নিতান্ত অলীক নয়। এ যে একটা মানুষের নিদ্রাহীন রাত্রির চিন্তা দিয়ে, জাগ্রত দিবসের পরিশ্রান্তি দিয়ে, সঙ্গোপন স্বপ্নের আগ্রহ দিয়ে তৈরী প্রহেলিকা। সোমা প্রায় ছুটে এসে নিজের ঘরে ঢোকে, বিছানার ওপর নিঃশব্দে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। বদ্ধ নিঃশ্বাসটা যেন চূর্ণ হয়ে গিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করে—উদ্গার কর। কিন্তু দেখে মনে হয়, এক বন্দিনীর আত্মসমর্পিত সত্তা মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

—সোমা! পিসিমার আহ্বানে চমকে উঠে বসে সোমা। পিসিমা সস্নেহ ভাবে ভর্ৎসনা করেন—ছিঃ, তুমি তো একেবারে ছেলেমানুষটি নও সোমা। এরকম করছো কেন?

পিসিমা একটু চুপ করে থেকেই আবার ব্যস্ত হয়ে বলেন—নাও ওঠ, বেচুর মা তোমাকে একবার দেখতে চাইছেন, গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

পিসিমা নিজেই আলমারী খুলে বেছে বেছে ভাল একটা শাড়ি বের করে সামনে রাখেন—এইটা পরবে, বুঝলে? তোমাকে এরকম রুক্ষসূক্ষ হয়ে আমি বাইরে যেতে দিতে পারি না।

সোমার হাত ধরে মৃদুভাবে একটা টান দিয়ে পিসিমা বলেন—ওঠ ওঠ ওঠ, একটু ভাল করে সাজ সোমা, আমার কথাটা একটু গ্রাহ্যি করতে শেখ। সব বুঝেও বোঝ না কেন?

পিসিমা চলে যান। সোমা স্নান করে আবার নিজের ঘরে ফিরে

আসে। পিসিমার নির্দেশ মত সেই সাড়িটাই পরে। চৌধুরী ভবনের সম্মান রাখার জন্যে তাকে আজ ভাল করে সাজতে হবে। সাজবার যতটুকু নিয়ম জানা আছে, সবই করে সোমা। ইচ্ছে ক'রে কোন ত্রুটি সে আজ আর রাখতে চায় না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখে। রুমাল দিয়ে কপালটা ঘসে নিয়ে কাজলের বাটিটায় আঙুল ডুবিয়ে একটা টিপ তুলে নেয়।

হাতটা হঠাৎ কাঁপে, কপালটা ঘেমে ওঠে, নিঃশ্বাস এলোমেলো হয়ে যায়। রুমাল দিয়ে আঙ্গুলের কাজল মুছে ফেলে আয়নার কাছ থেকে দু'পা পিছিয়ে যায় সোমা। হঠাৎ মনে হয়, এক কুৎসিত উৎকোচের স্পর্শে এ রঙীন শাড়ির প্রতিটি সুতো অশুচি হয়ে রয়েছে।

কাঞ্চীপুর থেকে গ্রেপ্তার হয়ে আসার সময় যে কালোপাড়ের প্লেন শাড়িটা পরে এসেছিল আবার সেই শাড়িটাই পরে সোমা। পিসিমা আবার ডাকতে এসে হতভম্ভ হয়ে দেখতে থাকেন, তাঁরই নির্বাচিত রঙীন শাড়িটা অপমানে জড়োসড়ো হয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে, আর সোমা দাঁড়িয়ে আছে টেবিলে ঠেস দিয়ে, জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে, একটা কদর্য রকমের রুক্ষসূক্ষ মূর্তি।

পিসিমার কথাগুলি তীক্ষ্ণ ভৎর্সনার মত—এ কী হলো সোমা?

সোমা—আমি কোথাও যেতে পারবো না।

পিসিমা—যেতে পারবে না, সেটা তো আমাকে ভাল করে বললেই হতো। কিন্তু এ কি রকমের ব্যবহার? কটা মাস পাড়াগাঁয়ে থেকে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধিও যে.........।

পিসিমা তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ না ক'রেই হন্ হন্ করে চলে যান।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিল সোমা সে জানে না। তার চেতনার চারদিকে একটা বর্ণময় প্রহেলিকা যেন দুঃসহ প্রদাহের মত ঘিরে রয়েছে।

বঙ্কু এসে দুটো চিঠি দিয়ে যায় আর জিজ্ঞাসা করে—আপনার খাবার নিয়ে আসি।

সোমা উত্তর দেয়—না।

সোমা চিঠি পড়ে। প্রথম চিঠিটা চক্রবেড়ে থেকে, মা লিখেছেন। সোমা দু'বার চিঠিটা পড়ে। কাগজ টেনে নিয়ে উত্তর লিখতে থাকে। জীবনে এই প্রথম মা'র চিঠিকে পত্রপাঠ উত্তর জানিয়ে দেয় সোমা।

"মা, তুমি তো জান, গঙ্গাসাগরে মেয়েকে ভাসিয়ে দেওয়া কী নিষ্ঠুর কাজ। কিন্তু মেয়েকে বিক্রী করা কি তার চেয়ে নিষ্ঠুর কাজ নয়? ....."

লেখা শেষ ক'রেই চিঠিটার ওপর কিছুক্ষন মাথা চেপে পড়ে থাকে সোমা। অনেকক্ষণ, দু'চোখ থেকে জল গড়িয়ে চিঠি ভিজে যায়।

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে লেখে সোমা—"মা, তুমি মাপ করো......প্রণাম নিও।"

কলকাতা শ্যামবাজার থেকে লেখা ভদ্রার মা'র চিঠিটাও পড়ে সোমা।

"তুমি খবরটা শুনে খুবই দুঃখ পাবে সোমা, তবু জানাচ্ছি। তোমার কাকাবাবু জেলে থাকতেই আমাদের মায়া কাটিয়ে চিরকালের মত চলে গেছেন। নিউমোনিয়া হয়েছিল।......তোমার বিয়ের খবর শুনে সুখী হলাম সোমা। তোমার কাকাবাবু বেঁচে থাকতেই নয়নের সঙ্গে ভদ্রাকে বিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। যাই হোক, তুমিও তো আমার মেয়ে, এক মেয়ের সঙ্গে না হয়ে আর এক মেয়ের সঙ্গে হলো।...... সুখী হও।"

কাকাবাবু! সোমার বেদনা আর বাঁধ মানে না। কান্নারও মাত্রা থাকে না। জ্ঞাতিও নয়, আত্মীয় নয়, কিন্তু ছিলেন কাকাবাবু নামে শ্যামবাজারের সেই সৌম্য ও সহৃদয় হাসির মূর্তিই যে তার স্বজনের চেয়েও আপন ছিল। এতদিন মনে মনে ছিলেন কাকাবাবুর ওপর কী গভীর অভিমান পুষে এসেছে সোমা। যাঁর কথা শিরোধার্য ক'রে ঘর-ছাড়া

হয়ে সোমা এতদিন এখানে বরুণালয়ের জলে ডুবছে, অগ্নিপরীক্ষায় পুড়ছে, প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে, প্রহেলিকায় বন্দিনী হচ্ছে, তিনিই শুধু আজ পর্যন্ত একটিও উপদেশ পাঠাননি। অথচ সোমার বিশ্বাস ছিল, শেষ পর্যন্ত হিতেন কাকাবাবু একবার আসবেনই এবং সেদিন সোমা তার ভদ্রপৃথিবীর একমাত্র শ্রদ্ধার মূর্তির কাছে নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞেসা ক'রে নেবে—আমার ভুল কোথায় হলো কাকাবাবু? সত্যিই কি আমার জাত যাচ্ছে?

যাক্, উপদেশ চাইবার মত যে একটি মাত্র আশ্রয় ছিল, তা'ও ঘুচে গেল। বন্ধন মুক্ত হয়ে সোমা যেন আবার এ পৃথিবীতে স্বতন্ত্রা হয়ে ওঠে, নিজেরই চিত্তের গভীরে অন্বেষণ ক'রে তাকে আজ সব উপদেশ খুঁজতে হবে। সোমার শোকাচ্ছন্ন মন আবার সুস্থ হয়ে ওঠে এবং শান্ত মনের ক্ষণিক চিন্তার মধ্যেই যেন গুঞ্জন ধ্বনির মত শুনতে পায়—নিজে যা সত্য ব'লে বুঝবে, তাই একমাত্র পথ।

পিসিমা আর খোঁজ নিতে আসেননি। সোমা খেয়েছে কি না, কিম্বা কেন খায়নি, এ প্রশ্ন নিয়ে তিনি অন্যদিনের মত আর হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলেন না।

আবার বঙ্কুই এল অনেকক্ষণ পরে। সোমা তখন ঘরের মেজের ওপর শুয়েছিল, জানালা দিয়ে পড়ন্ত রোদের এক ঝলক আলো এসে সোমার মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বঙ্কু ডাকে—দিদিমণি?

সোমা যেন স্বপ্ন থেকে উঠে বলে—কে ডাকছে?

বঙ্কু বলে—আমি বঙ্কু। একটি ছেলে নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চায়।

—কে? কই? কে দেখা করতে এসেছে? সোমা উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘর থেকে বের হ'য়ে সিঁড়ি ধরে নামতে থাকে। বঙ্কুও পেছু পেছু আসে।

নয়নের লাইব্রেরী ঘরের দরজার কাছে, বারান্দার ওপর একটি ছেলে দাঁড়িয়েছিল, কাঞ্চীপুর বাণীপীঠের একটি বিদ্যার্থী। সোমা এগিয়ে আসতেই ছেলেটি বলে—আমি শঙ্কর।

সোমা বলে—হ্যাঁ চিনেছি।

শঙ্কর—আমি আজই আসছি গুরুমা।

সোমা—কি খবর বল ?

শঙ্কর বড় বুদ্ধিমান, বঙ্কুর দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে—বড় জল তেষ্টা পেয়েছে গুরুমা।

সোমা বলে—বঙ্কু, জল নিয়ে এস।

বঙ্কু চলে যেতেই শঙ্কর একটা খামে বন্ধ চিঠি সোমার হাতে দেয়। চিঠিটা মুঠোর মধ্যে ধ'রে সোমার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে থাকে। সোমা বলে—আমি এই ঘরের ভেতরে আছি, তুমি একটু বসো শঙ্কর।

সোমা লাইব্রেরী ঘরের ভেতরে ঢুকে চিঠিটা খুলে প'ড়তে থাকে।

"তুমি তোমার কথা রেখেছ, আমি আমার কথা রেখেছি। আমি তোমাকে চলে যেতে দিইনি, তুমিও চলে যেতে চাওনি। তবু তোমাকে চলে যেতে হলো। আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে সোমা।"

চারদিকের শব্দের আলোড়ন হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, সোমা কিছু শুনতে পায় না। একটি শূন্যতার মাঝখানে যেন একা বসে থাকে সোমা।

এই সমাধির গ্রাস থেকে আত্মরক্ষার জন্যই যেন সোমা চেঁচিয়ে ডাক দেয়—শঙ্কর, এখানে এসে ব'সো।

শঙ্কর লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে সোমার কাছে এসে বসে। কাঞ্চীপুরের দু'টি দুঃখের প্রতিনিধি, যেন নিঃশব্দে ব'সে ব'সে মতিগঞ্জের উদ্ধত হৃৎপিণ্ডের উল্লাস শুনতে থাকে। যেন এর সমাপ্তি দেখবার জন্যে ওরা শুধু একটি চরম মুহূর্তের অপেক্ষায় বসে থাকে।

সম্বর্ধনার মণ্ডপে তখন আলো জলতে আরম্ভ করেছে। চৌধুরী ভবনের অন্তর্লোকে একটা উৎসবের আকুলতা ফুটে উঠছে প্রখর হয়ে। কিন্তু তখনো লাইব্রেরী ঘরের একান্তে বসেছিল শঙ্কর আর সোমা, গরিব ভাই যেমন বোনের বড়লোক শ্বশুরবাড়িতে এসে একটু সঙ্কোচে একান্তে বসে আলাপ করে, এ দৃশ্যও তেমনই।

বোধ হয় দোতলা থেকে নেমে এল নয়ন। একটু উদ্বিগ্ন হয়ে। ব্যস্তভাবেই এসে লাইব্রেরী ঘরে ঢোকে। শঙ্করকে দেখতে পেয়েই সোমাকে জিজ্ঞেস করে—ছেলেটি কে?

সোমা উত্তর দেয়—কাঞ্চীপুরের ছেলে।

নয়ন সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে মণিব্যাগ বার করে। সোমা জিজ্ঞেস করে—ও কি করছেন?

নয়ন—কিছু দিয়ে দিই।

সোমা—না।

শঙ্করের দিকে তাকিয়ে সোমা বলে—শঙ্কর তুমি একটু বাইরে বসো।

শঙ্কর বাইরে গিয়ে বসতেই লাইব্রেরী ঘরটা কিছুক্ষণের মত নীরব হয়ে যায়। সোমা দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের মেজের দিকে তাকিয়ে, স্থির হয়ে। নয়ন দাঁড়িয়ে থাকে সোমারই মুখের দিকে তাকিয়ে, কথা হারিয়ে। এই সন্ধ্যারাতের পৃথিবী যেন নিজে মুখর হয়ে, লাইব্রেরী ঘরের নিভৃতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা একটি মৌন সান্নিধ্য রচনা করে দিয়েছে এবং এই পৃথিবীরই ইতিহাস যেন চেষ্টা করে এক সুদূরপরাহতাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে, নয়নেরই জীবনের উপহাররূপে। নয়নের মুখের ভাষা এই আবেগময় মুহূর্তে হারিয়ে যাবারই কথা।

কথা বলে সোমা—আপনার কি অনেক টাকা আছে নয়নবাবু?

নয়ন চমকে উঠে বলে—তা আছে।......কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করছো কেন সোমা?

এই সান্নিধ্যের মোহময় স্পর্শেই বোধ হয় নয়নের মুখের ভাষা সোমার এত কাছাকাছি চলে আসে। সোমা নয়নের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

সোমা জিজ্ঞেস করে—দেশের কাজে আপনার বোধ হয় অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়?

নয়ন—হ্যাঁ, গত এক বছরে সবসুদ্ধ প্রায় এগার হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে।

সোমা—আমার জন্য কত খরচ করেছেন?

নয়ন বিব্রতভাবে বলে—তোমার জন্যে?……ও বুঝেছি, ন'শো টাকারও বেশী তোমার মাকে পাঠিয়েছি।

সোমা—আপনি অনেক উপকার করেছেন নয়নবাবু।

নয়ন—উপকার করা সার্থক হয়েছে সোমা, তার চেয়ে ঢের বেশী প্রতিদান পেয়ে গেছি।

সোমা—এখনও পাননি নয়নবাবু।

নয়ন কৃতার্থভাবে বলে—সেদিনেরও আর বেশী দেরি নেই সোমা।

সোমা চকিতে আর একবার নয়নের দিকে তাকায়।—আপনি একটা বিরাট শিশু-শিক্ষার কেন্দ্র খুলবেন বলেছিলেন, তার কি হলো?

নয়ন—আর তো কোন প্রয়োজন নেই সোমা।

সোমা—কেন?

নয়ন—যার জন্যে সে পরিকল্পনা করেছিলাম, সে তো আমার ঘরেই এসে গেছে।

সোমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, জানলার গা-ঘেঁসা লতাবিতানের আলোছায়ার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বোধ হয় তার চোখের দুঃসহ চাঞ্চল্যকে সংযত করে।

সোমা বলে—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো নয়নবাবু?

নয়ন—বল।

সোমা—যদি এক বছর আগে চক্রবেড়ে থেকে আমার একখানা ফটো পাঠিয়ে দিয়ে কেউ আপনাকে অনুরোধ করতো আমাকে বিয়ে করার জন্যে, আপনি রাজি হতেন?

নয়ন চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবে, নিজের মনের দিকে তাকিয়ে উত্তর খোঁজে এবং অসংকোচেই সত্য কথাটা বলে—রাজি হতাম না।

সোমা—আজ কেন রাজি হয়েছেন?

নয়ন—তুমি তো আজ একটা ফটো নও সোমা, তুমি আজ রূপকথা।

সোমা—এ রূপকথাকে তো আপনি রূপ দেননি নয়নবাবু, তবে তার ওপর আপনার লোভ কেন?

নয়ন—জীবনে জয়ী হতে, সুখী হতে, কার না লোভ হয় সোমা? তোমাকে পেলেই যে আমার সব জয় আর সুখ পূর্ণ হয়।

সোমা—খ্যাতিও পূর্ণ হয়, ত্রিশটা গ্রামের ভোটও জয় করা হয়।

নয়নের সব কথার আগ্রহ হঠাৎ আহত হয়, কিন্তু এ সন্ধিক্ষণে নয়নের মনের কপাট যেন খুলে গেছে, কোন কথাকেই মিথ্যা দিয়ে সাজিয়ে বলতে চায় না নয়ন। নয়ন বলে—হ্যাঁ তাও হয় সোমা।

সোমা প্রশ্ন করে—কিন্তু ত্রিশটা গ্রামের ভোট আর পরের তৈরী রূপকথাকে জয় করবার কি অধিকার আপনার আছে নয়নবাবু?

নয়নের মুখচোখ থেকে সব আগ্রহের চাঞ্চল্য যেন কিছুক্ষণের মত মুছে যায়। মনের গভীরে অতি বিশ্বাসে লালিত একটা প্রত্যয় হঠাৎ ভাঙনের টানে যেন কেঁপে উঠেছে। লাইব্রেরী ঘরের এই নিভৃত সান্নিধ্য থেকে সব মায়ার আবরণ মুছে গিয়ে একটা কঠিন আদালতের মত হয়ে উঠেছে। সোমার নির্মম জেরার উত্তরে নয়ন যেন আত্মরক্ষার জন্য সেই একটি মাত্র চরম প্রমাণ উপস্থিত করে—নিতান্ত ফাঁকির ওপর আমি এ অধিকার চাইছি না সোমা। আমি টাকা দিয়েছি।

সোমা—টাকার জোরেই আপনি জীবনে সব অধিকার পেতে চান?

নয়নের দৃষ্টিটা একেবারে অসহায় হয়ে যায়—এ ছাড়া আমার আর কি জোর আছে সোমা?

নয়নের এই অসহায় ও অপকট দৃষ্টির আবেদন সত্যিই করুণা করার মত। সোমাও বোধ হয় ক্ষণিকের করুণায় নয়নের মুখের দিকে একবার তাকায়, কিন্তু পরমুহূর্তে অন্য রকম হয়ে যায়।

কোমল চিবুক দিয়ে গড়া সোমার মুখটা অদ্ভুত রকমের কঠোর হয়ে ওঠে। নয়নের মনে পড়ে—এ মেয়েকে দেখে যা মনে হয়, আসলে সে তা নয়। আজও সেই কথাগুলি হয়তো একই আছে, কিন্তু অর্থটা উল্টে গেছে কি ভয়ানকভাবে। সোমার দিকে তাকিয়ে নয়নের দৃষ্টিটা আবছা শঙ্কায় মেদুর হয়ে উঠতে থাকে।

সোমা বলে—তা'হলে টাকার জোরেই আমাকে কিনতে চাইছেন?

নয়ন—আমি তোমাকেই চাই সোমা।

সোমা—আমি আপনাকে চাই কি না, সে খোঁজ করেছেন?

নয়ন—তুমি কেন চাইবে না সোমা?...আমি কি তোমার পক্ষে না-চাইবার মত মানুষ?

সোমার ললিত ভুরুর শান্ত ভঙ্গিমা মুহূর্তে কুটিল হয়ে ওঠে। ঠোঁটে দাঁত চেপে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিধ্বনিত হবার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে চরম উত্তরটা এতক্ষণে যেন সোমার মুখের কাছে এসে গিয়েছে। টাকার জোরে মানুষের বিশ্বাসটাও কী ভয়ংকর বড়লোক হয়ে উঠেছে! নয়ন তার বক্তব্য অকপটভাবেই বলেছে। সোমাও অকপটভাবেই শেষ উত্তর দিয়ে দিতে চায়। এই কাঞ্চনগর্বিত বিশ্বাসকে চূর্ণ না করে দিলে সংসারে মানুষ আর নিশ্চিন্ত মনে প্রীতির ঘরে বাস করতে পারবে না।

সোমা বলে—কিন্তু আমি যে একজনকে চেয়ে বসে আছি নয়নবাবু।

নয়নের কণ্ঠস্বর যেন চূর্ণ হয়ে যায়—কি বললে?

সোমা শান্তভাবে বলে—প্রবীর মাস্টার আমারই অপেক্ষায় রয়েছে।

ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যায় নয়ন। সন্ধ্যা রাতের আলোকিত মণ্ডপে তখন দু'একজন ক'রে অভ্যাগত আসছেন, উৎসবের বাতাস আর একটু বিহ্বল হয়ে বাগানের লতাপাতায় দুলছে। হাজার হাজার প্রাণের ভোট আত্মসাৎ করে মতিগঞ্জের প্রহেলিকা আরও সুন্দর হয়ে এক অভিসন্ধির বাসর রচনা করে চলেছে। দুঃখের শ্মশান কাঞ্চীপুর এখান থেকে অনেক দূর, যেখানে সপ্তর্ষিরা এক একদিন আকাশ থেকে নেমে আসেন ভূতলে।

লাইব্রেরী ঘর থেকে বাইরে এসে সোমা ডাকে—চল শঙ্কর।

সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চীপুরের একটা প্রতিশোধ যেন তার কাজ শেষ করে চৌধুরী ভবনের ফটক পার হয়ে সন্ধ্যারাতের কোলে লুকিয়ে পড়ে।

কাঞ্চীপুরের শিশুভবন এতদিন পরে নিস্তব্ধ, কাকলিহীন বনবীথির মত। শিশু আর কেউ নেই, একটি দুটি করে সবাই একে একে চলে গেছে। শুধু ছিল ভোলা। ভোলাকেও প্রবীর মাস্টার এসে একদিন নিয়ে চলে গেল, ঠাকুরপুরে পাগলা বাউল অভিরামের বাড়ি। অভিরামের পাগলি বউ আদর করেই ভোলাকে কোলে তুলে নিয়েছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেলেও অনেকক্ষণ ধরে অভিরামের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় চুপ করে বসেছিল প্রবীর মাস্টার। কোথাও যাওয়ার বোধ হয় আর তাড়া নেই, তার কাজ ফুরিয়ে গেছে।

অভিরাম বলে—আজ এখানেই থাকুন না কেন মাস্টার মশাই।

প্রবীর বলে—না, আমি এখুনই চলে যাব।

অভিরাম—কোথায় যাবেন ?

প্রবীর উত্তর দিতে পারে না। কোথায় যাবার আছে, আজ চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারে না প্রবীর। কিন্তু পাগলা অভিরামের মনে

এ কৌতূহল কেন? কোনদিনও তো সে এত সমবেদনা দিয়ে প্রবীর মাস্টারের মত তুরন্তের যাওয়া বা না-যাওয়ার ঠাঁই চিন্তা করে কোন কৌতূহল দেখায়নি?

প্রবীর ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়—আমি চল্‌লাম অভিরাম।

প্রবীরের সঙ্গে সঙ্গে অভিরামও আসতে থাকে। প্রবীর বলে—তোমাকে আসতে হবে না অভিরাম, তুমি ঘরে যাও।

অভিরাম—না। জলার কিনারা দিয়ে আপনাকে যেতে হবে, রাতের বেলা পথটা ভাল নয় মাস্টার মশাই, আমি আপনাকে পথটা পার ক'রে দিয়েই চলে আসবো।

প্রবীর—পথটা ভালই, আজই তো ওপথে এসেছি।

অভিরাম চিন্তিতভাবে বলে—আমি সে ভালর কথা বলছি না মাস্টার মশাই। একটা খারাপ ব্যাপার দেখা দিয়েছে। রাতের বেলা কেউ আজকাল ওপথে হাঁটে না।

প্রবীর উৎসুকভাবে প্রশ্ন করে—খারাপ ব্যাপার আবার কি?

অভিরাম ভয়ার্ত স্বরে বলে—এই জলার মধ্যে এক নাগকন্যে দেখা দিয়েছে মাস্টারমশাই। আমি নিজে চোখে দেখেছি, আমার পাগলিও দেখেছে, আরও অনেকে দেখেছে।

ঠাকুরপুরের বিল থেকে শাখার মত একটা শালুকভরা জলা পথটার গা ঘেঁসে কিছুদুর চলে গেছে। জলার কাছে এগিয়ে আসতেই অভিরাম চাপা গলায় বলে—এই, এখান থেকেই পথটা ভাল নয় মাস্টার মশাই।

প্রবীর হাসতে থাকে—ওসব চোখের ভুল অভিরাম। তুমি বাড়ি যাও।

অভিরাম হঠাৎ প্রবীরের হাত চেপে ধ'রে সন্ত্রস্তভাবে ফিস্ ফিস্ করে বলে—চোখের ভুল নয় মাস্টার মশাই, ঐ দেখুন, স্বচক্ষে দেখে নিন।

প্রবীর বিস্মিতভাবেই দেখতে থাকে, নিকটেই জলার কিনারায়

অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়ামূর্ত্তি নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। ছলাক্ করে একটা জলের আলোড়নের শব্দও শোনা যায়। কিছুক্ষণের মত একেবারে অস্পষ্ট হয়ে থেকে, আবার ছায়ামূর্তিটা একটু দূরে গিয়ে নড়তে থাকে।

প্রবীর বলে—চল অভিরাম, এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি।

অভিরাম প্রবীরকে বাধা দেয়—খবরদার নয় মাস্টারমশাই।

প্রবীর অভিরামকে একরকম জোর ক'রে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যায়। মানুষের পায়ের শব্দে ছায়ামূর্তিটা পালিয়ে না গিয়ে ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। একেবারে সাম্‌নে এসেই বিড়বিড় করে বলে—মরতে দিবি না মুখপোড়া, কি ভেবেছিস তোরা? আমাকে মরতে দে, নয় তোরা মর।

নাগকন্যা নয়, একটা মেয়ে, হাতে একটা মাটির কলসী, আর দড়ি। মেয়েটার মাথা খারাপ হয়েছে বলেই মনে হয়। বিড়বিড় করে আবোল তাবোল বক্‌তে থাকে।

প্রবীর জিজ্ঞাসা করে—তোমার বাড়ী কোথায় গো?

মেয়েটা এক আছাড় দিয়ে কলসীটা চূর্ণ করে—আমার বাড়ি এই জলায়।

আর কোন কথা না বলে সেখানেই কাদাটে মাটির ওপর বসে পড়ে মেয়েটা, আর সুর করে টেনে টেনে কাঁদতে আরম্ভ করে, কখনো ফুঁপিয়ে, কখনো গুম্‌রে।

অভিরাম এতক্ষণে নির্ভয় হয়ে গেছে, কান্নামূর্তি নাগকন্যার একেবারে মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—তোমার বাড়ি কোথায় বাছা? কোন্ গাঁয়ে?

কান্না থামিয়ে মেয়েটা বলে—উত্তর ঠাকুরপুর।

অভিরাম চম্‌কে পিছিয়ে আসে। প্রবীর মাস্টারের কানে কানে বলে—আমি এতক্ষণ যা ভাব্‌ছিলাম, তাই সত্যি হলো মাস্টারমশাই

প্রবীর—কি ?

অভিরাম—মেয়েটা মাণিক চৌকিদারের বউ।

প্রবীর শিউরে ওঠে, চোখ বন্ধ করে, যেন তার গলার ওপর এ... চকচকে পালিশ করা কাটারির কোপ পড়েছে। অভিরামের হাতটা শক্ত ক'রে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে প্রবীর, তবু কাঁপতে থাকে। অভিরাম আশ্চর্য হয়।

অভিরাম প্রবীরের কানের কাছে ফিসফিস করে—মেয়েটা আত্মহত্যা করতে এসেছিল মাস্টারমশাই।

প্রবীরের চোখ দু'টা যেন এক ভয়ংকর শূন্যতার মধ্যে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু দূর ঠাকুরপুরের বিলটাকে একটা রক্তময় হ্রদ বলে মনে হয়।

অভিরাম আবার কানে কানে বলে—মেয়েটাকে পোয়াতি বলে মনে হলো মাস্টার মশাই।

ভুল ভেঙ্গে যায়। প্রতিশোধের থিওরীর মত এত বড় মূর্খ মনের সৃষ্টি সংসারে বোধ হয় আর নেই। অভিরামের কাঁধের ওপরেই প্রবীরের মাথাটা অবশ হয়ে ঝুঁকে পড়ে। ভয়ংকর যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে প্রবীরের মনের ভেতর থেকে পুঞ্জীভূত একটা হিংস্র অন্ধকার নিঃশ্বাসের বাতাস জ্বালিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। একটা করুণ আর্তনাদ অস্ফুট স্বরে বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে—মাপ কর, শাস্তি দাও।

অভিরাম আরও আশ্চর্য হ'য়ে প্রশ্ন করে—আপনি এমন কেন করছেন মাস্টার মশাই ? ভয় পেলেন কেন ?

মুহূর্তের মধ্যে শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে প্রবীর বলে—না, কিছু নয়। একটা ব্যবস্থা করতে হয় অভিরাম।

অভিরাম—কি করতে হবে বলুন ?

প্রবীর—এ'কে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে তো, মরতে দিতে পারি না।

অভিরাম সমাদরের স্বরে মানিক চৌকিদারের বউকে অনুরোধ করে —তুমি ঘরে যাও বাছা।

মানিকের বউ যেন শ্রান্তভাবে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে—ওকথা আর বলোনি বাবা, একা ঘরে থাকতে পারবো না, আবার মরতে ছুটে আসবো।

কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে প্রবীর কি যেন ভেবে নেয়, তারপর মানিকের বউয়ের কাছে এগিয়ে এসে ডাক দেয়—কোন ভয় নেই, একা ঘরে তোমাকে থাকতে হবে না। তুমি এস।

মানিকের বউ মুখ তুলে তাকাবার চেষ্টা করে—কোথায় যাব?

প্রবীর—সবাই আছে যেখানে, সবাই তোমাকে দেখবে। কোন চিন্তে করো না, এস।

মানিকের বউ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। অভিরাম জিজ্ঞেস করে— আমিও কি সঙ্গে যাব?

প্রবীর—না, থাক্। তুমি বাড়ি যাও।

প্রবীর মাস্টারের পেছু পেছু নাগকন্যার মূর্তিটাও যেন অন্ধকারে পথ ক'রে নিয়ে ধীরে ধীরে চলতে থাকে, আশ্রয়ের নীড় খুঁজতে।

এবং, মাঝরাত্রে শূন্য শিশুভবনের দরজা খুলে এক নিদ্রাহীন কর্মদাসীর শীর্ণ মূর্তি প্রদীপ হাতে বাইরে বেরিয়ে এসে আশ্চর্য হয়—এ কা'কে নিয়ে এলে মাস্টার?

প্রবীর উত্তর দেয়—এর ঘরে কেউ নেই, স্বামী মারা গেছে।

তারার মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—আহা! কি হয়েছিল গো? কবে মারা গেল?

প্রবীর হঠাৎ ব'লে ফেলে—দেশের কাজে, এই কদিন আগে।

মানিকের বউয়ের হাত ধরে তারার মা বলে—আয় বাছা, ভেতরে আয়।

প্রবীর চলে যায়। যেন এ জন্মের কাজ ফুরিয়ে দেবার আগে আর একটা নতুন কাজের সূচনা ক'রে রেখে গেল প্রবীর, এক নতুন জন্মলগ্নের ভরসায়। এর বেশী সে আজ আর কিছু বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না, বুঝবার শক্তি নেই। নেহাৎই ঝোঁকের মাথায় শূন্য শিশুভবনকে যেন মাতৃভবন করে দিয়ে আবার পৃথিবীর অন্ধকারে পালিয়ে যায় প্রবীর মাস্টার।

সকাল বেলা মাত্র টেবিলের ওপর খাতাপত্র নিয়ে বসেছেন ভরাকুল থানার ইনচার্জ। এবং বাইরের দরজার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিত হয়ে হুইসিল বাজাতে থাকেন, তীব্রভাবে, জোরে জোরে।

ক'টি মুহূর্তের মধ্যে কনেস্টবলের দল এদিক ওদিক থেকে দৌড়ে এসে বারান্দার ওপরেই প্রবীর মাস্টারের শান্ত মূর্তিটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে।

প্রবীর বলে—আমি ধরা দিতেই এসেছি।

ইনচার্জের আতঙ্কিত মুখ তখুনি হাস্যময় হয়ে ওঠে—আসুন, আসুন। আমি জানতাম আপনি নিজেই আসবেন, আর সেজন্যেই আপনাকে ধরবার জন্যে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিনি।

ইন্‌-চার্জ বেশ খাতির করেই প্রবীর মাস্টারকে বসবার জন্যের নির্দেশ দেন।

আর কালবিলম্ব না করেই চালান লিখতে আরম্ভ করেন। দু'জন কনস্টেবল বন্দুক নিয়ে প্রবীর মাস্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। লিখতে লিখতে একটু পুলকিত ভাবেই ইনচার্জ বলেন—তারপর...প্রবীরবাবু?

প্রবীরের কোন উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই ইনচার্জ পরক্ষণেই উৎসাহিতভাবে প্রেরণা দিয়ে ওঠেন—বিষণ্ণ হবেন না, বিষণ্ণ হবেন না।

ইনচার্জ প্রমত্তভাবে লিখতে থাকেন। একএক মুহূর্তে চিন্তা করেই এক একটা পাতা লিখে ভ'রে ফেলেন। চালান লেখা শেষ ক'রে আবার কি একটা রিপোর্ট লেখেন। রিপোর্ট লেখা শেষ ক'রে আবার নানারকম মন্তব্য লিখতে থাকেন।

প্রবীরের হাসির শব্দে হঠাৎ চমকে উঠে একটু বিস্মিত ভাবেই তাকিয়ে ইন্‌-চার্জ জিজ্ঞেসা করেন—কি হলো?

প্রবীর—সারা রাত ধ'রে সমগড়ের কাঠের পুলের নীচে পাহারা রেখে আমাকে কেরোসিনের টিন আর তারকাটা যন্ত্রপাতি সমেত ধরে ফেলেছেন আপনি?

টেবিলের ওপর রাখা রিপোর্টটা দু'হাত দিয়ে ঢেকে ইনচার্জ যেন অভিমান করেই বলেন—কেন আমাকে অপ্রস্তুত করছেন মশাই? এদিকে আবার নজর দেন কেন?

প্রবীর—ওসব লিখে কি লাভ হচ্ছে?

ইনচার্জ একটু গম্ভীর হয়ে বলেন—আপনার লাভ নেই ঠিকই. কিন্তু আমার আছে প্রবীর বাবু। ব্যাটা গবর্ণমেণ্টের হাত থেকে যদি দুটো হাজার টাকা নিজের হাতে আন্‌তে পারি, তাতে আপনার কি আপত্তি থাক্‌তে পারে, এটা আমাকে বোঝান তো মশাই?

টেবিলের দেরাজ থেকে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের একটা পুরস্কারের ইস্তাহার বের করে প্রবীরের দিকে দেখিয়ে ইন্‌চার্জ ফিক্ ক'রে হেসে ফেলেন।—আমি মন খোলা মানুষ প্রবীর বাবু, রেখে ঢেকে কথা বলি না, তাতে আমাকে যা-ই ভাবুন না কেন!

প্রবীর কিছুই ভাবেনি এবং ইনচার্জও প্রবীরকে আর বেশীক্ষণ ভাবাবার চেষ্টা করেন নি। নথিপত্র নিয়ে, কোমরের বেল্টে রিভলবার ঝুলিয়ে আর চারজন বন্দুকধারী কনেস্টবলকে সঙ্গে নিয়ে ভরাকুল থানার ইনচার্জ বন্দী প্রবীর মাস্টারকে নিয়ে রওনা হয়ে যান। পথে চলতে চলতে

ইন-চার্জ বলেন,—আমাদের একটা অপরাধ মাপ করতে হবে প্রবীর বাবু, অবিশ্যি এক্ষুণি নয়।

প্রবীর—কি ?

ইন্‌চার্জ বলেন—নরসিংহতলা পর্যন্ত হলো আমার এলাকা। ততদূর পর্যন্ত আমি আপনাকে বন্ধুভাবেই নিয়ে যাব। কিন্তু তারপরেই হাতকড়া পরতে হবে। বুঝছেনই তো, আপনি তো আর যে সে অফেণ্ডার নন।

ইনচার্জ হঠাৎ দুঃখিতভাবে আপসোস করেন—বেশ তো মাস্টারী করছিলেন, মিছিমিছি এতগুলি বিশ্রী বিশ্রী চার্জে কেন পড়লেন মশাই! আপনার জন্যে চিন্তা হয়।

প্রবীর বলে—হাতকড়া এক্ষুণি দিতে পারেন, আমার কোন আপত্তিও নেই। শুধু একটা অনুরোধ আছে, যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে তবে……।

ইনচার্জ—বলুন বলুন।

প্রবীর—নরসিংহ মন্দিরের সামনে আমাকে একটু থামতে দেবেন, এই সামান্য কিছুক্ষণ। আমি মন্দিরের বাইরেই থাকবো, ভেতরে যাব না।

—বেশ বেশ। ইন-চার্জ প্রবীরকে আশ্বাস দিয়েই জোরে জোরে হাঁটতে থাকেন। পথচলার তালে তালে বেলাও চড়ে ওঠে, জেলা বোর্ডের সড়কের ধূলো গরম হয়। একটানা হেঁটে এসে সবন্দী পুলিশ দলের ঘর্মাক্ত অভিযান একেবারে নরসিংহতলার বটকুঞ্জের ছায়ায় ঢুকে শান্ত হয়।

একজন কনস্টেবল মন্দিরের দরজা খুলে দেয়, প্রবীর বাইরে দাঁড়িয়েই দূর থেকে বিগ্রহের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে নিষ্পলকভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ মাত্র, দেখা শেষ হয়।

একজন কনস্টেবল প্রবীর মাস্টারের হাতে হাতকড়াটা লাগাবার জন্যে এগিয়ে আসে। ইন-চার্জ হঠাৎ বলে ওঠেন—এই, সবুর কর।

পথের বিপরীত দিক থেকে দুটি আগন্তুক মূর্তির দিকে সুতীব্র

কৌতূহলে চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়েছিলেন ইনচার্জ। তার পরেই কেমন একটু বেদনাচ্ছন্ন স্বরেই বলেন—এঃ, আপনাকে মস্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেললাম প্রবীরবাবু।

বটকুঞ্জের অপর দিক থেকে পথ ধরে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছিলো সোমা, সঙ্গে বাণীপীঠের একটি বিদ্যার্থী ছেলে, শঙ্কর।

ইনচার্জ ছটফট্ ক'রে প্রবীরের চারদিকে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগলেন, কি করবেন কিছু যেন ভেবে উঠতে পারছেন না। পীনাল কোডের পৃথিবীর বাইরে থেকে যেন একটা বেসরকারী মমতা এসে ইনচার্জকে ক্ষণিকের মত বিচলিত ক'রে দিয়েছে।

ইনচার্জ কনস্টেবলদের একটু তফাতে সরে যেতে বলেন। তারপর প্রবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুযোগ করতে থাকেন—এঃ, আপনি আমাকে বড় অপ্রস্তুত করলেন মশাই, এমন জান্‌লে এ-পথে আসতাম না।··· মুস্কিল হচ্ছে, সবই জানি কিনা, সবই জানি।

সোমা প্রায় কাছে এসে পড়েছে। ইনচার্জ বিচলিতভাবে অনুরোধ করেন—যা কথাটথা বলার আছে, দু'টি মিনিটের মধ্যে সেরে নিন মশাই। আর আমাকে অপ্রস্তুত করবেন না।

বল্‌তে বল্‌তে ইনচার্জ স'রে যান, কিছুটা দূরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকেন।

শঙ্কর একটা বটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মুখের ঘাম মুছতে থাকে। সোমা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে প্রবীরের সামনে দাঁড়ায়।

মাত্র দুটি মিনিট সময়, একটা মিনিট নিঃশব্দের মধ্যেই মিলিয়ে যায় শুধু প্রাণ ভরে দেখে নেবার আবেগে। এতদিনের সব দেখার ইতিহাস যেন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সোমা যেন তার নিশ্বাসের শব্দ দিয়ে আস্তে আস্তে বলে—কবে আসছো?

প্রবীর—কোথায় ?

সোমা—আমার কাছে।

প্রবীর—কেন সোমা ?

সোমা—চিরকালের মত আমার আপন হ'য়ে থাকতে।

প্রবীর—ডেকে নিও, আসবো।

শঙ্খধ্বনি পুলকিত এক জয়ী জীবনের উৎসবের বর্ণচ্ছটা যেন প্রবীরের মুখটাকে ক্ষণিকের মত রঙীন ক'রে তোলে। বটকুঞ্জের নিবিড়তা ভেদ ক'রে প্রবীরের দৃষ্টিটা কয়েক মুহূর্তের মত দূরান্তরের সীমা ছুঁয়ে সীমাহারা হ'য়ে যায়।

ইনচার্জ দূরে দাঁড়িয়ে গলাঝাড়া দিয়ে একবার কাশেন।

সোমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রবীর শান্তভাবে হাসে—আসি সোমা।

সোমা—এস।

প্রবীর চলে যায়। ছ'হাত জোড় ক'রে নমস্কার করে সোমা। আর যা-কিছু বল্‌বার ছিল, কিন্তু বলা হলো না, একটি নমস্কারেই যেন সব জানিয়ে দিতে চায় সোমা। শুধু তার অনুরাগে গড়া ঐ বল্লভের মূর্ত্তিটীকেই নয়, এক মহৎ দুঃখের শৌর্যময় প্রতিমূর্তিকে নির্ভয় প্রীতি দিয়ে আজ নমস্কার করে সোমা। কাব্যতীর্থের মন্ত্রকে, সাতটি প্রদীপের আলোককে; শুচিজনা-সিন্ধু-সুরভির হৃদয়শোণিতে পূত কাঞ্চীপুরের মাটীকে আজ যেন পূজারিণীরূপে অভ্যর্থনা জানায় সোমা, একটি নমস্কারে।

শূন্য শিশুভবনের দাওয়ার ওপর সেই শীতের মধ্যাহ্নে জীর্ণমূর্তি একটি বিনে-মাইনের চাকরানির শরীর টান হয়ে শুয়ে ছিল—তারার মা। একটা মেয়াদহীন আয়ু, যেন যাই-যাই ক'রেও যেতে পারছে না। দিন ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু কাজ ফুরোয় না।

সোমার পায়ের শব্দে আস্তে আস্তে মাথা তুলে তাকায় তারার মা।

মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। সোমা দেখেই বুঝতে পারে, এটা প্রদীপের হাসি।

—এসেছ গুরুমা! আমি বাঁচলুম।

—এসেছি তারার মা।

সোমা এগিয়ে এসে তারার মা'র হাত ধ'রে কাছে বসে। চারদিকে কয়ে, শিশুভবনের শূন্যতাকে একটু করুণ ক'রে দিয়ে সোমা জিজ্ঞাসা

—ছেলেমেয়েরা বুঝি সব চলে গেছে তারার মা?

তারার মা—হ্যাঁ।

গুরুমা আর তারার মা, শিশুহীন শিশুভবনে যেন দু'টি মা শুধু নিঃশব্দে থাকে। পাশের ঘরের ভেতরে একটা আর্তশব্দ হঠাৎ বুকছেঁড়া যায় আকুল হ'য়ে ওঠে—মা মা মা......রক্ষে কর।

—ও কে? সোমা চম্‌কে উঠে দাঁড়ায়।

তারার মা বলে—একটি বউ রাত্তির থেকে এখানে রয়েছে। ভেতরে একবার দেখে এস গুরুমা। পেটের কাঁটা বুঝি নাম্‌লো এতক্ষণে।

সোমা ঘরের ভেতরে যায় এবং কিছুক্ষণ পরেই বাইরে এসে দাঁড়ায়। যায় তুলসীঝারি থেকে একটি একটি ক'রে জলের ফোঁটা মুহূর্তের নিয়ে ঠিক ছন্দ রেখে ঝ'রে পড়্‌ছে, যেন এক জন্মলগ্নের কোলে। বুঝতে পারে সোমা, এক নতুন মাতৃভবনে সে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সঙ্গে তার শিশুভবনও ঠিকই আছে।

এখন অনেক কাজ আছে। সোমা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

**সমাপ্ত**